আধুনিক গল্প সংকলন

সম্পাদনা

শ্যামলী গুপ্ত

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

মুখবন্ধ

সমসাময়িক কালের কয়েকজন লেখিকার গল্প নিয়ে এই সংকলন। এটি আমার তৃতীয় উদ্যোগ গল্পসংকলনের। গল্পগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। এই গল্প রচয়িতাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লেখিকারাও যেমন আছেন তেমনি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত লেখিকাদের গল্পও স্থান পেয়েছে। লেখিকার পরিচিতি নয় গল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকই এক্ষেত্রে গুরুত্বলাভ করেছে। সম্প্রতি লেখিকাদের গল্প নিয়ে বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এটি নিশ্চয়ই আশার দিক। এই গল্পসংকলনটিও আর একটি নতুন সংযোজন। আমার প্রত্যাশা পাঠক-সমাজ একে সাদরে গ্রহণ করবেন।

শ্যামলী গুপ্ত

সূচীপত্র

আর আসিব ফিরে

জাহানারা ইমাম

জানালার বাইরে নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে ছিল হাসিনা। তার পেছনে সদর দরজায় সাবধানী আঙ্গুলের মৃদু ঠুকঠুক শব্দ হল। কিন্তু সে নড়ল না। আহসান দরজার কাছের সোফাটায় বসে ছিল, সে তড়াক করে উঠে দরজার ছিটকিনি খুব আস্তে, প্রায় নিঃশব্দে খুলল। শওকতের ফিসফিস গলা শোনা গেল, 'বোকো না। না এসে পারলাম না। কেবল আটটা বাজে কিন্তু কি ঘুরঘুট্টি আঁধার, মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত। আমাদের রেডিওটা আবার বিকেলেই খারাপ হয়ে গেল। বোঝোই তো, স্বাধীন বাংলা না শুনলে আমার ঘুম হবে না।'

দরজার ছিটকিনি বন্ধের সাবধানী অস্পষ্ট শব্দ হল। দু'জোড়া পায়ের মৃদু শব্দ মেঝে ঘষে ঘষে সোফার কাছে এসে থামল। এবার হাসিনা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ঘরের ভেতরেও নিকষ আঁধার। কোনরকম আবছা আভাসও বুঝা যায় না। আহসানের গলা শোনা গেল, 'জানালাটা বন্ধ করি বু? শওকত ভাই এসেছে, বাতিটা জ্বালতে চাই।'

হাসিনা নিজেই উঠে জানালাটা বন্ধ করল। আহসান আন্দাজে পা ফেলে ফেলে দেয়ালের কাছে গিয়ে সুইচ টিপল। মৃদু আলোর একটা গোল চাকতি মেঝের উপর পড়ল, তাতে ঘরের অন্ধকার দূর না হলেও মানুষগুলির চেহারার একটা আবছায়া বুঝা গেল। হাসিনা নিউমার্কেট থেকে কালোরঙের মোটা কাগজ কিনে চোঙার মত সরু লম্বা করে শেড বানিয়ে ছাদ থেকে ঝুলন্ত বিজলী বাতির গলায় পরিয়েছে, ভেতরের বাল্ব ১৫ পাওয়ারের। জানালার কাচের পাল্লাও ঐ কাগজ দিয়ে ঢাকা। প্রথম দিকে খবরের কাগজ দিয়ে পাল্লা ঢাকা হয়েছিল, বাল্ব বদলে ১৫ পাওয়ারের করলেও বাড়তি শেড পরায় নি, ভেবেছিল যে শেড আছে, তাই যথেষ্ট। তাতেও বাইরে থেকে চিৎকার শোনা যেত, 'বাত্তি বুতা দো।' যারা এই চিৎকার করত, তারা জানত না যে, বন্ধ জানালার যে পাল্লাটা তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে একটুখানি আলোকিত বুঝতে পারে, সেটা আকাশে উড্ডীয়মান প্লেন থেকে বুঝা যায় না। সরাসরি আলো খোলা জানলা দিয়ে বাইরের মাটিতে না পড়লেই যে চলে—এই জ্ঞানটা তাদের কেউ দিয়ে দেয়া প্রয়োজন বোধ করে নি। তাই খবরের কাগজ সাঁটা বন্ধ জানালার পাল্লাও যদি বাইরে থেকে বোঝা গেছে তো পবিত্রভূমির রক্ষাকারীরা অকথ্য গালাগালি দিয়ে চেঁচিয়ে বাতি নেভাতে বলেছে। তখন হাসিনা নিউমার্কেট থেকে আর্টিস্টদের ড্রয়িং করার এই দামী মোটা কালোকাগজ কিনে এনে এমনই সাঁটা সেঁটেছে যে, দু'হাত লম্বা সরু চোঙের ভেতর দিয়ে যে আলোটুকু মেঝেতে পড়ে, সেটা জানালার বন্ধ পাল্লা আলোকিত করা তো দূরের কথা, ঘরের ভেতরের চাপ চাপ অন্ধকারটাও সরাতে পারে না।

শওকত একটা সোফায় ধপ করে বসে বলল, 'কই, তোমার রেডিওটা আনো। তোমরা শুনছিলে না?'

হাসিনা বলল, 'শওকত ভাই, রাত মোটে আটটা হোক আর যাই হোক, কার্ফু আর ব্ল্যাকআউটের মধ্যে তোমার অমন করে বাউন্ডারীওয়াল ডিঙিয়ে ময়লা জঞ্জালের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসা মোটেও নিরাপদ নয়। একদিন স্বাধীন বাংলা না শুনলে কি হয়?'

শওকত রেগে গিয়ে বলে উঠল, 'আমাদের বেলায় যত নিরাপত্তার আঁটিশুঁটি। ওদিকে নিজের ছেলেটাকে যে আগুনের মুখে ঠেলে দিয়েছিস?'

হাসিনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, 'ঠেলে কি আমি স্বেচ্ছায় দিয়েছি? তুমি জান না ওরা কেমন করে—'

আহসান রেডিও নিয়ে আসতে আসতে বলল, 'দিলে তো আবার সব কাঁচিয়ে? অনেক কষ্টে সামাল দেয়া গেছিল। সেই বিকেল থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিট। এই শীতের মধ্যে মাথায় পানি ঢেলে বাতাস করে কেবল দু'টো খাইয়ে এনে বসিয়েছিলাম।'

শওকত উঠে হাসিনার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল ; 'সরি হাসি। না বুঝে তোকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। আসলে কিন্তু আমি ও কথা বিশ্বাস করে বলি নি। তোর ছেলের মতো ছেলেরা যুদ্ধ করছে বলেই তো আমরা বুড়োরা এখানে আশায় বুক বেঁধে বসে আছি। ওরা আগুনে ঝাঁপ না দিলে আমাদের কি গতি হবে, বল?'

হাসিনা চোখ-মুছে ধরা গলায় বলল, 'শওকত ভাই, ঠেলে কেউ দেয় না। সেলিম যখন বাচ্চা ছিল, ওকে কোলে দিয়ে আয়াকে দূরে যেতে দিতাম না। বলতাম আমি যেন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তোমাকে দেখতে পাই। খবরদার, বিল্ডিংয়ের আড়ালে যাবে না। আমার না, ছেলেধরার বড্ড ভয় ছিল। খালি মনে হত, এই বুঝি সেলিমকে ছেলেধরায় নিয়ে গেল। কতো আগলে মানুষ করেছি সেলিমকে। কিন্তু দেখ, তবু ছেলেধরার হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না। বিশ বছর বয়সে তাকে ছেলেধরায় নিয়ে গেল।'

শওকত চোখ মুছে বলল, 'উঃ, কেন যে ঢাকায় এসেছিল, না এলে তো আর ধরা পড়ত না।'

হাসিনা বলল, 'ওটা কোন যুক্তি হল না। ওদের ওপর হুকুম হয়েছিল ঢাকায় অপারেশন করার। তাই ওরা ঢাকায় এসেছিল। কতো মুক্তিযোদ্ধা গ্রামে-গঞ্জে ধরা পড়ে নি? যুদ্ধ করতে করতে মারাও তো যাচ্ছে কতো ছেলে। ও বলে লাভ আছে?'

হঠাৎ সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। দূরে বেশ কয়েকটা ফুটফাট আওয়াজ হল। ও রকম আওয়াজ তো সারারাতই হয়। বরং ওসব আওয়াজ না শুনতে পেলেও এদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ওসব আওয়াজ এদের জানিয়ে দেয় যে কোথাও মুক্তিযোদ্ধারা একটা কিছু করছে। কিন্তু ওরা উৎকর্ণ এবং নিস্তব্ধ হয়েছে অন্য শব্দে। পায়ের আওয়াজ, ওদের বাগানের লোহার গেটটা খোলার শব্দ। আহসান চট করে সুইচটা নিভিয়ে দিল। শওকত ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বাতি নিবিয়ে দিলে? ওরা টের পেয়ে যাবে।'

হাসিনা তেমনি অস্পষ্ট গলায় বলল, 'না, এমনই কালোকাগজে সব জানালার পাল্লা সেঁটেছি যে ঘরে বাতি জ্বলছে কি বন্ধ আছে তা বুঝা যায় না। তাছাড়া বাত্তির জোর তো মোমবাতির চেয়েও কম। তার ওপর বাল্বের চারিদিকে যে মোটা কালোকাগজের শেড, ওতেই আলোর সব রঙ শুষে নিয়েছে।'

দরজায় টোকা পড়ল, প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর জোরে জোরে। আহসান দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে পাল্লায় মুখ রেখে গলাটা ঘুমজড়ানো করে টেনে বলল, 'কে এত রাত্রে?'

'আমি রহমান। আপনার পড়শী।'

'শুয়ে পড়েছি যে। কি দরকার?'

'একটা ফোন করব, খুব জরুরি।'

'ভাই, আজ মাফ করতে হবে। মায়ের প্রেশারটা খুব বেড়েছিল অনেক কষ্টে এখন একটু

ঘুমিয়েছেন। কাল সকালে আসবেন।'

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। এরা বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর আহসান আবার বাতিটা জ্বালল। বিরস গলায় বলল, 'তার মানে শওকত ভাই আর তোমার বাসায় ফেরা হবে না। ওরা কোনভাবে সন্দেহ করেছে কেউ এসে এ বাড়ীতে ঢুকেছে। এখন সারারাত এ বাড়ীর ওপর নজর রাখবে।'

হাসিনা বলল, 'এবার শিক্ষা হল তো? নাও, ভাবীকে ফোন করো এক্ষুণি, সব বুঝিয়ে বলে দাও হাজার ধাক্কাধাক্কি করলেও যেন রা না কাড়ে , যেন দরজা না খোলে। যেন মরার মত ঘুমিয়ে থাকে।'

শওকত ফোন সেরে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, জিজ্ঞেস করল 'কারা এসেছিল? রাজাকার? না আলবদর? এত সহজে ফিরে গেল?'

'না ওরা রাজাকার বা আলবদর নয় । ওরা আমাদের খুব ভালো পড়শী, সবসময় খবরাখবর নেয়, মায়ের যায়-যায় অবস্থা হলে দৌড়ো-দৌড়ি করে ডাক্তার ডেকে আনে। সেলিমকে ধরে নিয়ে যাবার পরের কয়েকদিন খুব দেখাশোনা করেছে। বু'র মাথায় তেল চাপড়ে দিয়েছে। মায়ের সেবা করেছে। এখনো করে। বিনিময়ে আমাদের কিছুই করতে হয় না, শুধু মাঝে মধ্যে আমাদের ফোনটা ব্যবহার করে। ইদানীং ওদের ফোনের দরকার খুব বেড়ে গেছে। যখনই আমাদের বাড়ীতে কেউ আসে তখনি ওদের ফোন করার দরকার হয়ে পড়ে।'

'বুঝেছি, ওরা রাজাকার-আলবদরের খালাতো-ফুফাতো ভাই। তা ভাই, এমন দরদী পড়শীর পাশে এখনো বহাল তবিয়তে টিকে আছ কি করে? তোমাদের তো এ পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

আহসান বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠির এক বাড়ি মেরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কি করে যাই? বাপের বানানো ভিটে, মা রোগে পঙ্গু, এসব মুক্তিযুদ্ধটুদ্ধ একদম বোঝে না। সেলিম যখন মুক্তিযুদ্ধে যায়, মাকে মিথ্যে করে বলতে হয়েছিল, ওর চাচারা ওর বাপের সম্পত্তি মেরে দিচ্ছে, সেগুলো বাঁচাবার জন্য ওকে ওর বাপের বাড়ির গ্রামে যেতে হচ্ছে। পাড়াতেও সেই কথাই রটিয়েছিলাম।'

হাসিনা বলল, 'আর সবাই বিশ্বাস করলেও আমাদের সৎ পড়শীরা যে বিশ্বাস করে নি, তার প্রমাণ হল, যখনই কোন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাড়ীতে আসত, ও বাড়ী থেকে কেউ না কেউ ফোন করতে আসত। ছেলেরা এ বাসা থেকে ফেরার সময় ও বাড়ীর কেউ না কেউ, যেন রাস্তায় হাঁটতে হঠাৎ দেখা, এমনিভাব করে ছেলেদের জিজ্ঞেস করত, তাঁরা সেলিমের কি হয়। কোথা থেকে এসেছে। প্রথমবার একটি ছেলের মুখে এ ব্যাপার জানার পর আমরা ছেলেদের শিখিয়ে দিতাম—ওরা যেন বলে ওরা সেলিমের খালাতো বা চাচাতো ভাই।'

আহসান তিক্ত হাসি হেসে বলল, 'তাতে যে কাজ দেয় নি, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। সেলিম তিনমাস পর ঢাকায় ফিরে আসার তিনদিনের মধ্যেই তো পাক আর্মি মাঝরাতে বাড়ী ঘেরাও করে সেলিমকে তুলে নিয়ে গেল।'

হাসিনা বলল, 'বুঝলে শওকত ভাই পাক আর্মি এমনভাবেই সারা বাড়ীটা ঘিরেছিল যে সেলিম কোনভাবেই পালাবার সুযোগ পায় নি।' বলতে বলতে ডুকরে উঠে হাসিনা মুখে কাপড় গুঁজল।

আহসান খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি করতে করতে বলল, 'আর সহ্য হয় না

শওকত ভাই। আমি শক্ত সমর্থ জোয়ান লোকটা ঘরে বসে আছি, আর দশের ছেলে ভাগনেটা মুক্তিযুদ্ধে গেল।'

হাসিনা মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বলল, 'ও কথা বলিস না আহসান। তোর ওপর এতবড় একটা সংসারের ভার, প্যারালাইজ্ড মা, বিধবা বোন, নাবালক ভাগনে, এই সব বইতে বইতে তুই এখনো বিয়ে করার ফুরসৎ পেলি না।'

হালিম এতক্ষণ নানীর বিছানার পাশে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। এবার উঠে এ পাশে এসে বলল, 'মা আর নানীর জন্য তো আমিও যেতে পারলাম না মামা।'

'তুমি তো এখনো অনেক ছোট হালিম—' শওকত বলল।

হালিম বলে উঠল, 'কি যে বলেন, আমি এই নভেম্বরে ষোলোয় পড়লাম। আমার চেয়েও কম বয়সী কতো ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে না?'

'শোনো হালিম, তুমি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যেতে না পারলেও এখানে বসেই যা করছ, তার দামও কম নয়। তুমি আর আহসান দুজনে মিলে দেশের ভেতরের যে কাজগুলো করছ, তার বিপদ আর ঝুঁকি কিন্তু যুদ্ধরত ছেলেদের বিপদের চেয়ে কম নয়।'

আহসান বলল, 'তা স্বীকার করি শওকত ভাই, কিন্তু এই যে প্রতিদিন অহরহ মিথ্যে কথা বলে বলে জান বাঁচানোর গ্লানি, মিলিটারী আর রাজাকার-আলবদরের অপমান মুখ বুজে সহ্য করার গ্লানি, নিজের ঘরে চোরের মত লুকিয়ে চুপি চুপি স্বাধীন বাংলা শোনো, তারপর কারো সাড়া পেলেই ঢাকা স্টেশনে কী-টা ঘুরিয়ে দেয়া—এতসব গ্লানির বোঝা আর তো সহ্য হয় না শওকত ভাই।' কারো মুখে কোন কথা যোগাল না। সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। আহসানের তীব্র অন্তর্দাহ যেন তাদের গায়েও আগুনের হলকা লাগিয়ে দিল। আহসান পায়চারী বন্ধ করে মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল, চাপা স্বরে গর গর করতে করতে বলল, '২৭-শে রমজানের রাতের কথা মনে আছে? মোমিন-মুসল্লীরা সারারাত ধরে মসজিদে শবেকদরের নামাজ পড়ে মোনাজাত সারবার অবকাশ পায় নি। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে কার্ফু জারি হল। মোমিন-মুসল্লীরা ফজরের ফরজ নামাজ সারবার ফুর্সৎ পেল না, পড়িমরি করে বাড়ী পানে ছুটতে হল। তুমি কি মনে কর এতে আল্লার আরশ কেঁপে যায় নি? আল্লার প্রিয় বান্দাদের যারা শবেকদরের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করেছে, পুণ্যাত্মা মুসল্লীদের যারা ফরজ নামাজ আদায় করতে না দিয়েই কুকুরের মত বাড়ী মুখো তাড়া করেছে, তারা কি এর ফলভোগ না করেই পার হয়ে যাবে ভেবেছ? তারপর ২৭-শে রমজানের সকালে কি কাণ্ডটা করল ওরা? প্রত্যেক গলিতে গলিতে মাইক দিয়ে সবাইকে যার যা বন্দুক, পিস্তল আছে সব নিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে বলল। আমরা রোজাদাররা সারারাত মসজিদে জেগে এবাদত করে ভোর বেলা ফরজ না পড়েই বাড়ী ফিরে একটু ঘুমোবারও অবকাশ পেলাম না। ন'টা সাড়ে ন'টায় বন্দুক, পিস্তল—যার যা ছিল, সব ঘাড়ে করে নিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রোজাদারদের জোহারের নামাজও কাজা গেল। শওকত ভাই, তুমিও তো দাঁড়িয়ে ছিলে। সেদিন পুরো এলিফেন্ট রোড ভরে সবাই দাঁড়িয়েছিল। ওরা প্রত্যেকটি লোকের লাইসেন্স দেখে দেখে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র মিলিয়ে তারপর প্রত্যেককে রসিদ লিখে লিখে অস্ত্রগুলো নিয়ে নিল।—এই করতে তারা তিনটে-চারটে বাজিয়ে দিল। বাড়ী ফিরতে ফিরতে প্রায় ইফতারের সময়। রসিদ লেখার এই প্রহসন করার কি দরকার ছিল? রসিদ নিয়ে কচু হবে। তার চেয়ে ওরাই প্রত্যেকটি বাড়ীতে ঢুকে সব কেড়েকুড়ে নিতে পারত। কিন্তু তাতে তো আমাদের অপমান পুরো হতো না। আমরা কি মানুষ শওকত ভাই? আমরা কি এখনো

মানুষ আছি? না, নেই।'

শওকত উঠে আহসানের পাশে মাটিতে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'শান্ত হও ভাই, শান্ত হও। ওদের আর বেশী দিন নেই। আরেকটু ধৈর্য ধরে, সহ্য করে থাক।'

আহসানের গলা থেকে আর্তনাদের মত স্বর বেরোল, 'আর কত সহ্য করব? আর কতদিন ধৈর্য ধরব? আর কতদিন? উঃ, আর কতদিন!'

আহসানের পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে শওকত মৃদু গভীর স্বরে বলল, 'ঢাকার পতন ঘটতে আর দেরি নেই, বুঝলে? ৬ তারিখে ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, স্বাধীন বাংলা, বিবিসি, আকাশবাণীর খবর থেকে যা বুঝা যাচ্ছে, তাতে খুব শীগগীরই কিছু একটা হেস্তনেস্ত হবেই হবে।'

হাসিনা আহসানের পাগলের মত কথাবার্তা শুনে দু'চোখের পানি ঝরাচ্ছিল, সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'তাই যেন হয় শওকত ভাই, তাই যেন হয়। এই কবরের মত ঘরের মধ্যে দিনরাত্রির ব্যবধান মুছে বাস করা—আমারো আর সহ্য হচ্ছে না। সাড়ে আটমাস হয়ে গেল। আর কত? স্বাধীনতা আসতে আর কত দেরি?'

আহসান শওকতের হাতটা ঘাড় থেকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কেমন এক ভৌতিক গলায় বলল, 'মানুষের সহ্যশক্তি, ধৈর্য ধরার ক্ষমতা খুব বেশী। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। রাবার টানলে বাড়ে কিন্তু বাড়তে বাড়তে একটা জায়গায় এসে রাবারও ছিঁড়ে যায়। আমার সহ্য করার, ধৈর্য ধরার ক্ষমতাও আজ শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। আমার ইচ্ছে করছে সবকটা জানালা খুলে সবকটা বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চিৎকার করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।'

শওকত, হাসিনা, হালিম তিনজনেই ভয় পেয়ে দ্রুতপায়ে এসে আহসানকে জড়িয়ে ধরল। আহসান ওপর দিকে মুখ তুলে কেমন এক বিকৃত গলায় আর্তনাদ করে উঠল, 'সেলিম—সেলিমরে—আর কি তোকে দেখব!' হাসিনা চট করে আহসানের মুখে হাত চাপা দিল, 'আহসান, পাগল হয়ে গেলি নাকি? শান্ত হ' ভাই, শান্ত হ'।'

'ওর মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছে। ওকে শুইয়ে দেয়া যাক।' শওকত আহসানকে শক্ত হাতে ধরে ঘরের অপর প্রান্তে সিঁড়ির নীচের জায়গাটায় পাতা বিছানার দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

ওদের চেঁচামেচিতে মা জেগে গিয়েছিলেন, তিনি আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলরে?'

হালিম তাড়াতাড়ি নানীর কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলল, 'কিছু হয় নি নানী। মামার মাথা ধরেছে খুব, তাই আঃ উঃ করছে। তুমি ঘুমোও।'

আহসানকে শুইয়ে তার মাথার কাছে শওকত ও হাসিনা বসে দু'জনেই তার মাথায় মুখে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। হাসিনা ফিসফিস করে বলল, '২৭-শে রমজানের পর থেকেই ওর এরকম হয়েছে। ঈদের দিনে হঠাৎ করল কি সেলিমের একটা ফটো এ্যালবাম থেকে খুলে তার নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখল 'আবার আসিব ফিরে—এই বাঙলায়'—লিখে একটা ফটোস্ট্যান্ডে ভরে ড্রয়িং-রুমে এনে রাখল। বলল, 'আজ তো বহু লোক আসবে ঈদের মোলাকাত করতে—সবাই দেখুক। আর আমি পারছিনে ওকে মিথ্যে কথার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে।' বুঝলে শওকত ভাই, ঈদের দিন থেকে বসার ঘরে ওই ফটো দেখার পর থেকে আমাদের সহৃদয় পড়শীদের আনাগোনা তৎপরতা আগের চেয়ে

বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে অনেকগুলো অদৃশ্য চোখ যেন আমাদের বাড়িটার চারদিকে চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। মনে হচ্ছে আরো কি সব যেন ঘটতে যাচ্ছে।'

শওকত বলল, 'না, না, ওসব বাজে চিন্তা। মন শক্ত কর।'

'মনতো পাথর করেই আছি। কিন্তু দেখ, এ কয়দিন তো সন্ধে পাঁচটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কার্ফু ছিল আজকে আবার হঠাৎ বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে দিল কেন? কালাম সন্ধের সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বড় রাস্তার কাছ পর্যন্ত গিয়েছিল, দেখে বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝেই মাইক্রোবাস যাচ্ছে।'

'কার্ফু পাশ নিয়ে তো যে কোনো গাড়ীই যেতে পারে।'

'তা পারে। মিলিটারীর জিপ তো যাচ্ছেই অহরহ। কিন্তু এত যে ইন্ডিয়ান প্লেনের আনাগোনা, থেকে থেকে বোমা পড়ছে, এর মধ্যে দিয়ে এত গাড়ী চলে কি কারণে? সাধারণ মাইক্রোবাস মিলিটারীরা ব্যবহার করে নাকি?'

'কি করে বলব? কার্ফু দিয়ে সবাইকে তো ঘরবন্দী করে রেখেছে। জানবার কি উপায় আছে কিছু?'

আহসান হঠাৎ বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'বু, আমার ঘুম এসে যাচ্ছে। তুই শওকত ভাইয়ের শোয়ার ব্যবস্থা করে দে। দেখিস ওর যেন কোন অসুবিধে না হয়।' আহসান ঘুমিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ হাসিনা ও শওকত ওর গায়ে হাত রেখে চুপ করে বসে রইল।

ওরা সবাই আসছে। দু'জন করে, চারজন করে, দলে দলে, কাতারে কাতারে। সবার আগে দেখা যাচ্ছে সেলিমকে। পরনে ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট, মাথার চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে, জুলপিতে, দাড়িতে কি চেহারা হয়েছে, হাতে স্টেনগান, মুখে হাসি, চোখে পানি। ওদের সম্মানে বিরাট গেট বানানো হয়েছে, আহসান তার দু'পাশে হাসিনা ও হালিমকে নিয়ে অধীর উন্মুখ হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওরা আসছে, চারদিকে জয়ধ্বনি উঠছে, ওরা গেটের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ কি হল! বিষম শব্দে গেটটা ভেঙে পড়ল।

আহসান চমকে জেগে উঠল, বিষম কড়কড় শব্দে সারা পাড়াটাই বুঝি কেঁপে উঠল। কোথায় গেট, কোথায় মুক্তিসেনারা! আহসান নিজের ঘরে, বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল। বিষম শব্দটা খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাওয়া প্লেনের।

আহসান ধড়মড় করে উঠে বসে ঘরের চারিদিকে তাকাল। জানালাগুলো সব বন্ধ ; ডাইনিং টেবিলের ওপরের বাল্বটা জ্বলছে। সামনে চায়ের কাপ নিয়ে বসে শওকত রেডিয়োর নব ঘোরাচ্ছে, হাসিনা নাশতার প্লেট হাতে এইমাত্র পাশের রান্নাঘর থেকে এ ঘরে এসে ঢুকল। রান্নাঘরের দিকের খোলা দরজা দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আহসান বলল, 'বেলা হয়ে গেছে? বু, এঘরেব জানালা খুলিস নি যে?'

'খুলব কি? দেখছ না শওকত ভাই যেতে পারেনি। আজ কার্ফু ওঠে নি।'

'কার্ফু ওঠে নি? সেকি! শওকত ভাই বাড়ী যাবে কি করে? বেলা হয়ে গেছে যে।'

'তাইতো দেখছি, ভারি বিপদ হয়ে গেল।'

হাসিনা গলায় জোর এনে বলল, 'বিপদ আবার কি? তুমি আমার খালাতো ভাই, পাশের গলিতে থাকো, খালার অসুখ বাড়ার খবর শুনে দেখতে এসে আটকা পড়ে গেছ। তুমিতো আর জানতে না গতকাল হঠাৎ ৫টার বদলে সাড়ে তিনটেয় কার্ফু দিয়ে দেবে। আজ যে কার্ফু উঠবে না, তাই বা কে জানতো? অত পুতুপুতু কোরোনা তো। মরার আগে এতবার মরতে আর পারছি না। আসুক না আজ কেউ ফোন করতে। শওকত ভাই, তুমিই গ্যাট গ্যাট করে

গিয়ে দরজা খুলে দেবে।'

বলতে বলতেই ভীষণ জোরে খট খট শব্দে কড়া নড়ে উঠল। ঘরের মধ্যে সবাই চমকে থ' হয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। তীর বেগে হাসিনা শওকতের পাশে এসে তার হাত ধরে টেনে তুলে দোতলায় সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিল, ফিসফিসিয়ে বলল, 'দোতলার বাথরুমে ঢুকে যাও।'

শওকত দ্রুত দোতলায় উঠে গেলে আহসান লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, দৃঢ় পায়ে দরজার দিয়ে এগিয়ে গেল। হালিম নানীকে চামচে করে ফিরনী খাওয়াচ্ছিল। সে কাঁপা কাঁপা হাতে ফিরনী খাওয়াতেই থাকল মাথা নীচু করে। আহসানের পেছনে পেছনে হাসিনাও এগিয়ে গেল।

আহসান দরজা খুলে দিতে না দিতেই ঘরে ঢুকল দু'জন অল্পবয়সী লোক, মুখে কালোকাপড় ঢাকা, হাতে বন্দুক, পেছনে খাকী পোশাক পরা কয়েকজন আর্মির লোক, তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে হাসিনা দেখল খোলা গেটের ওপাশে রাস্তায় একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে।

কালোকাপড়ে মুখ ঢাকা সামনের লোকটি ভাঙা বাংলাতে বলল, 'আপনে আহসান আহমেদ?'

'জী—'

'কোলেজে পোড়ান?'

'জী—'

'আপনাকে একটু আসতে হোবে আমাদের সোঙ্গে।'

হাসিনার গলা চিরে আওয়াজ বেরোল, 'কেন, কেন? উনি কি করেছেন?

'কিছু ভয় কোরেন না। আধাঘোন্টা পোরেই উনি চলে আসবেন।'

'একটু দাঁড়ান, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, মুখটা ধুয়ে নেই—'

'কিছু দোরকার নেই। আধাঘোন্টা পোরে এসে মুখ ধোবেন। চোলেন।'

দ্বিতীয় লোকটি এগিয়ে এসে বন্দুকটা বাহুর মত বাড়িয়ে আহসানের পিঠে ছোঁয়াল, যেন বন্ধু হাত বাড়িয়ে বন্ধুর পিঠে বেড় দিয়েছে। হাসিনা হঠাৎ যেন জমে গেল, আহসান একটু হাসবার চেষ্টা করে একবার বোনের মুখের দিকে তাকাল, আরেকবার ড্রয়িং-রুমের কোণে নীচু টেবিলে রাখা সেলিমের ফটোটার দিকে তাকাল,—ফটোতে সেলিম দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, নীচে আহসানের হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে 'আবার আসিব ফিরে— এই বাঙলায়।' আহসান একটা চোখ ফটোর দিকে, আরেকটা চোখ বোনের দিকে রেখে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'চিন্তা করিস নে, খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।' বলে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আবার কলকাতা

সবিতা সেনগুপ্ত

মড়ার মতো ঝিমিয়ে আছে শহরটা। ট্রেন থেকে নেমেই শোনে ট্যাক্সি ধর্মঘট। চিন্তাকুল চিত্তে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, কি করা যায়। সহযাত্রী ছেলেটি যে সেই সুদূর পাঞ্জাব থেকে সঙ্গে এসেছে, বলল, ভাবী আমার অফিসের গাড়ি নিশ্চয়ই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ত ট্যুরে এসেছি, আমার গাড়িতে পৌছে দেব আপনাকে। আপনি এত ভাবছেন কেন?

—হরিকিষন, সারারাস্তা দেখাশোনা করেছ, তোমার ত একটাতে মিটিং রয়েছে, আমাকে পৌছে দিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে তোমার!

—ভাবী, এত ভাবতে পারেন আপনি, আপনাকে পৌছে দেব, মিটিংও করবো। সরল, আত্মপ্রত্যয়ে ভরা হরিকিষনের বলিষ্ঠ চেহারার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা সত্যিই আশ্বস্ত হয়েছিল।

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের নির্জীব পথঘাটের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা যেন কেমন অবসন্ন বোধ করল? দোকান-পাট বুঝি একটু দেরীতেই খোলে আজকাল, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এখনো পথে বেরোয়নি, যানবাহন চলছে তা যেন কেমন খালি খালি। অফিস টাইমের ভীড় এখনো শুরু হয়নি। সত্তরের কলকাতার দিকে তাকিয়ে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই সুমিত্রার মনে কেমন ঝিমিয়ে আসার ভাব হল।

—ভাবী, কলেজ স্ট্রীটে থোড়া কাজ আছে আমার। চলুন কলেজ স্ট্রীট হয়ে যাই, আপনার আপত্তি নেই তো? বাড়ীতে ভাববে কি?

—না, একটুও না, আমি ত বাড়ীতে খবর দিয়েই আসিনি। কেউ জানেই না যে আমি আসবো। আমার এক দূর সম্পর্কিত দেবরের বিয়ে, সে এত অনুনয় করে লিখেছে তার বিয়েতে আসার জন্য, সেই জন্যেই হঠাৎ আমি এমনি করে চলে এলাম।

—সত্যি ভাবী, ডাকার মত করে ডাকলে সব বাধা অগ্রাহ্য করে ছুটে আসতে হয়। দেখলাম ত তুমি কেমন করে আচমকা সবাইকে যেন চমকে দিয়েই বেরিয়ে এলে। কতকাল তুমি পাঞ্জাব ছেড়ে বাইরে যাও না।

* * *

হ্যারিসন রোডের মোড়ে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে হরিকিষন নেমে গেল। চার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রার কেমন যেন অদ্ভুত লাগতে লাগল। এই পাড়াতে একদা ছিল নিত্য আনাগোনা। আজ মনে হচ্ছে বুঝি কোন দূর কালের স্বপ্ন সব। কাছেই তাদের আবাসিক হোস্টেল, ছাত্রাবস্থায় যেখানে থেকে সে পড়াশোনা করেছে। ইচ্ছে করে দেখে আসতে, নতুন কালের মেয়েরা কিভাবে থাকে সেখানে, কি তাদের ধ্যান, কি তাদের ধারণা, তাদের জীবন জিজ্ঞাসার ধারা কোন খাতে বয়।

তাদের হোস্টেলের ধীরাকে কি ভুলতে পারে সুমিত্রা, ধীরার কাছে আসতো সুপ্রিয়া, নন্দলাল বসু লেনের আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাশের মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকত। মেয়েটা কতদিন হোস্টেলের কড়া কানুন ভেঙে লুকিয়ে ধীরার কাছে এসেছে। কি করে এলি? পিসতুত দাদার বাড়িতে এসেছিলাম, সেখান থেকে এলাম। ধীরা সুপ্রিয়াকে কাছে রেখেছে কতদিন। সে ত হোস্টেলের

মেট্রনকে লুকিয়ে। তারা মিটিং করতে দুজনে বেরিয়ে যেত, ফিরত দেরীতে লুকিয়ে লুকিয়ে। দারোয়ান ভয় দেখাত, বলে দেবো মেট্রনকে বলে দেবো সুপারিনটেনডেন্টকে। মেয়েরা পর্যন্ত বলত, ধীরা একটু নিয়ম মেনে চল, এতটা আমাদেরও দৃষ্টিকটু লাগে। শুনে ধীরা রাগ করতো, অভিমান করত। বন্ধুরা একটু সহানুভূতি ত দেখাবে! তারাই যদি দুষমন হয় ধীরা তাহলে যাবে কোন চুলোয়। ধীরার ত একটা আদর্শ আছে জীবনে। ধীরা বেকার ঘুরে বেড়ায় না। ধীরা ঘোরে আদর্শের পেছনে।

যখন তখন, বলা নেই, কওয়া নেই, সুপ্রিয়া আসবে।

হ্যাঁরে সুমিত্রা একটু খাবার ব্যবস্থা করে দেনা। আমার প্রিয়া এসেছে রোদে তেতে পুড়ে।

—তোর প্রিয়া কবেই বা এমনিধারা আসে না তাই বলতো। খাবার সময় এলে ভাত খাইয়ে দেওয়া যায়, এখন কাকে দিয়ে কি আনাই!

বলতে বলতে সুমিত্রা চা, পাঁউরুটি, কলা বিস্কিট যা হাতের কাছে থাকতো সব দিয়ে অসময়ের অতিথির আতিথ্যের ব্যবস্থা করে দিত।

—হ্যাঁরে সুমিত্রা, দ্যাখ, মেয়েটাকে ত হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তাড়িয়ে দিয়েছে? বেশ করেছে, এমন দস্যি দজ্জাল মেয়েকে হোস্টেলের সুপারের সাধ্য আছে সামলায়। তা শ্রীমতী আছে কোথায় এখন?

—আছে পিসতুত দাদার বাড়ী। কিন্তু সমস্যা ত তা নয়। বৌদি ভালমানুষ আছে, আপত্তি করছে না যখন, তখন বৌদির ভেড়াকান্ত স্বামীটাও আপত্তি করতে পারবে না। থাকতে পারবে সেখানে। কথা ত তা নয়,বলতে বলতে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে ধীরার মুখে। ধীরা প্রায় কাঁদ কাঁদ মুখে বলেছে, সুপ্রিয়াটা, জানিস প্রেমে পড়েছে।

—এ্যাঁ, এমন খবরটা আগে দিসনি কেন? তা তোর এমন ভেঙ্গে পড়বার অবস্থা কেন? প্রেমে পড়া কি খারাপ? কত ছেলে না তোর প্রেমে পড়ে আছে?

—আরে দূর, নিকুচি করেছে, ও ছোঁড়াটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

—কেন ছোঁড়াটার দোষ কি?

—দোষ নয়? কে জানে তার প্রেম খাঁটি কি মেকি, কে জানে ওর চালচুলো কি আছে আর কি নেই, কে জানে আসলে ও কি চীজ।

—ছোকরা করে কি?

—করবে আর কি, এক অলস অধ্যাপক একটা নাম গোত্রহীন কলেজের।

—কলেজটা কোথায়?

—ঠিক কলকাতায় ত নিশ্চয় নয়, হবে শহরতলীর কোনখানে। সুপ্রিয়া বলতে চায় না কোথায় কি করে ওর সঙ্গে পরিচয় আর প্রণয় হয়েছে।

—বলতে চাইবে কেন। নিশ্চয় প্রথম থেকে তুমি এমন ত্যাড়া ভাব দেখিয়েছ যে ও আর ভরসাই পায়নি তোমাকে কিছু বলতে।

—আমার খুব রাগ হয়েছে জানিস সুমিত্রা, সেদিন রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে বড় মিটিংটা হল তাতে শ্রীমানের বক্তৃতা ছিল, চিন্তায়, ধ্যানে, পরিকল্পনায়, কর্মে রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় বিপ্লবী ছিলেন। গতানুগতিকতার রাস্তা তিনি যে কতখানি পরিত্যাগ করেছেন সেই সম্পর্কে প্রদীপ খুব ভালই বলেছিল, আমি ভেবেছিলাম সভা শেষ হলে প্রদীপের সঙ্গে এ নিয়ে একটু আলোচনাও করবো। ওমা সুপ্রিয়া যেই না ওকে দেখলো, লক্ষ্য করলাম দুচোখে যেন ওর আরতির দীপ জ্বলে উঠল। চোখ দুটো ওর কি সুন্দর, আরো যেন সুন্দর হয়ে উঠল।

সভা ভাঙার পর সুপ্রিয়াকে আর দেখতেই পেলাম না। কোন ফাঁকে বেরিয়ে চলে গেছে জানতেও পারিনি। ভীষণ বিরক্ত হয়ে রাস্তায় নেমেই দেখি দুজনে দূরে এসপ্লানেডের ট্রামে চড়ে বসল। আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম।

—তা তুইও কারো সঙ্গে কোথাও কেটে পড়তিস।

—আমি সুপ্রিয়া কিনা! দ্যাখ এত করলাম ওর জন্য, ও এখন এই ব্যবহার করছে! কোত্থেকে জুটলো এসে হতচ্ছাড়া, আর ও সব ভুলে গেল। হোস্টেলে কী ব্যবহার পেয়েছে, তখন ঠাঁই দিল কে? পিসতুত ভাইবৌকে কম পটিয়েছি আমি, যাতে ওকে রাখে। এই কলকাতা শহরে ত ও ভেসে যেত আমি না দেখলে।

—তা বলে এতখানি কৃতজ্ঞতা ওর কাছে দাবী করতে পারো না যে প্রিয়তমকে ঠেলে দেবে তোমার জন্য। প্রেমে পড়ে লোকে বলে পরিবার সমাজ, সংসার সব ভাসিয়ে দেয় আর তুমি এলে কোত্থেকে প্রিয় বান্ধবী? না, ঠাট্টা নয় ধীরা, নিজে নিজের রাস্তা দেখে নে। চিরটাকাল হোস্টেলে থেকে, মাঠে ময়দানে মিটিং করে কাটতে পারে না। করবি কি শেষ পর্যন্ত।

—আমার আদর্শ রয়েছে। রয়েছে বৃহত্তর পৃথিবীর অঙ্গনে, আমার সীমা ঘরের উঠোনে এসেই শেষ হবে না।

—ওসব লম্বা বুলি ছাড়, যৌবন ফুরিয়ে যাবার আগে কারো বাহুবন্ধনে ধরা দে। সেই ভদ্রলোককে আর হতাশ করিস না।

—সুমিত্রা, তোর হল কি, নিজে ত গেছিস, আবার আমাকে বলছিস, সুপ্রিয়ার মতো মরতে। কোন্ ভদ্রলোকের কথা বলছিস?

—আরে, তোর অ্যাড্‌মায়ারার অনেক আছে তা জানি কিন্তু সেই যে ভদ্রলোক হু ইজ ম্যাডলি ইন লাভ উইথ ইউ, তাকে একটা চান্স দেনা কাছে এগিয়ে আসার।

দিন গড়িয়ে গেছে। একদিন দুপুরে ধীরা সুমিত্রার হস্টেলে ঢুকে তার সুটকেশ হাতড়ে একটা লাল সিল্কের শাড়ি বার করল। বলল, সুমিত্রা, শাড়িটা সুপ্রিয়াকে দিয়ে আসি। একটা বিয়েতে যাবে নেমন্তন্ন খেতে। ওর একটা শাড়ি চাই। তোর ভয় নেই। শাড়িটা তোকে ফেরত দেব।

তিন দিন পর ধীরা একদিন রাত্রে এল সুমিত্রার কাছে। শোন সুমিত্রা, ছাদে চল। সুমিত্রা তাকিয়ে দেখে থমথম করছে ধীরার মুখ। ক্রোধ হতাশা বেদনা সমস্ত কিছুর মিশ্রণে তার শ্যামবর্ণ মুখখানা যেন ফেটে পড়ছে।

—ধীরা, এত রাত্রে ডেকে আনলি কেন বলত? দ্যাখ তাকিয়ে মাথার ওপর কালপুরুষ এসেছে মধ্য আকাশে।

—যা শুয়ে ঘুমিয়ে পড় এখন। স্বপ্ন দ্যাখ প্রিয়তম এসেছে চেটে দিচ্ছে তোর ফ্যাকাশে ঠোঁট। যে কাজ করছে সুপ্রিয়ার অবৈধ স্বামিটা।

—উঃ কি ভালগার ল্যাঙ্গোয়েজ তোর ধীরা? আর কি বললি সুপ্রিয়ার অবৈধ স্বামী? সে কি?

—তুই ত জানিস না ও বিয়ে করেছে। তোর লাল শাড়িটা পরিয়ে আমিই ত ওকে সাজিয়ে দিলাম বৌভাতের নেমন্তন্নে যেতে। শ্রীমতী সেটি পরে গেছে ম্যারেজ রেজিষ্টারের অফিসে। সেখান থেকে হোস্টেলে গিয়ে সেলিব্রেট করেছে বিয়ের উৎসব। আমি শুনলাম দুদিন পর। এ কয়দিন ও আমাকে মুখ দেখাতে সাহস পায়নি। আজ ভোরে এসেছিল দেখা

করতে কাল রাত্রে প্রদীপের কাছে শোয়া ওর অপবিত্র শরীরটা নিয়ে আমার কাছে। ওকে দেখে আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল।

—তোর কি মাথা খারাপ হল ধীরা? বিয়ে যদি ও করেই থাকে, আগুন শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে হয়ত করেনি, কিন্তু রেজিস্ট্রী অফিসে করলেও যাকে সে বিয়ে করেছে সে তার বৈধ স্বামী, তুই কি বলে বলছিস অবৈধ স্বামী? আর স্বামীর কাছে শুলে শরীর ওর অপবিত্র হবে কেন? আর তোর গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল? চমৎকার! ধীরা এটা একরকমের পারভারসন। তুমি প্রিয় সখী হতে পার কিন্তু তা বলে প্রেমিক পুরুষের প্রেম প্রত্যাখ্যান করবে আর তোমার সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াবে আর শহর চষবে রাজনীতি করার নামে এমন দুরূহ আশা তুমি করো কি ভাবে?

—না, তোর কাছেও কোন সান্ত্বনা নেই! দুহাতে আঙ্গুল মোচড়াতে মোচড়াতে তন্বী শ্যামলী তনুতে যেন তার একটা লোহিতাভ ঝড় উঠল। ধীরা অধীর হয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

—না, না, সুমিত্রা তুই বুঝছিস না। এটা তোর ঠিক হল না। প্রদীপটার শিখায় হতভাগী নিজেকে পুড়িয়ে খাক করে ফেলল, ওর আর অবশেষ কিছু রইল না।

—অবশেষে তোরই কিছু থাকবে না মুখপুড়ি, তোর কথাও ত কিছু কিছু কানে আসে।

—কানে আসে কিরে, আমি কি তোকে সব বলি না? ধীরার গলায় ব্যথার সুর বেজে উঠল।

—হ্যাঁ, সব বলিস কিনা জানি না, কিন্তু অনেক কিছুই বলিস। মুখ ফিরিয়ে রইলি অনেকের কাছেই, একজনের দিকেও প্রসন্ন মুখে তাকালি না। এই কি ভাল করলি? যৌবন ভাতি কি চিরকাল থাকবে রে? সাদা চুল কুঞ্চিত শরীর যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া সেদিনের কথা ভেবে দেখেছিস? তোর উপায় হবে কি?

—তুই যখন বহু সন্তানের জননী হবি, আমি তখন বুড়ি আয়া হবো তোর ছেলেমেয়েদের। লঘু পরিহাসে এবার কিছুটা হাল্কা হল ধীরা। হ্যাঁরে সুমি সেই ইঞ্জিনীয়ারটা বিদেশ থেকে ফিরবে কবে?

সেই ইঞ্জিনীয়ারটি তাকে নিয়ে গেছে অনেক দূরে, পাঞ্জাবের দূর প্রান্তে। পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ কত দূরে দূরে যে তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। কতদিন সে এদিকে আসতে পারেনি।

এতদিনে সুযোগ এল। দেবর ভাস্কর চিঠি লিখেছে তার পায়ের ধুলো না নিয়ে সে বিয়ে করতে কিছুতেই যাবে না । তার বিয়েতে বৌদিকে আসতেই হবে।

ভাস্করের ভাবী পত্নী তার নিজেরই মনোনীতা। সেই জন্যেই আরো আগ্রহ ভাস্করের। জানি বৌদি তুমি সেকেলে হয়ে ফুরিয়ে যাওনি আমাদের পরিবারের অন্যান্য ফসিলদের মত। আমি অন্যজাতে বিয়ে করছি, তোমার আশীর্বাদ চাই-ই। তুমি নিজে না আসতে পারলে, দাদা ছুটি না পেলে, আমি যাবো তোমাকে আনতে।

তা নিজেই এসেছে সুমিত্রা। অনেকদিন কলকাতা আসেনা, এবার ভাস্করের এতটা আগ্রহেই একদিন সে ট্রেনে চেপে বসলো।

এখানে সারারাস্তায় সে দেখেছে দেয়াল ভর্ত্তি লেখা। দেয়ালের লেখা পড়তে পড়তে শেষ যেন তার হয় না। কারা কখন সারা শহরটা নানা বিপ্লবাত্মক কথায় মুড়ে রেখেছে। দোকান পসার বাড়ীঘর সমস্ত কিছুরই দেয়াল ভরে লিখে রেখেছে। কত তাদের উৎসাহ,

কত তাদের উদ্দীপনা। পড়তে পড়তে সুমিত্রার মনে হচ্ছিল আগুনের লেলিহান শিখা সমস্ত শহর ঘিরে এখনই বুঝি জ্বলে উঠবে। এতদিন পাঞ্জাবে বসে কিছুই ত বুঝতে পারেনি। সেখানে গেছে আকালি আন্দোলন। মাষ্টার তারাসিং-এর কঠোর উপবাস, ভাষা আন্দোলন, শের-ই পাঞ্জাব প্রতাপ সিং কায়রোর হত্যা, আবার সেই ভয়ানক হত্যার প্রতিকার না হতেই দ্বিধা বিভক্ত পাঞ্জাবের পুনরায় বিভাজন। কিন্তু সে সব ত কিছুই না যেন বাংলার এই চাপা অগ্নির তাপের কাছে। অন্তত দেয়ালের লিখন পড়তে পড়তে এই ত মনে হচ্ছে। আহা, প্রতাপ সিং কায়রোর কথা মনে পড়ে। এক পাগলের হাতে তার মৃত্যুর ফলে লাভ কি কিছু হয়েছে পবিত্র পাঞ্জাবের ভূমির? কিছুই কিনারা হলনা তার মৃত্যু রহস্যের। আর কাগজগুলো এমন পিছনে লেগেছিল লোকটার বলার নয়। দিল্লীর একটি ইংরেজি দৈনিকই কি কম? ব্যাডম্যান ব্যাডম্যান বলে বার বার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাকে চিত্রিত করা কি জানি কতটা সঙ্গত হয়েছে। এক এক সময় মনে হয়েছে এই পত্রিকাটা আগেই কায়রোকে হত্যা করেছে, পরে তার লাসটাকে গুলি করেছে হত্যাকারী।

খণ্ডিত দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে কি লাভ হল পঞ্চনদবাসীরাই জানে। কায়রো থাকলে এটি হত না। এই যে পাঞ্জাববাসীর পারক্যাপিটা ইনকাম সারা দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি এ কার জন্য? এই বহুনিন্দিত ব্যক্তিটির অবদান কি কিছু নেই? ট্রেন থেকে নেমে অবধি সুমিত্রা সারা পথে খালি যেন উপবাস শীর্ণ মুখ দেখতে পাচ্ছে, স্বাস্থ্যবান পুরুষ বা নারী তেমন ত কই খুব বেশি চোখে পড়ল না। তবে হ্যাঁ একটা জিনিষ নজরে পড়েছে বৈকি, সমস্ত মুখে অপরিচয়ের ঔদাসীন্য আর নির্লিপ্ততা দেখছে, যত লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। অনুরাগের চিহ্ন বা পরিচিতির প্রশ্রয় কোন মুখে লেখা নেই। এমনটি যেন আগে কখনো দ্যাখেনি। কত লোক কলকাতায়, সবাই কি রিফ্যুজি? ওদেশেও আছে রিফ্যুজি, কিন্তু বাংলার মত ভয়ঙ্কর দুর্দশা ত তাদের একেবারেই নয়। সারা শহরব্যাপী এই দেয়ালের লিখনের সঙ্গে বিশীর্ণ চেহারার যেন কোথায় একটা নিগূঢ় যোগসূত্র আছে।

এই দেয়ালের লেখা পড়ে সুমিত্রার মনে পড়ল এই ধরনের লেখা দেখে এসেছে কেদার বদরীর পথে হিমালয়ের গায়ে গায়ে লেখা। সেখানেও পেয়ে এসেছে আর এক ধরনের প্রস্তুতির আভাষ।

এখানে ত দেয়ালে দেয়ালে লেখা।

নকশালবাড়ীর লাল আগুন সারা ভারতে জ্বলছে, জ্বলবে।

শ্রীকাকুলম ভারতের ইয়েমেন।

চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।

মাওর মত আমাদের মত। মাওর পথ আমাদের পথ। এখন অনুশোচনার সময় নয়। এখন বদলা নেবার সময়। পুলিশ খুন চলছে চলবে।

ধনীর গায়ের চামড়া দিয়ে গরীবের জুতো তৈরী হবে। বন্দুকের নলের মধ্য দিয়েই বিপ্লব আসে।—চেয়ারম্যান মাও।

আরো কত কি এতটুকু সময়ের মধ্যে সুমিত্রা দেখল। আবার দূর উত্তরে, হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে পর্বত প্রাচীরের গায়ে গায়ে আর এক রকমের লিখন, আর এক রকমের শিলালিপি। দুটো একটা এখনো মনে ভাসে।

জাগ ওঠা হিন্দুস্থান চাও মাও সাবধান।

জো হামসে টকরায়েঙ্গে চুর চুর হো জায়েঙ্গে।

দেশ কি রক্ষা কৌন করেঙ্গে? হাম করেঙ্গে হাম করেঙ্গে।

বাঁক ঘুরে ঘুরে গাড়ী যায় আর চোখে পড়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই সব লিখন। যোশীমঠে যে সভা হল তাতে আশেপাশের সমস্ত পাহাড়ি স্কুলের অনেক ছেলেমেয়েরা ছিল সুমিত্রা দেখেছে। নিষ্পাপ সুকুমার সব মুখ। দু এক জনার সঙ্গে সুমিত্রা একটু কথাবার্ত্তা বলেছে। তাদের মুলুক বর্ডারে। দুষমন এলে তারা মিলিত প্রতিরোধে তাদের হাটিয়ে দিতে পারবে এ বিশ্বাস যেন তাদের মর্মে গাঁথা। কি সুন্দর সব কিশোর। ফর্সা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিষ্পাপ সব। দুজন দশম শ্রেণীর ছাত্র গান গাইল দেশাত্মবোধক গান। যে আমার দেশ চামোলী, রুদ্রপ্রয়াগে আসবে আমাদের ঠোকরাতে, তাদের আমরা দেখে নেব।

* * *

সুমিত্রা চার দিকে তাকিয়ে দেখল ট্রাম বাসে আস্তে আস্তে ভীড় হচ্ছে, রাস্তায় লোক চলাচলও অনেক বেড়েছে। বহুকাল পর এই ভীড়। এই কর্মব্যস্ততা দেখে তার বেশ ভালই লাগল।

ট্রেনের ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। দক্ষিণের বাসিন্দা কৃষ্ণ শাস্ত্রী। বহুকাল পাঞ্জাব প্রবাসী, কাংড়াতে থাকেন পাহাড়ে। চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ বছরেরও অধিক কাল পর তিনি কি কাজে যেন কলকাতা এলেন। দীর্ঘকাল কলকাতায় ছিলেন, বাংলা ভাল শিখেছিলেন, এখনো ভালই বলেন।

বলছিলেন কলকাতা ছাড়ি যে বছর দেশবন্ধু সি আর দাশ মশাই মারা যান, আর এতদিন বাদে আবার আসছি। Then Calcutta will be revisited, সুমিত্রা হেসে বলেছিল।

—হ্যাঁ তাই, এই দীর্ঘকালে শহর কলকাতার কতটা পরিবর্তন হয়েছে, চিনতে পারবো কিনা তাই ভাবছি। বন্ধু বান্ধবরা আমাকে চিনবে কিনা তাই ভাবছি।

—তাঁরা কি কেউ আছেন? মানে আপনার বন্ধু বান্ধবরা?

—কেউ কেউ নিশ্চয় আছে। কেউ বা পরপারে চলে গেছে।

সুমিত্রা অবাক হয়ে ভেবেছিল সেই ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু মারা যান তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কত পরিবর্তন কলকাতার হয়েছে। তারপর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল বাদে এই ভিনদেশী ব্যক্তি কলকাতায় গিয়ে কি রকম বোধ করবেন। তার নিজেরই কেমন অদ্ভুত লাগছে।

—কি আত্মত্যাগ মিঃ দাশের। অতবড় ব্যারিষ্টার, অত ইনকাম। ব্যস সব ছেড়ে ছুড়ে রাজপথে এসে নামলেন কেমন অনায়াসে। উনি মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে মিলে স্বরাজ্যপার্টি করলেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যদি উনি দীর্ঘায়ু হতেন তবে ভারতের রাজনীতিতে মিঃ গান্ধী অনেক পিছনে পড়ে থাকতেন।

—বলেন কি? সুমিত্রা অবাক হয়ে সহযাত্রী ভদ্রলোকের দিকে তাকাল।

—বলছি আর কি, বাঙ্গালী মূর্খ তাই। নইলে গান্ধী গান্ধী করে অত না নেচে যদি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতো তারা, তা হলে তাদের দুর্দশা অনেক কম হত। জানো আমি শান্তিনিকেতনে গেছি, গুরুদেবের পায়ের কাছে বসবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমার ত মনে হয় গুরুদেবের সত্যদৃষ্টির তুলনা হয় না। বুঝলে না।

—বাঙ্গালীর ওপর আপনার কিন্তু খুব দরদ।

—হ্যাঁ, একে ত বহুকাল কলকাতায় কাটিয়েছি তারপর কাংড়াতে এখন থাকি, কিন্তু

জাতিতে আমি তেলেগু , অন্ধ্রদেশে ঘর। তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক মিল। আমাদের নাট্যকার বান্দা কলিঙ্গেশ্বর রাও বলতেন যে মাছ মাংস খাওয়া ছাড়া বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে তেলেগু সমাজের তফাত বড় একটা নেই।

—দেখুন, সুমিত্রা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিল। আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন। ইয়ারো নদীর পুনর্দর্শনের মত না অবস্থা হয়। কারণ ১৯২৫ সালের পর কলকাতার ত অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় হয়েছে।

—আহা তা ত হয়েছেই। আমি যখন কলকাতায় থাকতাম, ফ্লাস্কের গরমজলে কফি নিজেই তৈরী করে নিয়েছিলেন ; গেলাসে চুমুক দিয়ে বল্লেন, তখন কি জোবচার্ণকের কলকাতার কোন পরিবর্তন হয়নি ভেবেছ? জানো ত শহর নির্মাণে বুদ্ধির কৌশল, প্রাণের বিকাশ নয়। বুদ্ধির তাগিদে শহরের দ্রুত পরিবর্তন আর পরিবর্ধন। শহরই তাই বলতে পারে, 'পারিবেনা চিনিতে আমায়'।

সুমিত্রা এই বলিষ্ঠ শরীর বৃদ্ধের কথাবার্তা শুনে অবাক হল। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, ঠিক তা নয়। আমি ভাবছিলাম এ শহর আপনাকে এত দীর্ঘকাল বাদে কি রকম অভ্যর্থনা করবে? যদি স্বাগত না হন?

—নাই বা হলাম মা, স্বাগত হবার জন্যই কি সব জায়গায় যাওয়া? আমার কথা হল আমি যেন ভালবাসতে পারি। অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছি কলকাতার কথা। নেহেরু তো বলেইছিলেন দুঃস্বপ্নের দেশ, কিন্তু ভালোবাসলে আর চিন্তা কি। ভালোবাসাই আমাকে বুঝতে সাহায্য করবে এই সত্তরের দশকের কলকাতাকে, আস্তে আস্তে জননী তখন অবগুণ্ঠন খুলবেন, আমি দেখবো তাঁর মুখ ভালো করে।

চারদিকে সুমিত্রা দেখছে খালি পোষ্টার আঁটা আর নানা রকম লিখন। আর চারদিকে অপরিচিত মুখের মিছিল। মোটরে বসে বসে সুমিত্রা অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল।

* * *

বিয়ে চুকে গেল সুমিত্রার দেবরের।

মস্ত বড় বাড়ীর একতলায় তার স্বামীর জ্ঞাতি ভাই ভাসুররা থাকে, দোতলায় থাকেন তার শাশুড়ি দেবর ননদরা।

একটি বয়স্কা ননদ আছেন অবিবাহিতা, সম্প্রতি মাথায় একটু দোষ হয়েছে।

—রাস্তায় বেরিওনা বৌ কালো বেড়াল আছে।

—কালো বেড়াল কি করে বড়দি?

—জানো না বুঝি, কালো বেড়ালে ছিনতাই করে। বৌ ঝিদের দেখলেই হল, তাদের সব কিছু ছিনিয়ে নেবে। মান ইজ্জত পর্য্যন্ত।

—না বড়দি একা বেরুবোনা, ঠাকুরপোরা কেউ সঙ্গে যাবে।

—তা হোক বৌ, আবার হুলো বেড়ালও আছে। হুলোরা এসে ভাইদের আমার টুঁটি চেপে ধরবে। ওদের চেনো না ত। বড়দি চোখ বড় বড় করে হাঁফাতে লাগলেন।

বেচারি বড়দি। প্রথম যৌবনে একজনকে ভালোবেসেছিলেন। তার মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায়। তিনি চিরকুমারী রইলেন। কলেজে পড়াতেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, তারপর কলকাতার সাম্প্রতিক জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছিলেন না। কেবল বলছিলেন বাইরে কোথাও চলে যেতে পারলে হত। রেডিওতে, কাগজে খুনের খবর শুনে

অস্থির হয়ে পড়তেন। কলেজে যেতে চাইতেন না। রাস্তায় একদিন চোখের সামনে দেখলেন একটা লোককে খুব মারছে কয়েকটি তরুণ একসঙ্গে। লোকটা রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়েছে পথের ওপর। বড়দি একটা চলতি ট্যাক্সি থামিয়ে লোকটাকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার সাহায্যে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসেন। বাড়ী ফিরে তীব্র মাথাব্যথায় শুয়ে পড়েন। সেই থেকে কাউকে রাস্তায় যেতে দেবেন না, খালি কালো বেড়াল আর হুলো বেড়ালের ভয় দেখাবেন।

কিন্তু না বেরিয়ে পারে না সুমিত্রা। তার মাত্র সাত দিনের মেয়াদ। এতদিন বাদে এলেও বেশিদিন থাকতে পারবে না কারণ নিজের সংসার ফেলে এসেছে সেই সুদূর পাঞ্জাবে। ভাস্করের বিয়েও চুকে গেল। সুন্দর সপ্রতিভ মেয়েটি। স্বভাবে নম্রতা আছে তবু বলিষ্ঠ স্বভাবের ঋজু ছাপ চোখে মুখে। ভালবেসে বিয়ে করেছে। বাড়ীর লোক মা বাবা কেউ তেমন নাকি আপত্তি করেননি অন্যজাত বলে।

বিশ বাইশ বছর ত কম সময় নয়। তাদের সময় থেকে বিশ বাইশ বছর এগিয়ে গেছে দেশ। মেয়েরা পড়া-শুনার ব্যাপারেও ছেলেদের মত বিষয় নির্বাচন করে নিচ্ছে, ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ব্যারিষ্টারি থেকে শুরু করে নানা লাইনে যাচ্ছে। প্রেমের ব্যাপারে পতি নির্বাচনে তাদের প্রচুর স্বাধীনতা বিশ পঁচিশ বছর আগেকার দিনের চেয়ে। ভাল লাগে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সবল ও বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখে।

দেখা সাক্ষাতের পালাও কম নয়। এতদিন বাদে এসেছে ত। তার মা বাবা দিল্লীতে থাকেন। কিন্তু মামা-মাসিরা আছেন, আছেন বাপের বাড়ীর আরো অনেক আত্মীয়।

মেজ মাসিমার বাড়ী না গেলেই নয়। মেসোমশাই এতকাল অধ্যাপক ছিলেন। অবসর গ্রহণ করে বাড়ী গিয়ে ছাত্র পড়িয়ে নোট্‌স লিখে মন্দ উপার্জন করেন না। তার ছেলেও কোন কলেজে পড়ায়। সুমিত্রাকে দেখে আনন্দে কি করবেন ভেবে পেলেন না। এতদিন বাদে মনে পড়ল তোর আমাদের সুমি? কতদূরে যে চলে গেলি! তা ভালই আছিস, এখানে তেমন সুখই আর নেই।

—তোদের ওখানে পড়াশোনার ঝঞ্ঝাট ত নেই? ছেলে-মেয়েরাতো নির্ঝঞ্ঝাটে পড়াশোনা করছে—নারে? মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

—ওখানে হাইস্কুলে পড়াশোনার জন্য মাইনে লাগে না।

—টীচাররা মাইনে পান নিয়ম মত। ইউ. জি. সি. স্কেল ত ওখানেও হয়েছে শুনেছি। প্রবীরদা গলায় ঔৎসুক্য ঢেলে জিজ্ঞেস করল। কত ষ্ট্রাইক কত কিছু করে তবে টীচাররা দুটো পয়সার মুখ দেখতে পায় এদিকে। এরকম ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমানের সঙ্গে তাল রাখা কি সম্ভব আমাদের মাষ্টারদের, যদি না দুটো পয়সা বেশি দেয়। আমাদের গরীব মাষ্টারদের আছে কি? কোন সোশ্যাল ষ্ট্যাটাস না, কিছু না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করো, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করো বসে, খাবার বেলায় ঘাস পাতা। অফিসারদের পার্টি, হুইস্কি শ্যাম্পেনে যা খরচ হয় তার সিকি ভাগে আমাদের মস্ত পরিবার চালাতে হয়। প্রবীরদা উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল। যতক্ষণ সুমিত্রা ও বাড়ীতে ছিল মাষ্টারমশাইদের সব রকম কষ্টের কথাই শুনল, শুনলনা শুধু ছাত্রদের পড়াশোনা সম্পর্কে একটা কথাও। তাদের লেখাপড়ার মানটা কমেছে কিনা, কমলে তার কারণটা কি, কেন এত অসন্তোষ তাদের মধ্যে, তাদের বক্তব্য শোনার উপযুক্ত কিনা এ সব সম্পর্কে একটা কথাও শুনল না। সুমিত্রার মনে পড়ল তাদের মফঃস্বল শহরের সেই দরিদ্র মাষ্টার মশাই-এর কথা। তিনি গ্রাম থেকে শহরে আসতেন ছাত্র

পড়ানোর জন্য। দুপুর বারোটায় দুটি খেয়ে তিনি বেরুতেন। হাতে ঝোলান থাকত একটি ছোট লণ্ঠন। ফিরতে হত তাঁর রাত বারোটা। নিশুতি রাতে শেষ ছাত্রটি পড়িয়ে লণ্ঠনটি জ্বেলে নিয়ে হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ফিরতেন ঠাণ্ডা কড়কড়ে দুটি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ার জন্য। আশ্চর্য্য তাঁর ছাত্রদের অবস্থা ভাল ছিল, তা ছাড়া পড়াশোনায় ত ভালই ছিল তারা, সারাজীবনের পরম সম্পদ এই দরিদ্র শিক্ষকের কাছে তারা পেয়েছে। কিন্তু কোন দিন কারো মনে হয়নি মাষ্টারমশায় হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে আসেন আর যান, তাঁকে একটা টর্চ লাইট কিনে দিই! দুপুর বারোটা থেকে রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত তিনি আর কিছু খেতেন না। কোন ছাত্র বা ছাত্রের অভিভাবক সেটা কোনদিনই চিন্তাও করেন নি। সদাসন্তুষ্ট মাষ্টারমশায় তো নিজের কোন অসুবিধার কথাই কাউকে বলতেন না। বুঝতে অসুবিধে হয়না তাঁর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ দারিদ্র্য। অপুষ্টি, অর্থাভাবে চিকিৎসার ত্রুটি। এ সব অনেক দিনের কথা! গল্প কথা! এখন চতুর্দিকে দাবী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সদ্য নিদ্রোত্থিত দানবের মত। দাবী না মেটালে চলবে না। শিক্ষকরাও মানুষ, তাদের দাবী পূর্ণভাবে মানতে হবে নইলে রইল শিক্ষা সিকেয় তোলা।

ফেরার পথে রাসবিহারী এ্যাভিনিউর মোড়ে বাস থেকে সুমিত্রা দেখতে পেল সুচিত্রাদিকে, একটি কিশোর ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় কোন বাসে উঠবেন। কিন্তু সুমিত্রার দিকে চেয়েও সুচিত্রা তাকে চিনতে পারলো না। কিন্তু সুচিত্রাদির মা সদুপিসীকে কি ভুলতে পারে সুমিত্রা। তাদের শহরে ছিল পিসীর বাপের বাড়ী। বাপের সম্পত্তি অতি সাধারণ একটি বাড়ী তিনি পেয়েছিলেন। সেটির জন্য তিনি যাতায়াত করতেন সেখানে। অনূঢ়া কন্যাটির জন্য পাত্র দেখাও উদ্দেশ্য থাকতো। নিজের স্বামী সম্বন্ধে তিনি ব্যঙ্গ করে কথা কইতেন। বলতেন, দ্যাখ্ না, বাবা মা কুষ্ঠি ঠিকুজী মিলিয়ে আমার ত বিয়া দেন নাই, দিছিলেন বেউয়া। পিসেমশাই-এর উল্লেখ করে বলতেন তিনি ত চিরকাল নবকার্তিকই হয়ে রইলেন। আমার মরণ এই বিধবা কুমারী লইয়া। রাগের চোটে তিনি কুমারী কন্যাকে বলতেন বিধবা কুমারী। সেই কুমারীর বিয়ে থাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়েছিল ভাল ঘরেই। সদুপিসী সুখীই হয়েছিলেন জামাই পেয়ে।

সুমিত্রার খুব ইচ্ছে হল নেমে গিয়ে সুচিত্রাদির সঙ্গে কথা বলে, কতকাল পর দেখল, কিন্তু বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। দূরে মিলিয়ে গেল সুচিত্রাদির মুখ। তা যাক সুচিত্রাদি মিলিয়ে, সদুপিসীর মুখখানা তার মনের পটে চিরকালই আঁকা থাকবে। অনেক সময় পিতৃগৃহে পিসী একাকিনী আসতেন। ভাড়াটের কাছ থেকে টাকা নেবার জন্য। জীর্ণ গৃহখানি বিক্রী করার জন্য। তখন খেতেন সুমিত্রাদের বাড়ীতে। সারাদিন তিনি কোথায় কোথায় ঘুরতেন। অবেলায় এসে তাদের বাড়ী ঢুকতেন মধ্যাহ্নের আহারের জন্য সলজ্জভাবে। দেরী হবার জন্য লজ্জা প্রকাশ করতেন। কিন্তু প্রতিদিনই এইরকমই দেরী হত।

সুমিত্রা একদিন বলেছিল, পিসীমা, আপনি এমনধারা উদাসীন প্রকৃতির কেন? আপনার নিজের দিকে কোনও খেয়ালই নেই। আপনাকে দেখলে আমার বিষন্ন দিনাবসানের কথা মনে হয়। যে আকাশ আলো রিক্ত কিন্তু গোধূলির বর্ণালি ভাব থেকে বঞ্চিত, তারই সঙ্গে কোথায় যেন আপনার মিল আছে।

শুনে পিসী অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর বললেন, তুই কবি প্রকৃতির তবু শোন, শুধালি যখন, যবে থেকে মা বাপ আমাকে বিয়ার বদলে বেউয়া

দিয়েছেন তবে থেকেই আমি এমনিধারা হয়ে গেছি।

—পিসীমা, একটা যে কিংবদন্তী শুনেছিলাম। আপনার আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হলেও হতে পারত। তা কি সত্যি? তিনি নাকি খুব বিদ্বান ছিলেন?

—চুপ পোড়ারমুখি, সদুপিসী সভয়ে চারদিকে তাকালেন। যদিও তার পড়ার ঘরে তখন জনপ্রাণী ছিল না। শুধু পশ্চিমে সুপারি গাছের আড়ালে সন্ধ্যাতারা সবে মিটমিট করে তাকিয়েছিল তাদের দুজনারই দিকে। পিসীমা সুমিত্রার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলেন, কিংবদন্তী নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। আর শোন, পড়েছিস ত কামিনী রায়ের কবিতা, 'জ্ঞানের আলোকে নাথ তুমি হলে অগ্রসর অজ্ঞানের অন্ধকারে আমি যে বেঁধেছি ঘর।' জানিসত কার উদ্দেশ্যে লেখা। আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস এ হল বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক বোস-এর সম্বন্ধেই। তা যাক, এসব আলোচনার দরকার নেই। তুই যেন আবার সঙ্গীদের সঙ্গে এসব আলোচনা করতে যাসনে। তোর পিসে বিদ্বান ত নন, অতি সাধারণ, তবে কি তাতে আসে যায়!

* * *

রাস্তায় ভিখিরীর সংখ্যা কম নয়। এতদিন বাদে কলকাতা এসে সবই তার কেমন যেন নতুন লাগছে, অপরিচিত লাগছে সেই প্রথম দিনটির মতো যাকে দেখছে তারই মুখ। কোন মুখেই হাসির খুশির ঝিলিক নেই। প্রাণের উচ্ছ্বাস নেই, কেমন ভাবলেশশূন্য। গাড়ি থামলেই জানালার কাছে পয়সা চাওয়া ক্ষুধার্ত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা যেন দূরাগত কোন ধ্বনির রেশ শুনতে পাচ্ছে, মনে হয় শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ের মতো এবার আর এরা রাস্তায় শুয়ে মরবে না। ততদিনে কর্তব্যের মন্ত্রগুপ্তি এদের জানা হয়ে যাবে। একদিন ঝড়ের এঁটো পাতার মত উড়ে যাবার যারা তারা উড়েই যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। কেউ রুখতে পারবে না।

অবাক পৃথিবী অবাক! বাস থামতেই যে মহিলা উঠে সুমিত্রার পাশে বসলেন তার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রার বিস্ময়ের আর তল রইল না। কাঁধে ব্যাগ ঝোলান, চোখে চশমা, সরু পাড় সাদা শাড়ি গুছিয়ে আঁট-সাট করে পরা, একি তাদের গাঁয়ের আন্নাকাকীমা না অন্য কেউ! সাদা সিঁথি দেখে মনটা হায় হায় করে উঠল। সিধুকাকা কবে চলে গেলেন?

—কিরে। তুই সুমি না?

—কাকীমা তুমি? আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না।

কাকীমা হাসলেন। করবো কি বল? তোর কাকা মারা যাবার পর কি নিয়ে দেশে পড়ে থাকবো? তারপর ওদের বিশ্বাস ত কিছু নেই। তাই চলে এসেছি। কিন্তু আসবার পর দেখলাম স্থান এখানে কোথাও নেই। সতীনের ছেলে রাখতে চাইলেও বৌ পছন্দ করল না। নিজের ছেলে পার্টি করে বেড়ায়। লেখাপড়া শেখার জন্য বুকটা ছিঁড়ে ফেলে তাকে কলকাতা পাঠিয়েছিলাম, পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, কিন্তু এখানে এসে দেখি স্মরণশক্তিকে সে খুইয়ে বসে আছে। আমাকে যেন চেনেই না। বড় ছেলে বলে, চাকরি করে তাকে খেতে হয়, তার যেখানে সেখানে যাতায়াত করা, যখন-তখন বাড়ী ফিরে এসে হামলা করা ভাইকে রাখা মহা ঝকমারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটো খোকা যদি আমাকে নিয়ে আলাদা কোনো ঘরে থাকে সে বরঞ্চ ভালো, বৌমা স্পষ্ট বলল। কিন্তু ছেলে যে চিনতেই পারে না। আমিও বুঝতে পারিনা তার মুখের ভাষা ও বুলি। দেশে গাঁয়ে থাকতে স্বদেশীকরা ছেলেদের কি দেখিনি? তাদের কথা শুনিনি? কত মিটিং-এ দুপুরবেলা লুকিয়ে গেছি তারা কি বলে তা শুনে একেবারে কি কিছু বুঝতে পারিনি? এখন নিজের

পেটের ছেলে নাকি পার্টি করে, তারা কি বলে, ভাষা না খিস্তিখেউড় কিছু তা বুঝি না। যে বিধবা অনাথিনী পোড়ারমুখীকে পেটের ছেলে চিনতে চায় না তার স্থান কোথায় হবে কাকে তা শুধাবো? কিন্তু পোড়া পেট যে ছাই কিছু মানতে চায় না। সেই তাগিদেই দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। একটা স্কুলে মেয়েদের টিফিন তৈরী করি, কাছেই কলোনিতে একটা ঘর নিয়ে আছি। সৎভাবে পরিশ্রম করলে একেবারে যে টিকে থাকা যায় না তা নয় রে সুমি। তা তুই কোথায় থাকিস সুমি? সেই পাঞ্জাবেই ত? ছেলেমেয়ে কটি? তারা কোথায়?

সুমিত্রা বলবে কি, আন্নাকাকীমাকে যত সে দেখছে তত তার তাক লেগে যাচ্ছে। একগলা ঘোমটা দিয়ে উঠোন লেপতে, পুকুরে কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজতে দেখেছে যাকে, তাকে এই ভাবে বাসের মধ্যে দেখতে পাবে এবং এমন গুছিয়ে কথা বলতে শুনবে এ যেন তার স্বপ্নের অগোচর ছিল।

বৈধব্যই তাহলে তাকে এত স্মার্ট করেছে? মাটিতে পড়ে যাওয়া পাথরের বাটির মত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো না হয়ে গিয়ে আন্নাকাকী খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন শক্ত জমিতে বেশ শক্ত ভাবে। বৃদ্ধ স্বামী পরপারে পাড়ি দিলেন। পরের ছেলে নিজের ছেলে কেউ চিনলোনা। আতিথ্য বিহীন মহানগরীতে এসে দিশা হারালেন না ত, পুরনো সজ্জা পুরনো খোলসের মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন নতুন সাজে দাঁড়ালেন; তাঁকে আর চেনা যাচ্ছে না।

—আরে সুমি, আমার যে নামবার স্টপেজ এসে গেল, তুই আমার ঠিকানাটা—শোন, একদিন আসবি আমার কাছে, নয়ত আমার সঙ্গেই চল।

—ঠিকানা বলুন কাকীমা, আজ আর সময় হবে না। আমি সাতদিনের জন্য এসেছি মোটে, আর কদিন মাত্র আছি। যাবো এক সময়।

—কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা করিস মা, রাস্তাঘাটে বড় ছিনতাই-এর ভয়।

কাকীমা নেমে গেলেন। সুমিত্রা তাকিয়ে রইল। মনে পড়ল একদিন আন্নাকাকীমার সঙ্গে কাকার তুমুল কলহের কথা। কাকীমা গিয়েছিলেন বিকেলবেলা হাইস্কুলের ময়দানে মিটিং-এ। সেদিন বিখ্যাত এক দেশনেতা এসেছিলেন। তাঁকেই দেখতে। কাকা টের পেয়ে রেগে আগুন।

—মর্দাগো সভায় যাওনের কি হইছিল? আমি মরলে রাঁড়ি হইয়া ত ঘুইর‍্যা বেড়াইবা পীরের ষাঁড়ের মত। অখন থিক্যাই প্র্যাকটিস না করলে অয় না?

আন্নাকাকীও বোধহয় সভায় ভাষণ শুনে সেদিন উত্তেজিত হয়েছিলেন। ঘোমটার মধ্য থেকে কাঁচকলা দেখিয়ে বলেছিলেন, আহারে। সেই ডরে ত বুড়ার চক্ষে অখনই নিদ্রা ঘুইচা গ্যাছে গো!

—আমি তোমারে থোড়াই কেয়ার করি। কেবল এইটুকুরে। সিঁথিতে হাত দিয়ে দেখিয়ে সুধা রক্তচক্ষে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলছিল।

* * *

ঠিক সেই সময় সুমিত্রা মাসীমার সঙ্গে মামার ঘরে ঢুকছিল। থমকে গেলেন মাসীমা। থমকে গেল মামাতো দাদা। শুধু থমকালো না সুধা বৌদি।

সুশান্ত যেন অকূলে কূল পেল সুমিত্রাকে দেখে।

ওমা, সুমি যে। এতদিনে আসতে পারলি পাঞ্জাব থেকে, কতদূরে গেলি আর আমাদের

কি মনেই পড়ে না? সুশান্তর গলার সুরে একুট অভিমান ফুটে উঠল।

—খুব ভাল করেছে যে অতদূরে গিয়ে আছে আর আসেই না প্রায়। সুধা কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলল। এখানে থাকলে পরিজনের চাপে পিষে মরে যেত। ঘরে থাকতে ঠাঁই মিলত না। পরিজনকে ঘর ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হত!

—সুমি বোস তুই, মা তুমিও বোস। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বল্ল, কেন তুমি বার বার এক কথা বলছ। অসম্ভব কথা।

—সুমি, তুই কথাবার্ত্তা বল। আমি পুজোটা সেরে আসি! মামীমা সরে গেলেন ওখান থেকে।

—কি অসম্ভব কথা? বলছি মাকে আলাদা ফ্ল্যাটে রাখো। ঝি রাঁধুনী সব রেখে দাও। কিছুতে শুনছো না। উনি এলেন কেন এখন জলপাইগুড়ি থেকে? আমাকে একেবারে পছন্দ করেন না বোঝাই যায়।

—পছন্দ করা না করার ব্যাপার কি খালি? স্পষ্ট বলোনা? সুশান্ত গলায় ঝাঁঝ ঢেলে বলল।

—বলেছি ত তাও। জায়গা কোথায় বাড়িতে। ড্রইং রুম, আমাদের বেড রুম, খোকার ষ্টাডি রুম, শোবার ঘর, খুকির শোবার ঘর, ড্রেসিং রুম, বক্স রুম, ষ্টোর। আর জায়গা কোথায়?

—আশ্চর্য তোমার হল কি? এতগুলো ঘরের মধ্যে আমার মায়ের শোবার ঘর হবে না। তাহলে এ বাড়ী করেছি কেন?

—সে তুমি জানো কেন করেছ। আমি 'ত ভেবেছিলাম আমার কথা ভেবেই তুমি করেছিলে। অনেকের মা বাবাই আজকাল আলাদা থাকেন, কলকাতা শহরে কটা বাড়ীর খবর তুমি রাখো? দিন কাল বদলে গেছে, সোসাইটির এখন অনেক পরিবর্তন, বিশেষ এই কলকাতা শহরে। এখানে হাই সোসাইটিতে মিশে সেই একশ বছর আগেকার সমাজের নিয়মকানুন মানতে গেলে চলে না।

এই কলকাতা ! শুধু কি এই কলকাতায়?

সুমিত্রার মনে পড়ল চণ্ডীগড়ের খোসলা সাহেবের কথা। অমন চমৎকার মানুষ, কিন্তু গাঁ থেকে বৃদ্ধ বাবা যখন দুদিনের জন্য ছেলের কাছে এসেছিলেন। ঠিক একই রকম ব্যাপার, বুড়োর ছেলের বাড়ীতে একটা বসার ঘর, একটা ডাইনিং রুম, তিনটি বেড রুম, তাতে খোসলা সাহেব আর ছেলেমেয়েরা থাকে, বুড়ো বাবার জন্য বড় স্থানাভাব।

ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা খোসলা সাহেব বললেন, দেখা সাক্ষাত ত হল, চা পান করার পর বাবাকে বাসে তুলে দেওয়া হোক, বাবা গাঁয়ে ফিরে যান। এখানে থেকে কি হবে! সেখানে খোলামেলা জায়গায়ই বাবা ভালো থাকেন।

সুমিত্রা আর তার স্বামী সেদিন চণ্ডীগড়ে ওঁদের বাড়ীতেই উপস্থিত ছিল। ট্যুরে গিয়েছিল স্বামী, সুমিত্রা সঙ্গে গিয়েছিল। সেদিন বিকালে টি পার্টি ছিল খোসলা সাহেবের বাড়ি। সেখানে উপস্থিত ছিল নরিন্দর সিং । ছোকরা ইঞ্জিনীয়ার পি ডব্লিউ ডি'র। সে বলল, ক্যা হোয়া বাওজী (বাবুজী), ম্যায় লে জাউঙ্গা সাড্ডা ঘর। আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব বাবুজীকে। আমার বাবাও আছেন সেখানে।

যদিও আমাদের বাড়ীতে সত্যিকারেরই স্থানাভাব, বাবা মা, খুড়তুতো ভাইবোনেরা, আমার ভাই, ভাবী , তবু আমার বাবা খুবই খুশি হবেন একজন সঙ্গী পেয়ে। জায়গা হয়ে

যাবে, কারণ বাবার দিলে জায়গা আছে! গাঁয়ের যতলোক সবাইকে ডাকবেন, ভাবেনও না ছেলের শহরের বাড়ীতে জায়গা আছে কি নেই।

যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় নজন! সুমিত্রার মনে পড়েছিল তার ঠাকুমার কথাটা।

বাওজী তাস খেলতে জানলে ত কথাই নেই। দুই বুড়োতে জমবে ভাল। সন্ধ্যাবেলায় দুজনাতে একসঙ্গে পড়বেন ভাই বীর সিং-এর 'গুরু নানক চমৎকার' আর গাইবেন ভজন! ভোরে উঠে একসঙ্গে যাবেন গুরুদোয়ারায়! বাওজী যখন এসেছেন দুদিন থেকেই যাবেন।

নরিন্দর সিং হাসতে লাগল। কিউ বাওজী ম্যায় ভী ত আপকা লেড়কাহী হুঁ? ···বাবুজী আমিও ত আপনার ছেলেই?

চুকে গেল ল্যাঠা! বুড়ো চলে গেল নরিন্দর সিং-এর সঙ্গে।

কিন্তু কলকাতার সমাজেরও প্রায় একই চেহারা? ছেলে-বৌর কাছে মা-বাবা বুড়ো হলে থাকতে পারবে না? তাহলে তাদেরই বা কি অবস্থা হবে বুড়ো বয়সে? যেতে হবে পিঁজরাপোলে?

পূজা সেরে মামীমা আবার ঘরে এলেন। ছেলেকে বললেন, খোকা তুই আমাকে কাশীই পাঠিয়ে দে। আলাদা করে এখানে রাখতে তোর যা খরচ হবে কাশীতে তার থেকে অনেক কমেই হয়ে যাবে।

—ওঃ মা, কি যে বলো, কাশীর কথা মনে হলেই গায়ে জ্বর আসে আমার। বাবা বিশ্বনাথের ঘিঞ্জি গলি, রাস্তা জুড়ে শুয়ে বসে ঘুরতে থাকা ষাঁড় আর চিমটা হাতে সন্ন্যাসীর কথা মনে হলেই আমার কেমন করতে থাকে।

—সত্যি মামীমা, সুমিত্রাও হেসে বললো। দ্যাখো যেখানে আমি থাকি সে মুল্লুকে লোকে কি বলে জানো?

রাঁণ্ড ষণ্ড আউর সন্ন্যাসী
তিনসে বাঁচো ত ভজ কাশী।

রাঁণ্ড মানে রাঁড়ি বিধবা, ষাঁড় আর সন্ন্যাসী এই তিন থেকে বাঁচো তারপর কাশী ভজনা করো।

শুনে সুশান্ত হাসতে লাগল। শুনলে ত মা, কাশী যাবার নাম কোরোনা। তার বৌ বল্ল, মা যদি কাশী যেতে চান খুব ভাল কথা! কেন যাবেন না! সারা জীবন সংসার করলেন, এখন যদি মার ধর্ম কর্ম্ম করতে মন চায়, বাধা দেবে কেন?

—মা থাকবেন কোথায়? গেলেই ত হল না। পাঠালেই ত হল না, ছেলে আবার বল্ল।

—কত আশ্রম আছে কাশীতে। খোঁজ করলে সেখানে থাকা যাবে। বুড়ো বয়সে কাশী বাস করতে পারা সৌভাগ্যের কথা।

—বৌমা তুমি খোঁজ করো, আমি কাশীই যাবো। মামিমা দৃঢ়স্বরে বল্লেন।

সুমিত্রার ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ বসে কিন্তু সবারই ছিনতাই-এর ভয়। তাই বেশিক্ষণ বসতে পারলোনা। রাত্রি বেশি হলে মুস্কিল। এতদিন বাদে এসেছে, ইচ্ছে করে সবার সঙ্গে দেখা করে যায়, কিন্তু এত অল্প দিনে বড় কঠিন। ট্রামে বাসে অসম্ভব ভীড়, ভীড়ের ঠেলায় বাস থেকে নামতে কখনো দেরি হয়ে যায় দরজা পর্যন্ত পৌছাতে। বাসের মধ্যে অমনি ফোড়ন কাটতে থাকে নানা জনে। কি উগ্র ঝাঁজ কথায়। ভদ্রমহিলা একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে গেলেই ত পারত। গদাই লস্করি চালে বাসের মধ্যে চলা ফেরা করলে চলে? এমনি নানা কথা। আশ্চর্য লাগলো, কই এ সব ত বছর কয়েক আগে একটুও ছিল না। মহিলা বলে

সম্ভ্রম বোধ নেই, সাহায্য করার বিন্দুমাত্র প্রবণতা নেই, এরা সব কারা? এরা কি কলকাতা তথা বাংলাদেশের লোক? না এসেছে অন্য কোন গ্রহ থেকে হঠাৎ? প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করছে একটা কিছু।

—ম্যাডাম কি কালা? ঘণ্টি বাজছে শুনতে পান না? কানের ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে। সুমিত্রার মন বলে কেন এলাম, কোথায় এলাম! মন চলো নিজ নিকেতনে। অনেক ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায়। তার পেছনে ছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, পিছনের ধাক্কার চোটে তিনি এসে পড়লেন সুমিত্রার গায়ের ওপর।

—দে বুড়োকে কষে দু'ঘা, একটি সদিচ্ছার দৃপ্ত ঘোষণা কানে এল।

—মা আমি ইচ্ছে করে আপনার গায়ে এসে পড়িনি। ভয়ে ভদ্রলোক ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন।

—আমি জানি। আপনি নেমে যান, আপনার কোন ভয় নেই। সুমিত্রা দৃঢ়স্বরে বললো।

সুমিত্রা আর বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুজনেই নেমে পড়লেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন বৃদ্ধ, বেঁচে থাকুন মা, আজ আপনিই প্রাণ বাঁচালেন। কিসের মধ্যে যে আছি। কোন্ দিকে আপনি যাবেন মা, অনুমতি করেন ত আমি সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। রাত একটু বেশি হয়েছে, আপনি ত দেখছি একা।

—আপনি যাবেন কোথায়? সুমিত্রা পাল্টা প্রশ্ন করল।

—আমি থাকি রাধেশ্যাম কলোনিতে। হাঁটতে হবে অনেকটা।

সুমিত্রার মনে হল ওখানেই ত আন্নাকাকীমা থাকেন। আজ রাত্রের মত ওখানে আশ্রয় নিলে কেমন্ হয়? কোন দোকানে ঢুকে শ্বশুর বাড়িতে যদি টেলিফোন করে দেয় সে তার কাকীমার কাছে রাত্রে থাকবে তাহলেই হয়ে যায়।

কিন্তু কাকীমার কলোনিতে পৌঁছতে হলে আবার বাসে চড়তে হবে। তার ওপর হাঁটাপথ। বেশ রাত্রি হবে। তার চেয়ে ডোভার লেনে বাড়ী চলে যাওয়া ভাল। কাকীমার ওখানে দু-এক দিনের মধ্যে একবার যাবে। এখন বাড়ী ফিরে সে হয়ত শুনতে পাবে হরিকিষনের টেলিফোন এসেছিল। হরিকিষনের সঙ্গে সে আবার ফিরে যাবে পাঞ্জাবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নমস্কার করে সে এগিয়ে গেল একাই, না অত ভয় করলে চলবে না। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। এটা কি একটা কথা নাকি রাজপথ ভর্তি খালি চোর গুন্ডায়? সত্যিকারের মানুষ কেউ নেই?

বাকি রাস্তায় একটু ভয় তার করল না, একবারও মনে হল না পেছন দিয়ে কেউ তার ঘাড়ে হাত দেবে, ছিনিয়ে নেবে সরু মফচেনটা। মনে হল না কেউ কাছে এসে বলবে দিদিমণি, ঘড়িটা খুলে দিন ত।

ক্রাইম বলে যে বস্তু, সে কি পাঞ্জাবেই কম? এই তো কিছুকাল আগে কটি বাচ্চা চুরি হয়ে গেছে অমৃতসরে—তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল লুধিয়ানাতে। আম্বালা গার্ল মার্ডার কেস এখনো এত পুরনো হয়ে যায়নি। নিষ্পাপ পবিত্র কিশোরীকে পাড়ার মস্তান দাদারা স্কুল থেকে মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, তার মধ্যে মেয়েটির নিকটতম বয়স্ক প্রতিবেশী সর্দারজী বান্টা সিং ছিল, যাকে মেয়েটি আশৈশব চিনত। সে মেয়েকে শেষ পর্যন্ত মেরে রাস্তায় লাশ ফেলে দিয়ে পালাবার সময় অপরাধীরা ধরা পড়ে। এসব সব জায়গাতেই হয় বরঞ্চ কলকাতায়ই কম ছিল। এখন বুঝি এ শহরই হয়ে উঠল পায়োনীয়ার, আর কোন জায়গার সভ্যতার মাপকাঠি সেখানকার মেয়েদের অবস্থা। মেয়েরা যদি অবাধে,

নিঃশঙ্কায় রাজপথে বেরুতে না পারে, আপন ঘরে না থাকতে পারে তবে আর সে জায়গার রইল কি?

গলির মুখে একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সুমিত্রা কাছে গিয়ে দাঁড়ানমাত্র গলাটা বাড়িয়ে দিল। সুমিত্রা হেসে গলাটা চুলকে দিল। মিষ্টির দোকানের সামনে বসে আছে দুটো কুকুর শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। দোকানের ভেতরে তিনচার জন লোক টেবিলের কাছে বসে খাবার খাচ্ছে। তাদের চোখে ত কই কোনো ত্রাস নেই। মুখে কোন ভয়ের ছাপ নেই! ভাল লাগল সুমিত্রার। জীবনের স্বাভাবিক ছবি দেখতে এতো ভালো লাগে। রেডিওতে গান হচ্ছে। মধুর লাগছে। এত কিছুর মধ্যেও এখানে আকাশে বাতাসে গান। তাছাড়া কবিরা আছেন, আছেন শিল্পী ও সাহিত্যিকরা, তারা মরেন নি, তাঁদের বংশ লোপ পায়নি। এও কি জীবনের লক্ষণ নয়? জীবন মানেই ভয়-শূণ্যতা! বাড়ী ফিরেও তার জন্য বিস্ময় ও আনন্দ সঞ্চিত ছিল।

শ্রীপতি কাকা বসে আছেন।

—ওমা, তুমি কি করে এলে?

—সেই কখন থেকে বসে আছি তুই কখন ফিরবি।

—তা এলে কি করে তুমি? সীমান্তে কি বেড়া নেই?

—থাকলেই কি! জানিস সুমি বীরেনের সঙ্গে দেখা হল। আমরা এতকালের বন্ধু। অন্য পার্টিতে কাজ করলেও এখনো আমাকে খুব ভালবাসে।

—তাই ত! তিনি এম. পি. হয়ে দিল্লীতে কত আরামে আছেন নর্থ অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে, আর তুমি পাকিস্তানে পড়ে আছ, তাও লুকিয়ে চুরিয়ে থাকা। পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান। তা তোমাকে চিনলেন ত?

—চিনবে না, বলিস কি! মিটিং-এ এসেছিল এখানে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হল। দেখেই জড়িয়ে ধরল। ওর বাড়ী গেলাম ওর সঙ্গে। কত গল্প হল। ও একবার জার্মানির কোন একটা শহরে গেছে মিটিং-এ। সেখানে রাস্তায় এক মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ওকে দেখেই ভদ্রলোক ছুটে এলেন, বল্লেন, আপনি ভারতীয়? ও, কী আনন্দ হচ্ছে দেশের লোক দেখে। চলুন আমার আস্তানায়। ভদ্রলোকের আস্তানায় গিয়ে দেখে দুই সজ্জন সেখানে বসা। পরিচয় হবার পর একজন বলেন এখানে ইন্ডিয়ার লোক বড় কম। ভালই হল হামিদ একজন ভারতীয় বন্ধু পেল। বীরেন বল্ল, আমি ইন্ডিয়ান বটে কিন্তু হামিদ সাহেবের বাড়ী পা ···

—ঢাকায়, পাকিস্তান আর বলা হল না, মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে হামিদ বল্লেন। বীরেনকে বাংলায় বল্লেন, দেখুন এরা পাকিস্তান ফাঁকিস্তান কিছু বোঝে না, বোঝে ইন্ডিয়া, বোঝে টেগোর, গান্ধী, নেহরু। তাই এইসব হাঙ্গামায় না গিয়ে অনেকেই বলে বাড়ী ইন্ডিয়াতে। চুকে যায় ল্যাঠা! বুঝলেন? তারপর জার্মানির সেই শহরটা ছাড়ার পর মুসলমান ভদ্রলোক চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন? বীরেন বলে, কি করে যে প্লেনে উঠলাম সে কথা বোঝাই কি করে।

—কাকা, তুমি আর ফিরে যাবে না ত? সুমিত্রা ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞেস করে। তুমি যে এখন বুড়ো হচ্ছ, এখন ত ক্রমেই তোমার কর্মক্ষমতা কমে যাবে। একদিন বোমা তৈরী করেছিলে বলে সেই তাকত চিরকালই কি থাকে? প্রথম যখন দেশ বিভাগ হল, তুমি বল্লে এটাই আমার চিরকালের আপন দেশ। যে সব কচি ছেলেরা নিজেদের ভবিষ্যত বিসর্জন

দিয়ে আমার সঙ্গে এসেছিল দেশের কাজ করবে বলে তারা অনেকেই এখনো আছে। তাদের ফেলে কি আমি যেতে পারি!

তারা রইল না, তারা একে একে সবাই প্রায় চলে এল এ পারের নিরাপত্তায়। তুমি থেকে গেলে নেকড়ে ডালকুত্তাদের গ্রাসের আওতায়। তুমি চলে গেলে গ্রামের ভেতরে। তোমাব কাজ নাকি মাটির মানুষদের সঙ্গে। তোমার খোঁজ পাওয়াই কঠিন ব্যাপার হল। আজ তুমি জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছ, এই যে তুমি একা এলে আমার কাছে, ভয় হচ্ছে কি করে বেশি রাত্রে তুমি বাড়ী ফিরে যাবে। এ জায়গাও ত অপরিচিত তোমার কাছে।

—অপরিচিত এক একসময় লাগে বৈকি রাস্তাঘাটে লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে। যেন কত অপরিচিত সব মুখ।—সে মুখের ভাষা দুর্বোধ্য! মনে হয় আমিই বুঝি কোন দূর গ্রহ থেকে এসে পড়েছি। অনেক কাল আগে যাত্রা শুরু করেছিলাম, এখানে পৌঁছাতে অনেক বেলা কেটে গেল। এর মধ্যে বদলে গেছে সব।

—ওমা, কাকা, তুমি যে আমারই মত ভাবছ ? না আমিই তোমার মত ভাবছি। তা হবে, ছোটবেলায় যে তোমার কাছে মানুষ হয়েছিলাম। আচ্ছা কাকা, তুমি এলে কেন এখন?

—কি আশ্চর্য, মাকে দেখ্‌তে এসেছি, সবাইকে দেখতে এসেছি।

—ওখানে কে তোমাকে রেঁধে দেয়?

—থাকি যাদের নিয়ে তারাই রাঁধে। যত্ন করে খাওয়ায়, চাচী ফুফির অভাব নেই।

সুমিত্রা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বল্ল, এবার এখানে আসা সার্থক হল কাকা। তোমাব সঙ্গে দেখা হল কতকাল পরে। কিন্তু কলকাতার কি চেহারা হয়েছে দেখেছ? তোমার কি মনে হয় না দুঃস্বপ্ন?

—দুঃস্বপ্ন বৈকি। দুঃস্বপ্নের মতই মিলিয়ে যাবে, ভোরের সূর্য্য পরিস্কার আকাশে ঠিকই দেখা দেবে। এই রক্ত গোধূলিই শেষ কথা নয়!

—কাকা, তোমাদের ওখানে কেমন?

—আমাদের ওখানে ভালই রে সব। সেখানে অরুণোদয়ের আগের অবস্থা। আকাশের কোন কোণেই তমসার চিহ্নমাত্র নেই, ভাষা আন্দোলনের শহীদরা আলোক অভিযানের নির্ভীক পথিকৃৎ।

—কিন্তু কলকাতাকে দেখে যে কান্না পাচ্ছে আমার কাকা। হতাশ সুরে সুমিত্রা বলে।

শ্রীপতি উঠে দাঁড়িয়েছেন যাবার জন্য। রাত এগারোটার দিকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে। আর নয়। যাবেন অনেকদূর, টালিগঞ্জের ওদিকে।

—পাঞ্জাবে তুই ভাল আছিস ত খুকি?

অনেকদিন পর কাকার মুখে এই স্নেহ সম্ভাষণে কান্না পেল সুমিত্রার। ছল ছল চোখে তাকিয়ে রইল। কাকা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছেলে মেয়ে জামাই সবাই ভাল ত? তুই দিব্যি সবাইকে ফেলে একা একা চলে এলি, সাহসিকা হয়েছিস ত খুব?

—কাকা, তোমার নিজের সাহসও কম না। শরীর বিকল হচ্ছে তোমার চোখের দৃষ্টিতে তা বোঝার উপায় নেই।

—কি করবো রে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্য্যন্ত কাজই যেন করে যেতে পারি।

—তা পারবে, বার্দ্ধক্য কোন আদর্শবাদীকে অথর্ব করতে পারে না। জানো কাকা, তোমাকে এতক্ষণ বলতে ভুলে গেছি, আন্নাকাকীর সঙ্গে বাসে দেখা হল এর মধ্যে একদিন।

তাকে দেখে চেনা যায় না। বড় ছেলের ঘরে জায়গা হল না, নিজের ছেলেও পার্টি করে, মাকে দেখার সময় নেই, আন্নাকাকী নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছেন, কি স্মার্ট হয়েছেন, মনে আছে ত তোমার, কি ছিলেন আগে?

—মনে নেই আবার। গ্রাম্য ঘরকুনো মহিলারা সবাই বিধবা হয়ে দারুণ স্মার্ট হয়ে যান কত দেখলাম। কাকা হাসতে থাকেন।

পরদিন রাত থাকতে সুরু হল তুমুল বর্ষণ। এই বর্ষায় বাইরে বেরুনো সম্ভবই হবে না। খুব ভোরে উঠে সুমিত্রা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের বর্ষণ দেখছিল। রাস্তা ঘাট জলে থইথই করছে। দূরে বড় রাস্তায় যানবাহন চলাচল সুরু হয়েছে বটে, কিন্তু এত বৃষ্টিতে সব ভিজে চুপসে আছে যেন। চারিদিকে আবছা কুহেলিকার ভাব সৃষ্টি করেছে, বারিধারাপাত। কিন্তু আগের কলকাতায় বর্ষায় যে মজা ছিল এখন আর তা কোথায়? হোস্টেল থেকে সে চলে যেত কর্ণফিল্ড রোডে মেজ পিসির বাড়ী, নারকেলগাছগুলি হাওয়ার দাপটে এদিকে ওদিকে কেমন মুচড়ে মুচড়ে পড়ত এখনো মনে ভাসে। জলের শব্দ, হাওয়ার হাহাকার, গাছের মর্মর, সব কিছু মিলিয়ে সেই সব বর্ষা কি চমৎকারই না লাগত। পিসীর বাড়ীর খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজার স্বাদ জিভে এখনো লেগে আছে।

সেই কলকাতা কি হারিয়ে গেল? কতদিন রাত একটু সামান্য বেশী হলে দারোয়ানকে বলে হোস্টেল থেকে সে আর ধীরা ট্রামে চেপে চলে যেত চৌরঙ্গী, ফিরে আসত আবার এই ট্রামেই। ভাল লাগত জনবিরল হয়ে আসা চৌরঙ্গীর আশপাশ, রাস্তাঘাট সমস্ত কিছু। এখন সেদিন কি আর আছে? ভয়ভীতি আশঙ্কায় আকীর্ণ জনপদ সড়ক, যানবাহন সমস্ত কিছু।

দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন আর যুদ্ধোত্তর কলকাতার পথেঘাটে মানুষের মিছিলে ছিল যেন একটা প্রত্যাশার ছবি, এখনকার ছবির ভাষা পড়া কঠিন। দুঃখ, ক্রোধ, হতাশা সব কিছু মিলিয়ে এর চেহারা বড় বেশি করুণ আর অপরিচিত লাগে।

একথাও বলা চলেনা যে এখানে তা বলে কোন গতি নেই, কোন গান নেই, নেই কোন্ উদ্যম বা কর্ম্ম প্রচেষ্টা। শুধু অন্ধকারের মুকুট পরে একটি মহানির্জন চারদিকে অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছে। প্রাণ আছে, আছে গান, আছে কাজও, কিন্তু তা কোথায় আর কি ভাবে তাই বুঝি খুঁজে বার করতে হবে অন্বেষীর।

—ও বৌ। তোমাকে বুঝি কালো বেড়ালে ভয় দেখিয়েছে সাত-সকালে? বড়দি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কাঁচা-পাকা চুলে অনেকদিন তেল পড়েনি। একটু রুক্ষ, চেহারায় একটা পরুষ বিবর্ণতা। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সুমিত্রা ব্যথিত স্বরে বলে উঠল, দিদি আপনি এমন হয়ে গেলেন কেন?

বড়দি চুপ করে রইলেন। আকাশের দিকে একবার তাকালেন। একবার তাকালেন দেয়ালে ভর দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে, তারপরই কি যেন তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেলে তিনি দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

—বৌমা, তোমার ত যাবার আর কদিন মাত্র বাকি, যাবার আগে রাধেশ্যাম কলোনিতে নিয়ে যাবে একবার আমাকে আর তোমার ননদকে। শাশুড়ি জিজ্ঞেস করেন।

—কেন মা? ওই কলোনিতেই ত আমার এক কাকিমা থাকেন। আমি তাঁর কাছে একবার যাবো ভেবেছিলাম।

—তা হলে মা নিয়ে চল। সেখানে কর্ত্তার বন্ধু শ্যামসুন্দরবাবুর বাড়ীতে নাকি এক

বাবাজী এসেছেন সিদ্ধপুরুষ; একবার মলিনাকে নিয়ে যেতাম। ছেলেরা ভয়ে এখানে সেখানে যেতে চায় না। তুমি যদি সঙ্গে যাও তবে সাহস করি।

—আমিও ত মা নতুন মানুষ এখানে। তবে চলুন যাওয়া যাক। বৃষ্টি ধরলে দুপুরে যাওয়া যাবে।

* * *

আঃ বর্ষণধৌত কলকাতা শহরের পথঘাটের কি বা ছিরি ! এই বিপুল জঞ্জালভার থেকে কি করে মুক্ত হবে এই বিশাল শহর কে জানে। উন্নত ধরণের পয়ঃপ্রণালী ও বিশুদ্ধ জলসরবরাহ ব্যবস্থা এই দুটোর অভাবে এ শহর যে কত দিকে মরতে বসেছে কে তার খোঁজ করে। আবার রাস্তার দুপাশের পোষ্টারগুলির লিখন মরণের আতঙ্ক ছড়াচ্ছে জনপদবাসীর মধ্যে, সুমিত্রা বুঝতে পারছে কিরকম যেন একটা চাপা ভয়ে ত্রাসে আতঙ্কে অস্থির সবাই। বিদ্যুৎচমকের মত যে একটা নব আন্দোলনের আবির্ভাব হয়েছে এবং দেশের প্রশাসনকে অতর্কিত আঘাত করছে এটা সে এ রাজ্যে এতদিন পর নতুন এসেও বেশ বুঝতে পারছে। বেকারত্বের জ্বালা নৈরাশ্যপীড়িত করছে যুবকদের, তাদের তাই বুঝি কোন পথের বিচার নেই, স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তাধারার বদলে পরাজিতের আক্রোশে আর জ্বালায় ভরে গেছে তাদের মন। তাই পড়াশোনায় অত্যন্ত ভাল যারা তারাও যেন অন্য ধারায় চিন্তা করছে, রাজনৈতিক সাবালকত্বের বদলে তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে বুঝি রোমান্টিক যুব মানসের লক্ষণ।

আকাশ পাতাল কত কি ভাবতে ভাবতে একসময় সুমিত্রা শাশুড়ি ননদকে নিয়ে রাধেশ্যাম কলোনিতে পৌঁছে গেল।

দালানের বেশ প্রশস্ত বারান্দায় সন্ন্যাসী বসে ছিলেন, গেরুয়া বসনের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে শরীরের গৈরিক রক্ত। সুমিত্রার মনে হল দেখে বড় চেনা। কোথাও ওঁকে যেন দেখেছে। শাশুড়ি প্রণাম করলেন। বড়দি হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। প্রণাম করল সুমিত্রাও।

—এসো মা বোস। কোথা থেকে এসেছ মা? কাছে এগিয়ে বসলেন সুমিত্রার শাশুড়ি। মা, নিজের মেয়েকে দেখিয়ে বল্লেন। এরই জন্য এসেছি বাবা। এই মেয়ের জন্যে চিত্তে আমার শান্তি নেই।

সব শুনলেন প্রাচীন সন্ন্যাসী। শুনে বল্লেন, মা। এর কোন মন্ত্রগুপ্তি আমার ত জানা নেই। যে ঘরের আমি ছেলে মা সেখানে সিদ্ধাই চলে না। ভগবান রামচন্দ্র নিজে বলেছেন, ভাই লক্ষ্মণ, অষ্টসিদ্ধির একটি চাইলেও আমাকে পাবে না।

তবে আছে মা ওষুধ, তাঁর নাম, সব দুঃখেরই অবসান হয়।

সুমিত্রা অবাক হয়ে শুনছিল, আজব শহরে এসে এই বুঝি তার শেষ বিস্ময়। এই বলিষ্ঠ শরীর সন্ন্যাসীকে সে কোথায় দেখেছে কিছুতে মনে করতে পারল না। মনের অন্ধকারে সন্ধানী আলো ফেলে সে হাতড়াতে লাগল।

সন্ন্যাসী একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। চিনতে পারছ না ত? বেশিদিনের কথা ত নয়, যোশীমঠে দেখনি সেবার? সন্ন্যাসী হাসতে লাগলেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। বাইরে শিবমন্দিরের কাছে বাঁধানো গাছতলায় বসেছিলাম, আপনি তিনজন সাধুর সঙ্গে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন। এবার চিনতে পেরেছি আপনিই সেই। এমন এক পলকের দেখা ত তাই মনে নেই। কিন্তু খুব প্রখর আপনার দৃষ্টি ও স্মরণশক্তি।

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসছিলেন। মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন,

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ,
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।

তুমি আর আমি হে অর্জ্জুন বহু জন্ম পার হয়ে এসেছি, তুমি ত জাননা কিন্তু আমি জানি।

সুমিত্রা জানে এর অর্থ, কিন্তু তাতে কি, বহু জন্ম ত বহুদূরের কথা, সুমিত্রা এ জন্মেরই কি কিছু জানে? ওমর কবির কথা মনে হয় :

কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ।
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে, হেথায় বা মোর কিসের কাজ।

না কিছুই ত সে জানে না। জীবনসূর্য্য প্রায় পশ্চিমে ঢলে পড়ল। পূরবীর ছন্দে জীবনে এবার শেষ রাগিণীর বীণা বাজতে শুরু করেছে কিন্তু কই, পরীক্ষা পাশের জন্য পড়ল কত, ঘুরল কত দেশ, দেখল কত কিছু। জীবন তার রহস্যের স্থির যবনিকাটি খুলল কোথায়? অব্যক্ত ব্যক্ত ত হল না মনের আকাশে। শুধু কি জানি কেন এই সন্ন্যাসীর মধ্যে ক্ষীণ একটি চকিত আভাস বুঝি পাওয়া গেল তার, মনে হল সে যেন একটি বন্ধ আঁধার ঘরের একটি ক্ষুদ্র ফোকর থেকে বাইরের আলোর একটুখানি ছটা দেখতে পেল, মনটা তার অকারণ একরকম প্রসন্নতায় ভরে গেল। এই প্রসন্নতার রূপরেখা কিছুই সে বুঝতে পারছ্নো, তবু মনে হল একটা কিছু যেন ধরার আছে, সেটি ধরতে পারলে অনেকখানিই বোধহয় নির্ভয় হওয়া যায়।

—কি নাম তোমার বাবা? সন্ন্যাসীর নজর পড়ল সদ্য আগত একটি কিশোরের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রাও দেখল তাকে।

কিশোরের মাথার চুল বুঝি অনেকদিন ছাঁটা হয়নি। দুটি চোখের তারায় কেমন একরকমের অগ্নি ইসারা, ময়লা বা শ্যামল গায়ের রঙে খোলা তরোয়ালের তীক্ষ্ণ আভাস।

কিশোর সন্ন্যাসীর কথার উত্তর দিল না। পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনার পাশে কি বই রাখা? গীতা? কি হয় আজকের দিনে ওসব বই পড়ে?

—পড়েই দ্যাখোনা কি হয় নিজেই বুঝবে।

—আমাদের অত সময় নেই, আপনি পড়েন তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, সময় নষ্ট ছাড়া, এনার্জি নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কি হয়?

—এনার্জি নষ্ট হয় না, বরং শরীরে আর মনে তাকত হয়—মানে শক্তি সঞ্চয় হয়। পড়েই দ্যাখোনা। এর প্রতিটি শব্দের মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্যুত শক্তি প্রচ্ছন্ন। সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন।

—অত সময় আমাদের নেই বলছি ত। কোথায় থাকেন আপনি জানি না। কলকাতায় এসেছেন কি উদ্দেশ্যে তাও রহস্যময় কিন্তু আপনার মত পরাশ্রয়ী জীবদের ভুঁড়ি ফাঁসানোই বিধেয়।

ছেলেটির চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরায়।

বারান্দায় সুমিত্রারা এবং অন্য সকলেও স্তম্ভিত। শুধু সন্ন্যাসী স্থির অবিচলিত।

—ভিখারীর মত পরাশ্রয়ী, ভেক ধরে আছেন বেশ। বিদ্রূপে বক্র হল কিশোরের ঠোঁট।

—ভিখারী ভিক্ষা নেবার আগে বলে নাকি হরেকৃষ্ণ ? একমুঠি চাল দাও তাকে আবার সে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর নাম। এ কম দেওয়া হল না বাবা। সাধুও তেমনি সমাজকে দেয় কিছু, কিন্তু কি যে দেয় তা জানতে হলে তোমাদের আপন সমাজ সংস্কৃতি ভাল করে আগে জানতে হবে। নয়ত হবে না। সাধুর ভুঁড়ি ফাঁসানো ত কিছুই নয়। খুবই সোজা, অনেক কঠিন হল ভারতীয় মনকে ফিরিয়ে আনা। গত দ্বিতীয় যুদ্ধকাল থেকে

কালো টাকা, অশ্লীল সিনেমা, বাজে পত্রিকা, মেয়েদের পতিতা বৃত্তি, মদের প্রভাব এ সমাজকে জীর্ণ করে ফেলেছে সমস্ত দিকে। জাতীয় চরিত্র হনন অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, তোমরা বুঝি তাই দাঁড়িয়েছ কালাপাহাড়ের মত সব ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দেবার জন্য! কি জানো, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মা দেশটাকে রজসে ভরে দাও, তাই ভাবি, নিরাশ হবার বুঝি কিছু নাই। এসব চারদিকে আর কিছু নয়, দেশ রজসে পূর্ণ হয়েছে। দূর উত্তরে হিমালয়ের সুদূরতম প্রান্ত থেকে, ভারতের পূর্ব প্রান্তের এই বাংলা দেশ ছুঁয়ে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বুঝি রজসে ছেয়ে গেছে দেশ। এবার নতুন ভারত জাগবে। কৃষাণের কুটিরে, দরিদ্রের ঘরে, ভুমাওয়ালার দোকানে দেশ অন্ধকারের মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আলোতে জাগবে নতুন জীবন পেয়ে। সদ্যজাগ্রত ভোলানাথেরা আমার মত গেরুয়া-শরীর ভুঁড়ি খাপ খোলা তরোয়ালের ঘায়ে হয়ত ফাঁসিয়েও দিতে পারে। তাতে ক্ষতি বা ক্ষোভ বিন্দুমাত্রও নেই জেনো। শুধু দেশ জাগলেই হল।

সুমিত্রার মনে পড়ে গেল বদ্রীনাথের পথে পাহাড়ের গায়ে লেখা জাগ্ উঠা হিন্দুস্থান। চাও মাও সাবধান।

—দেশ কি বক্তৃতায় জাগবে? কণ্ঠে তরুণের অপার বিদ্রূপ।

সন্ন্যাসীও হেসে ফেল্লেন।

—বাবা, ঠাকুরও বলতেন, কলকাতার লোকেরা খালি লে-ক-চা-র দেয়। তবে কি জানো, বক্তৃতার পিছনে ভাব আছে কিনা দ্যাখোনা, তারপরে কি ভাবগ্রাহী হওয়া যায় না? ভাব গ্রহণ করার উপযুক্ত যদি হয় তবেই ত সমাজের অগ্রগতি হতে পারে। হিংস্রতায় কি মুক্তি? যে রক্তের নদী বইছে দেশে তাকে অন্ধকারে বইতে দিও না। তার উপর সূর্যালোক পড়তে দাও।

সুমিত্রা ভাবছিল সাধুজী এমন নির্ভয়ে কথা বলছেন, উনি কি জানেন না লোকে নাকি এখানে ফিস্ ফিস্ করতে বা কানাকানি করতেও ভয় পায়। এই ছেলেটির চোখের দৃষ্টি যেন ক্রমেই উদ্ধত ও ক্রুর হয়ে উঠছে।

কিন্তু সন্ন্যাসী বলেই চল্লেন, না বাবা, তোমার চোখের দৃষ্টিতে একটি ক্রুদ্ধসাপের প্রতিচ্ছায়া দেখলেও ভয় আমি পাবো না। আমি অনিকেতনবাসী সন্ন্যাসী, ব্যক্তির বা সমাজের ভ্রুকুটিকে কি ভয় আমার? আমি যদি সত্য ও স্পষ্ট কথা না বলবো ত বলবে কে? আমি পরম আশাবাদী, আস্তিক্যবাদ আমার জীবন ধর্ম্মের মূল কথা। সেই জোবচার্ণকের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত বুঝে দ্যাখ এই আজব শহর কত বিষ হজম করে নীলকণ্ঠ হয়েছে। সেইটে বুঝতে পারলে তখন সব ঔদ্ধত্য শান্ত হবে, পথভ্রষ্ট যৌবন তখন অকারণ রক্তপাতের হোলিখেলা ছেড়ে দিয়ে পথান্তর খুঁজবে, বিষে বিষে নীলকণ্ঠ এই শহরের আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের নবসূচনা দেখা যাবে।

আন্নাকাকীর সঙ্গে দেখা করা হল না। রাত হবার আগে ওর শাশুড়ি বাড়ি ফিরতে চাইলেন। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। সাধুজী সিদ্ধাই জানেন না। যাদুবিদ্যায়ও পারদর্শী নন। বড়দি কোন অলৌকিক উপায়ে ভাল হবেন কেউ যদি বলে দিতে পারত। তেমনি যদি কেউ বলে দিতে পারে কোন অলৌকিক উপায়ে এই মহানগরী তার সব ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হবে।

কিন্তু সারাপথ আশাবাদী সন্ন্যাসীর কথায় সুমিত্রার মনটা সত্যিই যেন আশার আলোয় পূর্ণ হল। এ শহর মৃত্যুহীন, অনেক বিষ হজম করে বিষে বিষে এই বিস্তীর্ণ জনপদ মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাব ফিরে যাবার আগে এই নীলকণ্ঠ মহানগরীকে সে বার বার প্রণতি জানাবে।

কবন্ধ

গৌবী আইয়ুব

শীতের পড়ন্ত বেলা। পিঠের উপর মিঠে রোদ। সবুজ ঘাস থেকে একটা ঠাণ্ডা আমেজ উঠে এসে সমস্ত শরীর-মনকে যেন আদর করছিল। খোলা মাঠে কী একটা অনুষ্ঠান চলছিল । সারি-সারি স্টীলের ফোলডিং চেয়ার অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো। হালকা নীলরঙের চেয়ারগুলি চোখে আরাম দিচ্ছিল। অবশ্য সারি ভেঙে কোথাও-কোথাও চেয়ারগুলিকে কিছুটা এলোমেলো কবে দিয়েছিল দর্শকরা। যে যার সুবিধামতন এদিক-সেদিক টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন বোধহয় একটু বিরতি চলছিল। তাই অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, হাতপায়ের আড়ষ্টতা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল কেউ-কেউ··· কেউ-বা পরিচিত জনকে খুঁজে পেয়ে নীচু গলায় কথা বলছিল। সব নিয়ে বেশ একটা সুন্দর সংযত পরিবেশ। অথচ কী যে ঘটছিল সামনের দিকে সেটা কিন্তু মনে নেই।

আমি প্রথম থেকেই একা বসেছিলাম, তখনও একাই বসে রইলাম। বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি তুলে সেই হাঁটুর উপর অলস হাত দুটো জড়ো করে রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, অন্যমনস্ক। নিজের মনেই কী জানি কী ভাবছিলাম। আমার সারির দক্ষিণ প্রান্তের একেবারে শেষ চেয়ারটি বেছে নিয়ে বসেছিলাম আমি! পারতপক্ষে দুপাশে দুজন অচেনা লোক নিয়ে বসতে কার ভালো লাগে? তবে আমার বাঁ দিকেও কয়েকটা চেয়ার তখন পর্যন্ত শূন্য ছিল।··· সে ক'টাকে ছেড়ে খানিক দূরে জনাকয় বসেছিল, অস্পষ্ট মনে পড়ছে। পায়ের কাছে ঘাসের উপর নামিয়ে রেখেছিলাম আমার পেটমোটা ব্যাগটা···ব্যাগ তো নয়, বলা যায় একটা হোলড-অল। ব্যাগের উপর আমার মেটেরঙের গুর্জরা শালটাও পাট করে রেখে দিয়েছিলাম···গায়ে দেবার মত ঠাণ্ডা তখনও পড়ে নি।

বসে থেকে-থেকেই হঠাৎ আমার ঘোর কেটে গিয়েছিল। অস্পষ্ট ঠুনঠান ধাতব একটা শব্দ শুনে সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়েই টের পেয়েছিলাম যে আমার পিছনের সারি বেয়ে বাঁ-দিক থেকে কেউ যেন এগিয়ে আসছিল, ঠিক আমার পাশের চেয়ারটিকেই লক্ষ্য করে। অনেক সময় কিছু না ভেবেই মানুষ যেমন করে থাকে, আমি তেমনি নিজের চেয়ারটা কয়েক ইঞ্চি আরো ডাইনে সরিয়ে নিয়েছিলাম। আগন্তুকের মনে হতে পারত তার পথ একটু প্রশস্ত করে দেবার জন্যই সরে গিয়েছিলাম। আসলে হয়তো নিজের দূরত্বটুকু সযত্নে সুরক্ষিত করার জন্যই ওইরকম করেছিলাম। আমার পাশের চেয়ারের পিছনটিতে এসে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে তারপর পিঠের দিক থেকে যখন এক-পা এক-পা করে নবাগত মানুষটি এগিয়ে এসে বসতে যাচ্ছিল তখন আমার চোখে পড়েছিল যে তার চলাটা স্বাভাবিক নয়···একটা কাঠ-কাঠ ভাব···কৃত্রিম পায়ের উপর হাঁটলে যেমন দেখায় আর কী! চেয়ারটাকে খানিক সুবিধাজনকভাবে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল সেই লোকটি···স্বভাবতই আমার নজর চলে গিয়েছিল তার মুখের দিকে। এখন বুঝতে পারছি যে যতটা চমকে ওঠা উচিত ছিল ততটা কিন্তু চমকাইনি প্রথমে। একটু অবাক হয়েছিলাম মাত্র।

তাই যখন দেখলাম নবাগত মানুষটির মাথাটাই নেই কো মোটে··· সেখানে একটা ছোট্টমতন

ফ্যান ঘুরছে তখন কিন্তু ব্যাপারটা বিশেষ তেমন ভয়াবহ ঠেকে নি প্রথমে। নীচু সিলিঙওয়ালা ঘরে অনেক সময় ওইরকম ছোটো ফ্যান গাঁথা থাকে, ব্লেডগুলি বিঘতখানেক লম্বা, কিন্তু কোনো তারের কেসিং ছিল না ওগুলিকে ঢেকে। দুষ্টু ছেলেপুলের কথা ভেবে বরং একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মনে-মনে আমিও ওই চলন্ত পাখার কাছে একটা আঙুল বাড়াতে গিয়ে চট করে সরিয়ে নিয়েছিলাম। স্পীড কম হলে কি হবে! আঙুলের ডগাটা কুচ করে কেটে উড়িয়ে না দিক, অন্তত জোড় মট করে ভেঙে ফেলবে ঠিক। তাই ভাবছিলাম বলি (মাস্টারনীর স্বভাব যাবে কোথায়) যে, হোক না কাঁধের উপর চাপানো, তবু ওইরকম আঢাকা রাখা উচিত নয় ব্লেডগুলি।

যাই হোক, কারুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা সভ্যতা নয়। তা ছাড়া অন্যেরা কী মনে করছে ওকে দেখে সেটাও দেখবার জন্য চারদিকে নজর ঘুরিয়ে আনলাম একবার। কী আশ্চর্য! আর কেউই যেন অদ্ভুত কিছু লক্ষ করে নি মনে হল। করলে কি আশেপাশে সবাই এমন নির্বিকার হয়ে থাকতে পারত?···আমার মাথায় তখন নানারকম ভাবনা আসছিল।···হয়তো কোনো অ্যাকসিডেন্টে মাথাটি হারিয়েছেন ভদ্রলোক।···হয়তো দেহকে চালু রাখার জন্য এটাই সার্জারির আধুনিকতম উদ্ভাবন। এদিকে কিন্তু খেয়াল ছিল যে দুর্ঘটনায় যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারায় তাদের প্রতি ভয়, বিস্ময় কি বিরাগ প্রকাশ করা অমানবিক। তাই মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় একবার শুধু ঢোঁক গিলেছিলাম। তারপর আর কিছু ভাববার আগেই হাওয়ায় হিশহিশ করে কথা ভেসে এসেছিল আমাকে চমকে দিয়ে,

'এখানে বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই'—না ভেবেই এরকম জবাব মানুষ দিয়ে থাকে সৌজন্য প্রকাশ করতে।

অমনি কাঠ-কাঠ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে 'মানুষ'টি এসে ধপ করে চেয়ারের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। চেয়ারটাও ক্যাঁক করে ঘাসে দেবে গিয়েছিল একটুখানি। তখন একবার মনে হয়েছিল, এ কি মানুষ না একটা যন্ত্র! হালকা গোলাপি রঙের সুতি শার্টের ভিতর থেকে কাঁধ-বুক-পিঠের ঋজুরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, যেন একটা টিনের বাক্স কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিন্তু মুখে আমি কৌতূহলের বদলে একটা সহানুভূতির ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য নড়েচড়ে বসেছিলাম নিজের চেয়ারেই···একবার শাড়ির আঁচলটা কাঁধের উপর গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম···যদিও অবশ্য কটকি তসরের ভারী শাড়ি মোটেই খসে-খসে পড়ে যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম যে আমার মতন প্রবীণা একজন মহিলাও অস্বস্তিতে পড়লে তরুণীদের মতনই অর্থহীন চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে পারে।

নিজেকে একটু বাগে এনে ভাগ্যহীন মানুষটির সঙ্গে সামান্য সৌজন্য বিনিময় করার চেষ্টায় একটু হেসে আবার তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে আর-একবার হোঁচট খেয়েছিলাম। ঘুরন্ত পাখার ডানার সঙ্গে কী করে স্মিতহাস্য বিনিময় করা যায় সে এক সমস্যা! পাখা অবশ্য খুব জোরে ঘুরছিল না···মনে হচ্ছিল যেন এক নম্বরের চেয়েও কম স্পীড। কিন্তু পাখা তো পাখাই···চোখ নয়, ঠোঁট নয়। সেদিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আমার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গিয়েছিল।

তবু খানিক পরে মনে হয়েছিল যে আমার সৌজন্য প্রকাশের চেষ্টা যেন পাশের মানুষটির একেবারে অগোচরে থাকে নি। সেজন্যই সম্ভবত আবার ফিশ-ফাশ কথা ভেসে এসেছিল,

'বেশ গরম আজ, অই না?'

হাঁ-সূচক অল্প একটু মাথা নেড়ে মাথাটা ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখে নিয়েছিলাম চট করে।

মনে হল না যে কেউ লক্ষ করছে আমার পাশেই ভীষণ অদ্ভুত কিছু ঘটছে একটা। এদিকে আমি কিন্তু ক্রমেই আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। পাখার অভাবে কিংবা পাখার পাশে, এমন-কী পাখার তলায় বসেও মানুষ 'আহ কী গরম' বলে অহরহ অভিযোগ করে ঠিকই, কিন্তু পাখা নিজে কখনও গরম বলে অভিযোগ করে এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে? আর এই ক্ষেত্রে পাখাটি পাশে এসে বসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার তো বেশ মোলায়েম শীতই লাগছিল। তার পর থেকেই বরং ঘামতে শুরু করেছিলাম। একটু-একটু করে যতই ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ততই কানমাথা গরম হয়ে উঠছিল।

তবু উপর-উপর অবিচলতা বজায় রাখার জন্য নিজের নখের রঙ পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম ডাক্তারি নিষ্ঠার সঙ্গে। তা ছাড়া নার্সারি স্কুলের টিচারদের মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নখ যথেষ্ট পরিষ্কার কিনা, শিগগিরই কাটা দরকার কিনা—এসব প্রয়োজনীয় বিষয়েও অবহিত হওয়া দরকার মনে হচ্ছিল তখনই। কিন্তু তারই ফাঁকে আড়চোখে দেখতে পেয়েছিলাম পাশে-বসে-থাকা মানুষটির পা দুটি ধীরে-ধীরে সামনের দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, তার ট্রাউজার্সের রঙ ছিল চীনেবাদামের খোলার মতন। গোলাপি পপলিনের আস্তিন দুটি হাঁটুর কাছে এগিয়ে এসে সযত্নে যেন চিমটি কেটে ট্রাউজার্সের কাপড় সামান্য তুলে ধরে একটু আলগা করে পা দুটিকে অবাধে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। তখন তার হাত দুটির দিকে চোরা নজর পড়ায় আবার চমকে গিয়েছিলাম। দুটি হাত নয়, দশটি আঙুলও নয়। বলা যায় এক ধরনের দুটি স্টীলের চিমটে যেন। প্রত্যেকটি 'হাতেই' একটি করে স্টীলের বুড়ো আঙুল মতন ছিল, আর ছিল সব ক'টি আঙুল একত্র করলে যেমন দেখায় তেমনি একটি ইস্পাতের বাঁকানো পাত···হাতছানি দেবার সময় চারটা আঙুল জুড়ে গেলে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। ওই 'হাত'-দুটিই হাঁটুর কাছে নেমে এসেছিল···আর পা'দুটি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখতে পেয়েছিলাম পায়ের জুতোর রঙও ওই ট্রাউজার্সেরই মতন। কর্ডুরয়ের অমন আরামদায়ক জুতো-জোড়া এদেশী বলে মনে হচ্ছিল না।

এর পর হাওয়ায় যা ফিশফিশানি ভেসে এল তাতে আমার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। শোনা গেল, 'অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে পারছিলাম না।···'

'তোমাকে'! আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পাখার ব্লেডের বয়স বোঝা যায় না ঠিকই, কিন্তু পোশাক-আশাক দেখে তো তাকে ছোকরাই মনে হয়েছিল···তিন কুড়ি বয়সের লোক মোটেই মনে হয়নি। অবশ্য আজকাল বুড়ি-ছুঁড়ি বুড়ো-গুঁড়ো সবাই একই রকম পোশাক পরছে। তবু আমার মতন একজন প্রৌঢ়া আর ভীষণদর্শনা হেডমিসট্রেসকে 'তুমি' বলার সাহস হবে প্রথম আলাপেই! এতে আমি বেশ বিমূঢ় বোধ করতে শুরু করেছিলাম। তা ছাড়া, আমার কাছে আসার জন্য এত ব্যগ্রতার কারণটাই বা কী?—সেটাও ভালো ঠেকছিল না মোটে। এতক্ষণ তো ঘামছিলাম—এবার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

সন্তর্পণে ঘাড়টা একটু কাত করে বাঁ পাশে ওর দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা কী! কিন্তু ঘুরন্ত পাখাটাও ওই সময়েই নিজের বাঁ দিকে ফিরে কী যেন দেখছিল একটু ঝুঁকে। তারপর দেখলাম ওর বাঁ কাঁধে ঝোলানো একটা শান ব্যাগে হাত দুটো কী যেন খুঁজছিল। খানিক বাদে বাঁ-হাতে একটা নোটবই আর ঝকঝকে ক্রস পেনসিল উঠে এসেছিল···আরও খানিক খোঁজাখুঁজির পর ডান হাতে উঠেছিল একটা চকোলেটের বড়োসড়ো স্ল্যাব। আমি তখন তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। তাও কি অব্যাহতি পাওয়া

গেল? মনে-মনে ভাবছিলাম, প্রেস রিপোর্টার নাকি কোনো কাগজের? কথাটা কিন্তু উচ্চারণ করি নি। অথচ উত্তর চলে এসেছিল,

'হ্যাঁ আমি এখন নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার।'

শুনে তো আমি জমে বরফ। কিন্তু কপালে যে ঘাম জমছিল তাও বুঝতে পারছিলাম—অথচ আঁচলটা তুলে যে ঘাম পুছব, তাও হাত সরছিল না। হাত পা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কাঠ হয়ে বসে ভাবছিলাম যে কিছু ভাবাও তাহলে চলবে না? 'ভাবব না' কথাটা ভাবা চলবে কি? প্রচণ্ড অস্বস্তিতে আমার তখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার দিকে সেই বিলিতি চকোলেটের যতটা এগিয়ে এসেছিল এবং সেই সঙ্গে আমার গলা শুকিয়ে-দেওয়া ফিসফিস কথা,

'প্লীজ একটুখানি নাও—'

প্লীজই বটে! এমন প্লেজারের অভিজ্ঞতা যেন জীবনে আর কোনদিন না হয়। কিছুক্ষণ যে নিতে ইতস্তত করছিলাম সেটা হাতখানা তুলতে পারছিলাম না বলেও। ভয়ে-জমে-যাওয়া তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে শেষে কোনোক্রমে কোল থেকে তুলে এনে চকোলেটের প্রান্তে ঠেকিয়েছিলাম। ভেঙে নেবার অনুৎসাহটা ব্যাখ্যা করে বলেও ছিলাম প্রায় ওইরকম ফিসফিস স্বরে,

'এখন কি আর চকোলেট খাবার বয়স আছে?'

'আমার আছে আর তোমার নেই?'—শুনে আমি চেয়ার থেকে উল্টে পড়ি আর কী! ঠকঠক করে হাত কাঁপছিল বলেই বোধহয় ছোট্ট এক টুকরো চকোলেট আমার চেষ্টা ছাড়াই মট করে ভেঙে আমার দুই আঙুলের মাঝে উঠে এল···এসেও কয়েক সেকেন্ড ধরে কাঁপতেই থাকল···আর আমি হাঁ করে বসে থাকলাম···ওটা মুখ পর্যন্ত তুলে আনতে পারছিলাম না।

চেয়ার থেকে পড়ে যাই নি তার একমাত্র কারণ, এই যে, কিশোর বয়স থেকেই ভয়কে জয় করবার চেষ্টা করতাম আমাদের প্রজন্মের কিছু মেয়ে। আমাদের ছিল সবলা হবার সাধনা। সেই সময়ে রেডিওতে 'মহিলা মহল' অনুষ্ঠানের গোড়ায় গান হত 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান'। শুনে সবল নারীত্বের অভিমানে আমাদের বুক ভরে উঠত।

তবু এই সবলার মুখে কোনো কথা জোগায় নি ওই মুহূর্তে। সবটুকু চেষ্টাকে একত্র করে বহুকষ্টে চকোলেটের টুকরোটা মুখে পুরে দিয়েছিলাম। তাতে বিশ্রী সিগারেটের গন্ধ পেয়েও অবিকৃত মুখে চুষতে চেষ্টা করছিলাম। এদিকে চোখে কিন্তু ঝাপসা দেখছিলাম, চোখের পাতাদুটি পর্যন্ত ঘামে ভিজে গিয়ে চশমার কাঁচে বাষ্প জমে উঠেছিল, গরমের দিনে রান্না করার সময় যেমন হয়।

যেন অনেক অনেকক্ষণ পর একটু-একটু করে ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম ও কী করছে। দেখা গেল, খুশখুশ করে স্টীলের মসৃণ পেনসিলটা নোট বুকের উপর হাঁটছে···হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা চিমটে। আমার চোখ সেখানেই আটকে রয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে ভীষণ অস্থিরতা ছিল···প্রায় অস্থিরতা, কিংবা বলা চলে অব্যক্ত কিন্তু তীব্র একটা ইচ্ছার তাড়না ছিল দেহের সবকটি পেশীতে। মনের অন্তঃস্থলেও ইচ্ছাটা উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ক্রমে সর্বাঙ্গে ঐ একটা ইচ্ছাই নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছিল···যে করেই হোক পালাতে হবে। অথচ এদিকে পা-দুটো তো মাটিতে এঁটে গিয়েছে···হয়তো সবুজ ঘাসও গজিয়ে গিয়েছে তার উপর।

তারপর এক সময়ে দেখতে পেলাম নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার লেখার স্পীড কমিয়ে

ফেলছে, একটু সাহস পেয়ে তখন সন্তর্পণে আমার মাথাটা আরো একটু কাত করে ওর 'মুখের' দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম যে পাখার স্পীড আগের চেয়েও কমে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল অপেক্ষা করে থাকলে বোধ হয় দেখতে পাব একটু-একটু করে দুটোই থেমে যাবে। গেলও তাই। আমি তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই ডান হাতের চিমটেটা কলমসহ কেমন যেন উলটে গেল হাত ওলটানোর ভঙ্গিতে। ভাবছে? না ঘুমিয়ে পড়েছে? মাথাটাও কাজ করছে না মনে হল···পাখাটা যখন থেমে গেছে। একটু পরেই টের পাওয়া গেল বাঁ পাশ থেকে বাক্সর মতন কিছু একটা কাত হয়ে এসে আমার কাঁধে ঠেকছে একটু-একটু করে··· যেন ঘুমে ঢলে পড়ছিল আমার ওপর। কী ভারী আর শক্ত মনে হয়েছিল বাক্সটা···আমার কাঁধ ব্যথা করতে লেগেছিল।

আর না! কী করে কোথা থেকে যে আমার হাতে-পায়ে বল ফিরে এসেছিল জানি না। সাবধানে নিজেকে বাকসর তলা থেকে সরিয়ে এনে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কী ভাগ্য ঘাসের উপর চেয়ার ঠেললে শব্দ হয় না! কিন্তু তবু নীচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিতে-নিতেই টের পেয়েছিলাম যে বাক্সটাও যেন চটকা ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসেছিল নিজের চেয়ারের উপর। আমার শালটা ব্যাগ থেকে গড়িয়ে ঘাসে পড়ে গিয়েছিল। সেটাও তুলে নেবার তর সইল না। কিন্তু হাওয়া খুব তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেছিল, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ চললে কোথায়?'

আর চললে কোথায়! আমি তখন উড়তে পারলে উড়ি। কে বলে আমার হাঁটুতে আর্থরাইটিস···আমি প্রায় তখন রেসের ঘোড়া। পাগলের মতন একরোখা ছুটছিলাম কোনো দিকে না তাকিয়ে···মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটছিলাম···অন্তত ছুটতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ক্রমেই মনে হচ্ছিল আমি যেন আর পারছি না। স্বপ্নে যেমন পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যায়, পা নড়বড়ে হয়ে যায়, আমারও তেমনি হয়ে যাচ্ছিল। হাঁটু দুটো লগবগে রবারের তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। প্রাণের দায়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে একটা পিচঢালা পথের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। সেখানে এসে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই ভাগ্যক্রমে একটা বাসও এসে থেমেছিল একেবারে আমার সামনেই। আমি পড়িমরি করে উঠে পড়েছিলাম। বাসটা স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল আমি উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল।

'বাব্বাঃ বাঁচলাম' বলে আমার আঁচল তুলে কপাল ঘাড় মুখ মুছতে-মুছতে একবার মনে হয়েছিল, কী হাস্যকর ব্যাপার! এই বয়সে এই দেহ নিয়ে ত্রস্ত কিশোরীর মতন ছোটা! কী বেমানান দেখাচ্ছিল নিশ্চয়ই, দেখাক্ গে, কেই বা দেখছিল! চশমাটাও মুছে নিয়ে চোখে পরে বাসের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাতেই ভরসাটা আবার ধসে পড়েছিল যেন। স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম একটা খটখটে মূর্তি খটাশ-খটাশ করতে-করতে ছুটে আসছিল লম্বা-লম্বা পায়ে, যেন রণপার উপর ছুটছিল। তার মাথাটা···না, পাখাটা বাঁই-বাঁই করে ঘুরছিল। হায়-হায়, এ তো আমার পিছু ছাড়বে না। অবশ্য তখনও বেশ দূরে ছিল···আমার বাসটাকে ধরবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু বাসটা যদি আলোর বেগে ছুটতে-ছুটতে একেবারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হয়ে যেতে পারত, তবেই হয়তো স্বস্তি পেতাম আমি।···

স্টেশনে এসে নেমেই একটা ট্রেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব ভরসা পেয়েছিলাম। টিকিট কাটতে কিছুই প্রায় সময় লাগে নি। বেছে-বেছে একটা ভিড়ে ঠাসা কমপার্টমেনটে উঠেছিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আলো জ্বলে উঠতেই মুখটা যথাসম্ভব আড়াল করবার জন্য মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছিলাম। মিনিট তিন-চার পরে ট্রেনটা নড়ে উঠলে বুকের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল। আমার ঠিক পরের বাসটাই যদি ধরতে পেরেও থাকে তবু এই

ট্রেন ধরতে পারে নি কিছুতেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছনো কিছুতেই সম্ভব নয়।

মনকে এইভাবে ভরসা দিয়ে কামরার এক কোণে ঠায় বসেছিলাম। ট্রেন সারারাত ধরে চলল। একটু তন্দ্রা, একটু জাগরণ, একটু স্বস্তি, অনেকটা ভয়—সব মিলিয়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল আমার চৈতন্যে। তারপর ট্রেন যখন এসে টারমিনাসে থেমে গিয়েছিল তখন গা ঝাড়া গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। গলা বার করে দেখে মনে হয়েছিল হাওড়া স্টেশন। যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম···তখন মনে পড়ল গুর্জরা শালটা হারিয়ে এসেছি···বুকের ভিতরটায় একটু হায়-হায় করে উঠেছিল···ভারি সুন্দর শালটা···সুশীলা দিয়েছিল। যারা আগেভাগে নামবার জন্য ব্যস্ত তাদের পথ করে দিয়ে ধীরেসুস্থে নেমেছিলাম। কনুই দিয়ে ঠেলে পথ করে নিতে আমার ভালো লাগে না। নেমে হাতের ব্যাগটা দোলাতে-দোলাতে প্লাটফর্মে যখন হাঁটছিলাম তখন চোখে অনিদ্রার জ্বালা থাকলেও মনটা হালকা লাগছিল! আর-একটা নূতন দিনের আলোয় আগের দিনের ভয়টা কেমন অলীক অবাস্তব লাগছিল। ভাবতে-ভাবতে চলেছিলাম যে ট্যাকসি নেব না বাস নেব।

কিন্তু স্টেশনের বাইরে এসেই সামনে একটা খালি ট্যাকসি দেখে খুশি হয়ে তাই নিয়ে নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে স্নান করে একটু শুয়ে নিতে ইচ্ছা করছিল। ট্যাকসির দরজাটা বন্ধ করে তার শব্দে বেশ একটা স্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু যেই ড্রাইভারকে বলতে যাচ্ছি কোথায় যাব অমনি একটা তীক্ষ্ণ শিশ শুনতে পেয়ে সেই শব্দের দিকে তাকিয়েই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আর একবার···আবার সেই কবন্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম একটু দূরেই। ট্যাকসিটা চলতে শুরু করেই দিয়েছিল, ততক্ষণে স্টেশনের চত্বর পার হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। উলটো দিকের ভিড় ঠেলে একটা ঘুরন্ত পাখা মানুষের কাঁধে চড়ে ছুটে আসছিল আমারই ট্যাকসিটার দিকে।···তার হিশহিশ ডাকও শুনতে পেয়েছিলাম আমি,···'শোনো,··· শোনো,···থামো,···থামো।' আমি থামি নি, আমি আর কিছু শুনতে চাই নি।

তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। এতদূর পর্যন্ত কী করে পৌঁছল? মনে তো হচ্ছিল যে আগেভাগেই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশনের বাইরে, আমাকে ধরবে বলে।···কিন্তু সেটা সম্ভব হল কী করে? এতটা পথ কি দূর পাল্লার বাসে চলে এসেছে সারারাত ধরে? কী জানি, আমি আর ভাবতে পারছিলাম না শুধু ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এই বিপদ পিঠে নিয়ে আর বাড়ি যাওয়া চলবে না··· সেখানে তো কোনো শক্তসমর্থ পুরুষ নেই যে ওটাকে ঠেকাতে পারে। ট্যাকসিটাকে খানিক ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে সমরদের হাউসিং কমপ্লেকসের একেবারে সামনে গিয়ে নেমেছিলাম। বিপদে আপদে ওরা তিন ভাই-ই আমার ভরসা। ট্যাকসির ভাড়া চুকিয়ে কোনোরকমে ছুটে গিয়ে লিফটে উঠেছিলাম। আবার ভেবেছিলাম লিফটম্যানকে বলি, একটা অদ্ভুত মতন লোক যদি এসে জিজ্ঞাসা করে আমি কোন্ অ্যাপার্টমেনটে ঢুকছি তবে যেন বলে না দেয়। ···কিন্তু বলি বলি করেও লজ্জায় বলতে পারলাম না···আর কতক্ষণই বা সময় পেলাম বেসমেনট থেকে আটতলায় উঠে আসতে-আসতে! এই বয়সে আমার মতন একজন প্রৌঢ়া মহিলার পেছন-পেছন একটা হতভাগা ছুটে আসছে কুকুরের মত শুঁকতে শুঁকতে···বলা যায় এই কথাটা কাউকে? আর ভয়ে গলা তো কাঠ হয়েই ছিল।··· কোনো ক্রমে 'এইট্‌থ্ ফ্লোর' ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে বার হয় নি।

লিফট থেকে অ্যাপার্টমেনটের দরজা দশ হাত দূরেও নয়···মনে হচ্ছিল যেন অনেক-

অনেক দূর। সর্বশক্তি দিয়ে বেলটা টিপে ধরে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম···এমন কাঁপছিল সারা শরীর যে ভয় হচ্ছিল পড়ে যাব।···শৈশবের মতন ভয়ে পিঠ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ওরা যে যেখানে ছিল সবাই হুড়মুড় করে ছুটে এসেছিল দরজায়···সমর, অলক, মিনু···বাচ্চারাও বোধ হয় কেউ বাকি ছিল না। দরজা খুলতে ওদের তিন মিনিট লেগেছিল কিনা সন্দেহ অথচ তারই মধ্যে যেন একটা হইচই শব্দ উঠে এসেছিল অনেক নীচে সিঁড়ির গহ্বর থেকে।

এত সকালে ওইরকম সন্ত্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ চেহারায় আমাকে দেখে ওরা যত ভয় পেয়েছিল ততই অবাক হয়েছিল। আমি কেবল বলেছিলাম, 'বলছি, সব···আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ কর্···কিছুতে খুলবি না।···'

'কেন···কেন···কে···কী?'

'আগে জল দে···আর আমি একটু শোব··· ।' বলতে বলতে কোনোরকমে ওদের একটা শোবার ঘরে ঢুকে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় ফেলেছিলাম। মিনু জল এনে দিয়েছিল। খেয়ে একটু দম নিয়ে যেই কথা বলতে গিয়েছি··অমনি আবার বাইরের দরজার ঘণ্টা পাগলের মতো বেজে উঠেছিল। আমি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, 'খুলবি না খুলবি না, কিছুতেই খুলবি না।···'

মিনু ছুটে গিয়েছিল শোবার ঘরের দরজাটাও বন্ধ করার জন্য। তার আগেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, বাইরের দরজার পাল্লায় স্টীলের চিমটের বেপরোয়া খটখটানি। আবার চিৎকার করতে গেলাম···গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।···

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে হাত পা অসাড় লাগছিল অনেকক্ষণ। এদিকে ঘেমে বিছানা পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। আর গলা কাঠ। বোঝা গেল, ওটা স্বপ্ন। সত্যি জল খাইনি মিনুর হাত থেকে। তখন উঠে বসে পাশের টিপয়ের উপর ঢেকে-রাখা জলের গেলাশ থেকে জল খেলাম। তারপর বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলাম রাত প্রায় আড়াইটা। এমন একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের কোনো অর্থ না খুঁজে পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। তবে সব দুঃস্বপ্নেরই তো একটা লাভের দিক থাকে — জেগে উঠে মনে হয়, 'আহ্ বাঁচলাম'। মনে হয় জীবনের সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতার শেষেই যদি এমন পরম শান্তিময় জাগরণ থাকত।

কিন্তু মনের ওই শান্তিটা বেশিক্ষণ টিকল না। স্বপ্নটা আমাকে কেবলই কুরতে লাগল। অবশ্য কেউ হয়তো বলবে 'স্বপ্ন তো স্বপ্নই, তার আবার অর্থ হয় নাকি। মিছে মাথা ঘামানো।' কিন্তু না ঘামিয়েও পারছিলাম না। খানিকক্ষণ একটা বই পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন লাগল না। একটা চাপা অস্থিরতা···অদ্ভুত একটা অস্বস্তি লাগছিল।···ঠিক ভয় নয় কিন্তু প্রায় ভয়েরই মতন।

স্বপ্নটার কোনো যেন মাথামুণ্ডু নেই।···আর এরকম দম-আটকানো স্বপ্ন জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।···আমার স্বপ্ন সাধারণত খুব সাদামাটা হয়। জাগরণে যে সমস্যার কোনো সমাধান পাই না, যে উদ্বেগ থেকে উদ্ধার পাই না, তারই একটা আপাত-সমাধান অনেক সময় ঘটে যায় স্বপ্নে। ওইসব আটপৌরে স্বপ্নের মাঝখানে এমন একটা জটিল স্বপ্ন দেখে আমার খুব বিমূঢ় লাগছিল।

অবশ্য সাদামাটা স্বপ্নের অর্থ খোঁজার একটা ঝোঁক আমার আছে। ইউনিভার্সিটিতে আমার বন্ধু ছিল পদ্মিনী সরকার···ও পড়ত সাইকোলজি, ড° হরিপদ মাইতির ছাত্রী ছিল। ওর কাছে একবার শুনেছিলাম যে, যে-কোনো স্বপ্ন দেখার পরেই যদি সত্যিকারের অনুসন্ধান করবার

ইচ্ছা নিয়ে নিজেই মনের আনাচকানাচ খুঁজে দেখি তন্ন তন্ন করে, তাহলে আমরা বেশির ভাগ স্বপ্নেরই একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নিজেরাই। হতে পারে সেই ব্যাখ্যার সবটা আমরা অন্যের কাছে স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নিজে বেশ বুঝতে পারি স্পষ্ট, কোন্ অস্বস্তিকর ব্যাপারটা স্বপ্নে কোন্ চেহারা নিয়েছে। এমন-কী স্বপ্নের অনেক ঘটনা আর বস্তুর প্রতীকী চেহারাটাও ধরতে পারা যায় ওইভাবে তলিয়ে ভাবলে। ওর কাছ থেকে শোনা অবধি মনে-মনে স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করার একটা অভ্যাস আমার আছে। সব স্বপ্নেরই একটা বোধগম্য অর্থ খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। এই পাখা কাঁধে কবন্ধটার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই মহা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অবচেতনের কোন্ কারিগরিতে ওই রোবটের মতন মানুষটার সৃষ্টি হয়েছে কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিলাম না। অনেক হাতড়ে দেখলাম মনের গলিঘুঁজি অন্ধিসন্ধি।

তারপর এক সময়ে আবার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল অন্য দিনের চেয়ে অনেক দেরিতে। ভাগ্যিস রবিবার। কিন্তু মুখে যেন বিস্বাদ লেগে আছে তখনও, ছুটির দিনের পক্ষে বড়োই বেমানান।

চায়ের প্রথম কাপটা শেষ হতেই মনে পড়ল কাল সন্ধ্যায় ভেবেছিলাম সুরভিকে একটা চিঠি লেখা দরকার। ঠিক কী লিখতে চেয়েছিলাম ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল সুরভি একটা মনের মতন কাজ পেয়েছে তার অফুরন্ত অবসরকে ভরে তোলবার জন্য। বস্তির ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা ফ্রী ডে কেয়ার সেনটার করেছেন এক ভদ্রলোক। পড়াশোনা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা, নাচ, নাটক করা···এসব তো আছেই। তাছাড়া আহার বিশ্রাম খেলাধুলোর ব্যবস্থাও আছে। ভোর না হতেই বাপ-মা দিয়ে যায় তাদের ছেলেপুলেদের···আবার সন্ধ্যায় তাদের কাজের শেষে এসে বাড়িতে নিয়ে যায় ফিরিয়ে। সুরভি তাদের পড়ায়, ছবি আঁকায়···নতুন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে তার ভারি ভালো লাগছে।

আমিও তার জন্য খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। কতবার সুরভি বলেছে তাকে এমন একটা কাজ দিতে যা অর্থকর হবার দরকার নেই, তৃপ্তিকর হলেই হবে। আমি ভেবে পাই নি কী পরামর্শ দেব। ···তবু সুরভির মনে একটা সংশয় আছে মনে হল।···'আনন্দলোক'-এর এই প্রতিষ্ঠাতাকে তার যেন কেমন অদ্ভুত লাগে···অনেকে নাকি খুব ভয় পায় তাঁকে···ভদ্রলোকের স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে থাকতে না পেরে একটি সন্তানকে নিয়ে দেশত্যাগ করেছেন।···নানারকম গুজব শোনে তাঁর সম্বন্ধে।

গুজবে আমার অভিরুচি নেই। তাই সেসব শোনা হয় নি। আমি তাকে বলেছিলাম, "তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকবে···যতটুকু নয় তার বেশি কাছে না ঘেঁষলেই হল।" এরপর আমাকে একটু অবাক করে দিয়ে সুরভি বলেছিল ভদ্রলোক নাকি আমাকে চেনেন। নাম জানতে চাইলাম। নামটা ঠন করে কানে বাজল। হ্যাঁ আমিও চিনি বইকি, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, তবে ক্বচিৎ কদাচিৎ নাম দেখেছি কাগজে, ওইরকম জনহিতকর কাজের সূত্রেই বোধহয়। সুরভিকে সে কথা বলায় সে বলল, 'একদিন আমি খুব প্রশংসা করছিলাম আপনার, ভদ্রলোক শুনে বলেছিলেন, তাঁর কিন্তু ধারণা একেবারে অন্যরকম। কেন তা যদি আমি জানতে চাই তাহলে বলতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম না সে জানতে চেয়েছিল কিনা। কিন্তু বোঝা গেল চেয়েছিল, নইলে এরপর সে কেন বলল, 'আমি তাঁকে বলেছি, আপনি যতই যা বলুন, যাঁকে আমি এতকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানি তাঁর সম্বন্ধে আমার মত পাল্টাবে না।'

আমি কিছুই বললাম না এর উত্তরে। সুরভি অন্য নানা কথা পাড়ল। তারপর বিদায় নেবার সময় একটু টিপ্পনী কেটেছিল, 'এদিকে আপনার সম্বন্ধে কত কথা যে জিজ্ঞেস করলেন।' শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

তাই সকাল বেলাতেই চিঠি লিখতে বসলাম কাগজ কলম নিয়ে। আমারও কয়েকটা কথা বলা দরকার সুরভিকে। আবার কবে আসবে তারজন্য বসে থাকা ঠিক হবে না। তাকে বলতে চাই যে ওই ভদ্রলোককে আমি একজন ঈভিল জিনিয়াস বলে জানি। সুরভিকে ভর করে কোন্ দিন না তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে চলে আসেন···ভাবতেই আতঙ্ক হচ্ছে।···মাথায় একটা যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগল। এই তবে সেই কবন্ধ!

খোলা কলম বন্ধ করলাম। অনেকক্ষণ থুতনিতে হাত রেখে ভাবলাম। শেষকালে নিজেকে বললাম, 'থাক···আমি কেন নিজেকে ছোটো করব···ও নিজেই আবিষ্কার করুক কে কী!' কাগজকলম তুলে রাখতে-রাখতে নিজের অহংকে ধন্যবাদ দিলাম, আমার অবচেতনার ভয়ের কাছে আমাকে হেঁট হতে দেয় নি।

রবিবারটা এবার রবিবারের মতনই লাগল।

গর্ভিনী

সুমিতা চক্রবর্তী

ইংরেজী মাসের শুরুতে নতুন দশতলা বাড়িটার একটা ফ্ল্যাটে ঠিকে কাজ নিল কমলা। এসময় আরও এক বাড়ি কাজ নেবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু গেঞ্জি কারখানায় ধর্মঘট চার মাস হয়ে গেল। অভাবের জিভ চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে কয়েকটা জমানো টাকা, বিয়ের সময় বাবার দেওয়া দুশো টাকার হাতঘড়ি আর দুটো কানের দুল। রোজগার না বাড়ালেই নয়। দিন চলে না।

বড়লোকের বাড়িতে কাজ নিলে একটু বেশি ফিটফাট হতে হয়। পরিচ্ছন্ন কমলা বরাবরই। তার বাইশ বছরের উজ্জ্বল শ্যাম শরীরে ময়লা জমে নেই কোথাও। খেটে খাওয়া মেয়ের মজবুত স্বাস্থ্য। ছাপাশাড়িতে তেল হলুদ ময়লার অবাধ্য দাগ থাকলেও তা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে কাচা। চুল টেনে বাঁধা—তাতে তেল পড়ছে না কিছুদিন, তবু উসকো খুসকো নয়। পায়ে পুরানো চটি, দুহাতে প্লাস্টিকের লাল-সাদা শাঁখা-পলা। আর বাঁ হাতে অধিক সংযোজন দুটি লোহা। টানটান করে কোমরে জড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে উদরের সামান্য স্ফীতি নজরে পড়ে। ছ'মাস চলছে। নজরে পড়ে কালো চোখের তলায় কালির ছাপ আর মুখের শীর্ণতা।

দুধের মতো সাদা বেসিন আর চকচকে রূপোলি কল সোডা দিয়ে বোলাতে বোলাতে কমলা বেসিনের কাকচক্ষু আয়নায় নিজেকে দেখে। এই সাতসকালেও তার ক্লান্ত লাগে। ঠোঁটের দুপাশে দুটি কষ্টের রেখা ফুটেছে কখন। দক্ষিণের শোবার ঘর থেকে পর্দায় ঝোলানো ধাতব ঘণ্টার হালকা মধুর আওয়াজ ভেসে আসে। বৌদি সুরেলা গলায় ডাকেন—

কমলা—

যাই বৌদি—

আমার দুধটা দিয়ে যা—

দুধ ফুটিয়েছে একটু আগেই কমলা। ঝকঝকে লম্বা কাঁচের গেলাস উষ্ণ জলে ধুয়ে দুচামচ টিনের ফুড গুলেছে অল্প দুধে, তারপর তাতে গরম ধোঁয়া ওঠা দুধ ঢেলে সহনীয় উত্তাপে আনার জন্য রেখেছে খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে।

বৌদিরও পেটে বাচ্চা আছে তিন মাসের। কমলারই মতো প্রথম পোয়াতি। পনেরো দিন অন্তর ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। কখন কি খেতে হবে তার একটা ছক আছে। সেটা বৌদি ঝুলিয়ে রেখেছে শোবার ঘরে। বড় বড় দুটো কাচের জানালার মাঝে শরীর দেখানো মেয়েটার ছবির তলায়। ঘড়ি না দেখলেও কমলা বলে দিতে পারে এখন সাড়ে নটা। বৌদির প্রথম গেলাস দুধ খাওয়ার সময়। সকাল আটটায় দাদার সঙ্গে ফলের রস আর টোস্ট খাওয়া হয়েছে শুধু। কমলা দুধের গেলাস বৌদির হাতে তুলে দিতেই বৌদি বলেন—কমলা আমার পা দুটো খসখসে লাগছে। আজ পরিষ্কার করে দিস তো।—হাঁসের পালকের মতো বৌদির ফরসা মসৃণ নিটোল হাতে সোনার চুড়ি ভারি সুন্দর আওয়াজে বাজে। কমলা তাকিয়ে দেখে বৌদি অল্প অল্প চুমুকে শুষে নিচ্ছে পুষ্টি, স্বাস্থ্য আর মেধা তার পেটের বাচ্চাটার জন্য। মোটা ফিয়ের ডাক্তার নির্ভুলভাবে ছকে দিয়েছেন শিশুর সবল সুস্থ শরীরের জন্য, তার মজবুত হাড়ের জন্য, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, ফুলের মতো নরম ত্বকের জন্য। আর বৌদি সারাদিন সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে। পড়তে থাকে রঙীন মিষ্টি ভালোবাসার বই। মৃদু সুগন্ধে তার চারপাশের বাতাস আবেশে

ভরন্ত হয়ে আসে। আর সারা বাড়িতে খেলা করে রহস্যময় বিদেশী সুরের অপূর্ব মূর্চ্ছনা। সৌন্দর্যের মধ্যে থাকলে বাচ্চাটার দেহ সুন্দর হবে, তার ভাবনা হবে এই বাড়িটার মতো অমলিন, মসৃণ। বৌদি একথাই বলেছেন কমলাকে—

এসময় শুধু ভালো ভালো জিনিসের কথা ভাবতে হয়, আর মন পবিত্র রাখতে হয়। তাহলে বাচ্চাও সুন্দর হবে, বুঝলি তো?

হাতটা ঈষৎ জ্বালা করছে। এই সোডাটায় ক্ষার বেশি। খুব বেশি পরিষ্কার হয় সবকিছু। কমলার হাতের তেলো থেকে বিন্দু বিন্দু কোমলতা শুষে নিয়ে এই সোডার ছোঁওয়ায় ঝকঝকে হয়ে ওঠে বাসনপত্র, বেসিন, জলের কল, কাঁচের র‍্যাক ও বাথরুমের মেঝে।

কমলা আয়না দেওয়া টেবিল থেকে দুটো ক্ষুদ্র রঙিন শিশি নিয়ে এল। শিশুর বাড় হবে এতে। সতেজ, সবল হবে শরীর। কত আদরের, মা বাপের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে গড়া বুকের ধন আসছে। তার জন্যে কত আয়োজন, কত স্নেহের পসরা। কমলা নিজের পেটের ওপর হাত রাখে—

তোকে নিয়েও আমার কত স্বপ্ন রে বাপ। আমার নাড়ি ছিঁড়ে জন্মাবি তুই সোনার পুতুল। কেমন করে তোকে পুষ্টি দিই, শক্তি দিই মানিক আমার! বাপের কারখানায় মেশিন বন্ধ। বাসনমাজুনী মার দিনে এক ফোঁটাও দুধ জোটে না রে ধন। ঠাকুর—ঠাকুর—

কমলা আকুল হয়ে দেবতাকে ডাকে। বৌদির হাত ফসকে ওষুধের একটা শিশি ঝনঝন করে আছড়ে পড়ুক মেঝেয়। কাঁচের টুকরোর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ওষুধগুলো সব ছড়িয়ে যাক মাটিতে। এক একটা বড়িতে লুকনো আছে কমলার সন্তানের স্বাস্থ্য, জীবন। এত সব তো জানতই না কমলা, কিন্তু এই একমাসেই সে নির্ভুল জেনে গেছে রঙ-বেরঙের গোল, চ্যাপ্টা, লম্বা, শক্ত, তরল ওষুধ, সুষম খাদ্য আর আরাম ও বিলাসের বিভিন্ন প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু বৌদি সতর্ক সুন্দর আঙুলে ওধুষের শিশির ঢাকনা বন্ধ করে কমলার হাতে দেন। উচ্ছিষ্ট দুধের গেলাসটা কমলা নিজেই তুলে নেয় অন্য হাতে। ঘর থেকে বেরুতে তার বুক উত্তেজনায় ঢিপঢিপ করে । উষ্ণ হয়ে ওঠে গাল আর দুটি কান। পর্দা সরিয়ে সে দ্রুত চলে যায় রান্নাঘরের বেসিনে। তারপর আগ্রাসী চুমুকে টেনে নেয় ক ফোঁটা দুধ। গেলাসে বারবার জল দিয়ে সেই জলটুকু পান করে, আর যেন অনুভব করতে থাকে ভ্রূণের শরীরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে মহার্ঘ উত্তাপ।

এগারোটার সময় কাজ সেরে লিফটে নামতে নামতে কমলার মুখে আবার চিন্তার ভাঁজ পড়ে। একটু যদি ওষুধ আর পথ্য পাওয়া যেত। একবার হাসপাতাল থেকে মামুলি কয়েকটি বড়ি কাগজে মুড়ে এনে পরম যত্নে খেয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সে জেনে গেছে ওতে কিছুই এমন হবে না। লিফট চালক কমলার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন কৌতুকে হাসে। লিফট থেমে আছে। স্কুল ফেরৎ দুটি বাচ্চা কলকল করে ঢুকছে লিফটের ছোট্ট ঘরটিতে। দুটি বইয়ের স্যুটকেস, জলের বোতল আর ইস্ত্রিকরা কাপড়ের গোছা বিচিত্র কায়দায় সামলাতে সামলাতে ছ'তলার দিনরাতের কাজের মেয়েটির মুখেও কৌতুকের জিজ্ঞাসা ফোটে। কমলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। শুনতে পায় লিফটচালক তার উদ্দেশ্যে বলছে—শুনছি এগারো তারিখের পর থেকে নাকি কারখানা খুলবে? মাইনে টাইনে বাড়াচ্ছে মালিকরা?

কমলা বেরিয়ে আসতে আসতে আঁচলের খুঁট খুলে একটি মলিন একটাকার নোট বের করে। কত লোক তো লটারিতে টাকা পায়! দোহাই ঠাকুর, একবার মুখ তুলে চাও। শুধু পেটের বাচ্চাটার জন্যে ঠাকুর! দয়া কর মা। বাকি তিনটে মাস যেন একটু ওষুধ কিনতে পাই

আর ভালো থাকি।

মোড়ের লটারির টিকিটের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েও কমলা পেরিয়ে চলে যায়। রেশনের চালে কালকের দিনটাই হবে শুধু। একমাস ধরেই ডাল কেনা যাচ্ছে না। একটা ডিমের যা দাম! যদি সপ্তাহে একটা করে ডিমও খাওয়া যেত! অনেক ভেবে কমলা কটি আলু কিনে ঘরে ফেরে। ছোটবেলায় তারা বর্ষার দিনে পুকুরে গামছা ফেলে চুনো মাছ আর গুগলি ধরত। ওসব খাওয়াও ভাল। আমিষ না খেলে কি বাচ্চা বাড়ে?

রান্নাবান্না সেরে ঘর পরিষ্কার করে দুপুরে কমলা একটু শুতে চায়। একটু একটু হাঁপ ধরে আজকাল। হাত পায়ের শিরাগুলোতেও মাঝে মাঝে টান ধরছে। পাশের ঘরের মাসী বলেছে ওরকম হয় এখন। একটা নতুন মানুষ জন্ম নেবে পৃথিবীতে, তার জন্য গর্ভধারিণীর শরীর এমন বদলে যায়।

আচ্ছা, সত্যিই বাচ্চাটা কার মতো হবে? কমলার স্বাস্থ্য তো মোটের ওপর ভালই। তার মাও ছিল খুব শক্ত, স্বাস্থ্যবতী আর কাজের। অনেকদিন পর ভুলে যাওয়া মার মুখটা মনে পড়ে। বারো বছর হল মা নেই। আচ্ছা মাও নিশ্চয়ই কমলাকে পেটে নিয়ে এমন করেই ভাবত! আর প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। দূরে বাচ্চাদের খেলার গোলমালের মধ্যে আমগাছে বসা কোকিলের সুমিষ্ট ডাক ভেসে আসে। কমলা চোখ বন্ধ করে সব গোলমালের মধ্যে থেকে তার অনুভবে ছেঁকে নিতে চেষ্টা করে ওই সুর।

তিনটের সময় ব্যাংকের বাবুর বাড়িতে বাসন মেজে কাপড় কেচে বৌদির কাজে যেতে হবে। কী মিষ্টি শব্দে বাজে টুংটাং বেল! রাঁধুনী পিসী দরজা খুলে দিয়ে জলখাবার তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। বৌদি ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে ভারি সুন্দর সাজবে। কমলা খাবার টেবিলে বৌদিকে এনে দেবে দ্বিতীয় গেলাস দুধ আর বিকেলের তিনরকম ওষুধ। আচ্ছা শোবার ঘর থেকে ওষুধ আনতে আনতে যদি কয়েকটা বড়ি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়? ভগবান পাপ দেবে? পেটের না খেতে পাওয়া বাচ্চাকে মার ভালবেসে খাওয়ানো কি পাপ? কত সময় লাগতে পারে? দেরি হলে বৌদি সন্দেহ করবে না তো? রোজ নয়, পাঁচ সাতদিন অন্তর অন্তর যদি দু-তিনটে করে··· ?

এক থমথমে মেঘলা বিকালে বৈশাখ মাসের শেষে, কমলা স্যাকরার দোকান থেকে সাতাশটা টাকা আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেরোল। মার হাতের পুরনো একটা রূপোর পাত বসানো সরু পলা ছিল আর ব্রোঞ্জের ওপর সোনার জল করা ছোট্ট পুঁতির মতো একটা নাকছাবি। কারখানা খোলে নি। লোকটাকে এখন খুব চিন্তিত দেখায়। দু-সপ্তাহের রেশন ধরে এনেছে। শান্তিকাকার মুদির দোকানে তেল নুন আলু আটায় দুমাসের বাকি উনিশ টাকা। তবু কমলা চোয়াল শক্ত করে সরু রাস্তা পেরিয়ে বাসরাস্তার ঝকঝকে ব্যস্ত ওষুধের দোকানে ঢুকলো। সারা দেয়াল জোড়া সাদা কাঠের তাকের খোপে খোপে , চকচকে পালিশ করা টেবিলের কাঁচ ঢাকা তাক ভরে শুধু রঙ-বেরঙের ওষুধ, ফুডের টিন, বাচ্চার দুধের বোতল, কিছু সাজগোজের শিশি। একটা পাঁচমেশালী গম্ভীর গন্ধ। কথার আওয়াজ আর তাড়াতাড়ি কাজ করার শব্দ—সব মিলিয়ে কমলা যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ছাগলছানার পাল থেকে নিজেরটিকে খুঁজে বার করার নির্ভুল প্রত্যয়ে সে দোকানের কর্মচারীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গাঢ় খয়েরি আর সাদায় মেশানো সেই ফুডের টিনখানি, আর গোল গোল বিচির মতো ওষুধের মধুরঙের শিশিটি। দুটো মিলিয়ে একাত্তর টাকা। বিয়াল্লিশ আর উনত্রিশ। ছোট শিশি হয় না। ছোট টিন ফুডের দাম ছত্রিশ টাকা।

স্বপ্নের পাখিগুলি একে একে সব উড়ে যাওয়ার আকস্মিকতায় তার বুকে শুন্যতাটুকু ঝাপটা মারে। বুক খালি করে সব স্বপ্ন উড়ে যায়। বঞ্চনায় আর আশাভঙ্গের ক্রোধে কমলার নাক চোখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

এই দুমাসে নানা চাতুরি করে সবরকমের ওষুধ মিলিয়ে মোট চৌদ্দটা বড়ি সে খেয়েছে। দুধের গেলাসে একদিন আঁচলের সুতো ফেলেছিল, কিন্তু বৌদি দুধটা ফেলে না দিয়ে রেখে দেয় অতিথিদের চায়ের জন্য। আটমাস চলছে। অনেক ভালবাসার সযত্নে লালিত গোপন ইচ্ছের চারাগাছে সারজল পড়ে নি কিছুই। কেমন করে ফুটবে ফুল? পেটের ধনটাকে না দেওয়া গেছে একটু ভাল খাবার, অনাগত শিশুর জন্যে কোনরকম ভেষজ বা রাসায়নিক ওষুধ। নিজের শরীরের ভেতরের বাচ্চাকে তিলে তিলে শুকিয়ে মারতে মারতে চোখের জলে, ঘৃণায় আর অভিমানে এক আসন্নপ্রসবা মা তৈরি করে আরেক গর্ভিনী মায়ের জন্য খাদ্য, আর আরামের উপচার।

বস্তির দিকে অন্ধের মতো হাঁটতে হাঁটতে কমলার মনে পড়ে এই দুটো মাস সে লোভী বিড়ালের মতো ছোঁকছোঁক করে খুঁজে বেড়িয়েছে শুধু একটু পুষ্টিকর খাবার। পয়লা বোশেখ ব্যাঙ্কের বাবুর বাড়ি থেকে কটা বাসি লুচি আর টকে যাওয়া আলুর দম আর দুটো দলা পাকানো সন্দেশ সে একাই খেয়ে নিয়েছে নিঃশব্দে। কোনো ভাল জিনিস লোকটাকে না দিয়ে এতদিন খেতে পারত না কমলা। ছেঁড়াতারের মতো তির তির করে নাক আর মুখ কেঁপে দুচোখে উজিয়ে আসে তপ্ত জল। বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে কমলা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে, ভেবেছিলাম যেমন করে পারি তোকে ঠিক ভাল ভাল জিনিস খাওয়াব। কিন্তু এই দুনিয়াটা বড় কঠিন রে বাপ। এই গরিব মায়ের পেটে কেন জন্মাতে এলি তুই।

ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে কমলার চোখেমুখে। দেখতে দেখতে বাতাসের তীব্র স্রোত সোঁ সোঁ করে আছড়ে পড়ে রাস্তায়। হাওয়ার গর্জনের সঙ্গে বিচিত্র আওয়াজ ওঠে। পাতা ওড়ার, মানুষের দ্রুত চলাফেরার। সশব্দে দোকানের আধ ভাঁজ করা দরজা বন্ধ হতে থাকে। উচ্ছিষ্ট শালপাতা হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে কমলার শরীরে এসে লেপ্টে যায়। ধুলোবালিতে তার দাঁত কিচকিচ করতে থাকে। আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে লাফিয়ে যায় বিদ্যুৎ, আর আশঙ্কায় কমলা দুহাত দিয়ে তার উন্নত গর্ভ আঁকড়ে ঢুকে যায় একটি দোকানে। গর্ভের শিশু যেন ভয় না পায়।

অভাবের হাত থেকে শেষ সম্বল কমলার বড় সাধের সাতাশটি টাকার কিছুই বাঁচানো যায় না। তবু কমলা ছোট্ট চাদর দিয়ে বড় বিছানা টেনেটুনে ঢাকার মতো সুনিপুণ গৃহিণীপনায় চারটি টাকা লুকিয়ে তুলে রাখে। হঠাৎ ব্যথা উঠলে রিকশা ডেকে হাসপাতালে যেতে হবে তো। অবশ্য আশপাশের ঘরের সবাই আছে, তাও এসময় কখন কি দরকার হয় বলা যায় না।

এগারো দিন কেটে গেছে। মাইনে পেতে এখনও পাঁচ ছদিন দেরি। এখন প্রায় জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি। এর মধ্যে আর একদিনও বৃষ্টি হয় নি। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে উনুনের সামনে বসে রুটি বেলার পরিশ্রমে কমলা ঘেমে ওঠে। যা আটা আছে তাতে পাঁচটা রুটিও হবে না। কাল কাজ থেকে ফেরার পথে আবার ধারে আটা আনতে হবে। এদিকে আলু তেল সবই ফুরিয়েছে। লম্ফ জ্বালার তেলও নেই। হয়ত ওই চারটে টাকার থেকে একটা কাল ভাঙতে হবে। ক্ষোভ আর ক্রোধে কমলা আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এসময় কোথায় একটু পেট ভরে খাবো, না আধ পেটা খেয়ে আছি। বাচ্চাটা যদি রুগ্ন লিকলিকে হয়ে জন্মায়। এই বাইশ বছরের জীবনে তো কিচ্ছুটি চাইনি ঠাকুর, শুধু পেটের সন্তানটা একটু সুস্থ হোক, তাও তুমি মুখ তুলে চাইলে না

মা। বেড়ার দেয়ালে ঝোলানো মা কালীর ছবির তলায় পদ্মাসনে বসে থাকা রামকৃষ্ণ আর সারদা স্মিতমুখে কমলার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বাইরে থেকে লোকটার কথার শব্দ এগিয়ে আসে। কমলা দরজার দিকে না তাকিয়ে শুধু একটু সরে বসে। ও হাতমুখ ধুতে ধুতেই খাবার বাড়া হযে যাবে। এই কদিন তবু রাতে সাত আটটা করে রুটি হচ্ছিল। আজ মোটে পাঁচটা। কার মুখে কি দেবে কমলা। যাই হোক না কেন পেটেরটাকে তো সব আগে খাওয়াতে হবে।

পাতলা ট্যালট্যালে ডাল দিয়ে ভিজিয়ে দুটো রুটির শেষ গুড়োটুকুও খেয়ে নিয়ে কমলার স্বামী জিজ্ঞেসা করে—আর রুটি নেই, না? অবশ্য খিদেও নেই তেমন—

নিজের জন্য তিনখানা রুটি গুছিয়ে তুলে রাখার অপরাধবোধে কমলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। —আর একটা মোটে আছে, চাও তো তাও দিয়ে দিচ্ছি। একা আমার রোজগারে আর কত টানবো? তবু তো এই শরীরে দু বাড়ি খাটছি!

লোকটা অপ্রতিভ হয়ে বলে—না না, তা বলছি না। আমি বিকেলে পেট ভরে খেয়েছি। তুমি বরং আমার জন্যে দুটো না রেখে একটা রাখলেও পারতে।

বলতে বলতে সে অ্যালুমিনিয়মের গেলাসে করে বাঁ হাতে জালা থেকে জল তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘরের বাইরে কুলকুচোর আওয়াজ শোনা যায়। ঘরে এসে হাত মুখ মুছে লোকটা উল্টোদিকে হারানদার ঘরে বিড়ি খেতে যাবার জন্য মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কমলা চটপট নিজের খাবারটা বেড়ে নেয়। এর মধ্যে একদিন তিরিশ পয়সার গুঁড়ো দুধ কিনেছিল। তারই শেষ ডেলাটুকু জলে গুলে তাই দিয়ে তিনটে রুটি খেতে খেতে কমলা জোর করে স্বামীর ক্ষুধার্ত মুখটা মন থেকে সরাবার চেষ্টা করে। সত্যিই কি বিকেলে কিছু খেয়েছে লোকটা? মাইনে পেয়ে ওর জন্যে কুড়ি পয়সার একটা সিগ্রেট কিনে আনবে। আর গুঁড়ো দুধও কিছুটা কিনতেই হবে। দুধই হচ্ছে বাচ্চার জন্য সবচেয়ে ভাল। খাওয়া শেষ হলে কিনকিনে খিদেটাকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য বাঁ হাতে গেলাস ধরে আলগোছে জল খেতে গিয়ে ও থমকে যায়। শোবার আগে খাবে। ততক্ষণ ওই দুধ আর রুটিটুকুর নির্যাস ভাল করে বাচ্চার শরীরে মিশুক। জল খেলেই তো পাতলা হয়ে যাবে সব।

গভীর রাতে স্বামীর পাশে শুয়েও কমলা চিন্তায় ছটফট করে। প্রসবের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন নিজেকে অসহায় লাগে। দেখতে দেখতে কটা মাস কেটে গেল। এত কিছু করেও কিছু করা গেল না বাচ্চাটার জন্য। অথচ কি করলে কি হয় সব জানে কমলা। কারখানাটাও যদি খুলে যেত, তাহলেও হয়তো···কমলা পাশ ফিরে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। রাস্তার ঘোলা আলোর সঙ্গে মিশে পাতলা জোৎস্না এসে পড়েছে লোকটার মুখে। আমগাছ থেকে কি একটা পাখি হঠাৎ শী শী করে ডেকে উঠল।— আচ্ছা, শুয়ে আছে বলেই কি গালের হাড়দুটো এত উঁচু দেখাচ্ছে লোকটার? গলায় ঘামাচি বিজবিজ করছে? পাঁজরের হাড়গুলোর ওপর থেকে মাংস আর চামড়ার চাদর এত পাতলা হয়ে গেল কবে? কতদিন—কতদিন লোকটাকে পেট ভরে খেতে দির্তে পারে নি কমলা। নিজেও যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে খেয়েছে তা না, তবু পেটের বাচ্চাকে বাঁচাবার আগ্রহে ইদানীং খাবারের ভাগটা অসমান হয়ে যাচ্ছে। যেমন আজ। কমলা দেখতে পায় না তার নিজের চোখের তলায় কালিও গাঢ়তর হয়েছে, শীর্ণ হয়ে এসেছে তার দেহ। অনুশোচনায় আর অসহায় রাগে বিদ্ধ শরীর আকুল কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে। লোকটা পাশ ফিরে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি নিজের ঘেমো বুকটায় টেনে নেয়। একহাতে তাকে জড়িয়ে রেখে অন্যহাতটি রাখে কমলার স্ফীত গর্ভের ওপর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে

কমলার গর্ভের উষ্ণ অন্ধকারে সেই রক্তমাংসের প্রাণটি যেন নড়ে ওঠে। রোমাঞ্চে , আবেগে কমলার সারা শরীর উথাল পাথাল করে।—কি করিস রে বাপ? মায়ের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বাপের হাতের ছোঁওয়ায় সাড়া দিস বুঝি তুই? নাকি মায়ের আধপেটা খাবারে খিদে মেটে নি তোর? চারপাশে এত খাবার, তবু তোকে পেট ভরে খাওয়াতে পারলাম না মানিক! জন্মাবার পরেও এমনি করেই আমার চোখের সামনে তুই রোগা থেকে আরও রোগা হয়ে যাবি ধন! সৌন্দর্য, পুষ্টি, শক্তি, বুদ্ধি , স্বাস্থ্য—সব বন্দী রয়ে গেল রঙ-বেরঙের শিশি-কৌটোয়, অমৃতের মতো দুধ, সুস্বাদু মাছ, মাংস, ডিম আর তাজা ফলের রসে। এই নটা মাসে তোকে আমি এসব কিছু দিলাম না বাপ। কিন্তু তোকে আমি আমার সব রাগ, সব বেদনা আর দুঃখ উজাড় করে দিলাম লালকমল! যে দুনিয়াটা আমায় এই বাইশ বছর ধরে ঠকিয়ে এল তার জন্যে ঘেন্না দিলাম। নীলকমল রে, তোর জন্যে তুলে রাখলাম চোখের জল আর অভিমান। যেমন করে আমার শরীর ছিন্নভিন্ন করে বেরুবি তুই, তেমনি করেই এই দুনিয়াটাকে তুই ছিঁড়ে ফেলে দে বাপ!

কমলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার স্বামী। টানটান হয়ে ওঠে তার বিনিদ্র স্নায়ু। আর আশা-আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনায় থরথর কাঁপে এক অভিমানিনী গর্ভিনীর শীর্ণ শরীর।

মৃত্যুর পূর্বরাত্রে

পূরবী চক্রবর্তী

দৃশা, পৃথিবীটাকে তুই খোলাচোখে—সোজা, বাঁকা সব দিক দিয়েই দেখেছিলি। জাগতিক বিষয়ে তোর জ্ঞানের পরিধি ছিল অনেক বড়। মনে আছে, কতবার কত কথায় তুই বলেছিস—'বিশ্ব-সংসারে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষই যে আছে, তার অন্ত পাওয়া ভার। ভাবতে গেলে থই মেলে না। শুধু দেখে-শুনে যাই—আর মনে মন মিলিয়ে বুঝতে চাই যেটুকু পারি। বেশ লাগে।' তখন তোর সেই ধীর কণ্ঠ আর জানার আলোয় উদ্ভাসিত চোখ-মুখ দেখে আমার কেমন মনে হত, তোকে বিশ্বাস করা যায়, গোপনতম কথাটিও খুলে বলা যায় আর জীবনের চলার পথ ভুল হলে পথের নিশানাও বুঝিবা পাওয়া যায়।

কেমন করে যেন বিশাখা তোর নিত্য-সঙ্গিনী হয়ে গিয়েছিল। তোদের অবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব নিয়ে কত কৌতুক করত সকলে। ক্রমে আমিও সব-সঙ্গ ছেড়ে প্রায় সময়েই তৃতীয়জন হয়ে তোদের পাশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। দৃশা, তখন আমার জীবনে একটা ওলট-পালট শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাল রাখতে পারছিলাম না তার সঙ্গে। আর খুব ভালও ঠেকছিল না। আমি ভয় পেয়েছিলাম। তাই একটা দৃঢ় নির্ভরতাকে অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম। অজানিতেই তুই আমার সেই আশ্রয় হয়ে গিয়েছিলি। তোর মুখের কথায়, সখিত্বের সহানুভূতির স্পর্শে আমি শান্তি আর সান্ত্বনাকে খুঁজে পেতাম।

কোন কিছুতে কৌতূহল প্রকাশ করা ছিল তোর স্বভাববিরুদ্ধ—যা তোকে অন্যের চোখে দাম্ভিকের পর্যায়ে নিয়ে যেত। তবু তোকে আমার জীবন-মনের সব এলে-বেলে কথাগুলোই কখন বলা হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে গোপন আর গভীর কথাটি যেদিন বলেছিলাম, তখন কিন্তু তুই আর মৌন হয়ে থাকতে পারিস নি। বেদনাকরুণ চোখে আমার দিকে সোজাসুজি চেয়েছিলি আর আমার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে দেবার প্রয়াসও পেয়েছিলি। কিন্তু কত যে দুর্বল আমি, তোর তো তা অজানা ছিল না। তুই যদি আর একটু জোর করে বলতিস—এই পরিণতি আজ বুঝি আমার হত না। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িয়ে যাওয়া তো তোর আদর্শ নয়। দৃশা, অন্যায় আক্ষেপ করে আর পাপের ভার বাড়াব না—যা জন্ম থেকে মৃত্যুর পরেও আমাকে অব্যাহতি দেবে না। আমার অব্যবস্থিতচিত্ততা, অশক্ত মনোভাবই এই চরম নিয়তির দিকে আমাকে অগ্রসর করেছে। এই আমার বিধি। অনুতাপ আমাকে দোষহীন, নিষ্পাপ করুক।

বলা আর না-বলা যত কথা আজ লেখায় সাজিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। দৃশা, আমি সাহিত্যিক নই। কিন্তু আনন্দের ফুল কেমন করে বেদনার কীটদষ্ট হয়ে ব্যর্থতার ধূলিতে ঝরে যায়—সমগ্র আমি তারই এক আশ্চর্য আলেখ্য। কিন্তু তা হবার নয়। আমার এখানে তোর প্রথম ও শেষ আসার সেই দিনটির পর থেকে, তোর কোনও সংবাদই রাখি না আমি। শুনেছি নতুন বাড়ীতে চলে গেছিস তোরা। কলকাতার একই প্রান্তে থেকেও তোর ঠিকানা জানি না। জানতে চাই না বলেই জানি না। দুঃখ লজ্জা আর অনুশোচনায় আমি হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম তোদের কাছ থেকে, চিরদিনের মত। আর জানলেও এই অবস্থায়, আমার একটা দুর্ঘটনার গ্লানির সঙ্গে তোকে লিপ্ত করে যেতে পারতাম না। তবু তোর উদ্দেশেই আমার এই মনে-মনের স্বীকারোক্তি—কন্‌ফেশন।

বাবা, মা, দুটি বোন ও একটি ভাই নিয়ে আমাদের ছোট্ট সংসার। বাবার ছিল অল্প আয়। কিন্তু সুখ, শান্তি আর স্নেহ-ভালবাসা ছিল অপরিমিত। অন্ততঃ আমাদের তো সেকথাই মনে হত। তাই ক্ষোভ ছিল না কোনও। বদলীর চাকরী। বাবার সঙ্গে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হত সকলকে। আমার পড়াশুনা বারে-বারে স্থান পাল্টাত, কিন্তু এগিয়ে চলত অব্যাহত গতিতে। বাবা নির্বিরোধী ভালমানুষ ছিলেন। স্ত্রীর কর্তৃত্ব প্রায় পুরোপুরি মেনে নিয়ে সন্তর্পণে নিজেকে সংসারের আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন সর্বদা। গৃহী হয়েও তিনি এক ধরনের বিবাগী জীবন যাপন করতেন। শুধু তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিলাম আমি। আমার শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব ব্যাপারেই তাঁর স্নেহের দৃষ্টি ছিল সদা-জাগ্রত। সেখানে এতটুকু বাধা-বিচ্যুতি তিনি সইতেন না। দৃশা, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছি মা আর বাবার মধ্যে আমি যেন এক বিরোধের স্পষ্ট পাঁচিল তুলে দিয়েছি। তাঁরা দুজনেই আমাকে একান্ত করে নিতে চাইতেন। কিন্তু তাঁদের চাওয়ার ধরণে কেমন একটা ভিন্নতা ছিল। অন্তরের সুবুদ্ধির প্রেরণায় আমি বাবার দিকেই ঝুঁকে ছিলাম। মনে হত অনধিক উপার্জনের একটা মোটা অংশই যে আমার খাতে ব্যয় হয়—এটা মার পছন্দ ছিল না। যার জন্য প্রায়ই কলহ হত। শেষপর্যন্ত শক্তমুখে বাবা চুপ করে যেতেন। আমাকে কাছে টেনে ধীরে ধীরে মাথায়-গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। তাঁর অব্যক্ত সব শুভ-ইচ্ছাই সেই স্পর্শে বলা হয়ে যেত। আর বিচলতা জয় করে আমি দৃঢ় হতাম। যেভাবেই হোক, স্বচ্ছল হতে চাইতেন মা। পিতা-পুত্রীতে আমরা জ্ঞানে-অজ্ঞানে সে ইচ্ছার বিরোধিতা করে চলতাম। এ-ছাড়া মার বাৎসল্যে আর কোনও ত্রুটি আমি দেখিনি। তাঁকে আমি অন্ধভাবে ভালবাসতাম, দৃশা।

আরও একটা অদ্ভুতত্ত্ব আমার চোখে ধীরে ধীরে ধরা পড়েছিল। সে আমাদের আত্মীয় আর চেনামহলের সঙ্কীর্ণতা, স্বল্পতা। মনে ভেবেছিলাম, হয়ত আমাদের নিম্নবিত্ততাই এর হেতু। একে তুচ্ছ করতে, নিজের চেষ্টায় বড়, অনেক বড় হবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল আমার আহত যৌবনের মনে। স্কুল-কলেজের প্রভাব ছিল এর মূলে। বিদ্যামন্দিরের মারফৎ আমি তোদের মত উঁচু মান, মন আর দামের মেয়েদের অনেক কাছাকাছি হতে পেরেছিলাম। সরস্বতীর পদপ্রান্তে সব ধরনের আর রকমের মানুষই যে এসে এক হয়ে যায়। অর্থ আর জাত-গোত্রের যত পার্থক্যের তুচ্ছতা সেই মহনীয় পরিবেশের উদারতায় নিঃশেষে হারিয়ে যায়। আমি তা মর্মে মর্মে জেনেছি। আর মহত্তর জীবনের দীক্ষা নিয়েছি সেখানেই।

মা তাঁর কালো মেয়ের নাম দিয়েছিলেন অঞ্জনা। কিন্তু বাবা ডাকতেন মণি। এ নিয়ে মার পরিহাসের উত্তরে অনেক আদরে তিনি আমাকে বলতেন, 'তুই আমার চোখের মণি। সে মণি কালো, তবু অনেক তার দাম।' সত্যি বলতে কি, তাঁর এই পক্ষপাতিত্বের জন্য ছোট ভাই-বোনদের কাছে আমি কিছুটা কুণ্ঠাবোধ করতাম। সোহাগে তাদের ভরিয়ে দিতে চাইতাম। তাদের আন্তরিকতা আমাকে বঞ্চনা করেনি—সেই আমার পরম পাওয়া।

বাবার রিটায়ারমেন্টের আগে আগে আমরা কলকাতায় এসে স্থিতি নিলাম। তখনই তোর সঙ্গে আমার পরিচয়। মা আমাকে সেতার শেখানোর প্রস্তাব করলেন,—বাবা সমর্থন করলেন। তারপর একদিন কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন ছাত্র বাসব ব্যানার্জী উপস্থিত হলেন আমাদের কাছে। অর্থ নয়, আহার-আবাসের বিনিময়ে, গেস্টের যাবতীয় সম্মান-সুবিধা নিয়ে এখানে থাকবার অভিপ্রায় জানালেন। রেফিউজি হলেও তাঁরা হৃতসর্বস্ব হননি। তাঁর পরিবার অস্থায়ী বাসা বেঁধেছে মফঃস্বলে। এখানকার শহরতলী অঞ্চলে কিছু জমি কেনা হয়েছে। সেখানে মাথা গোঁজবার মত ছোট একটি আস্তানা করা হবে এবার। মেসে থেকে

অফিস যাওয়া বা গৃহনির্মাণের তদারকী করাটা মানসিকতায় ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছেন না তিনি। এক পারিবারিক আবহাওয়ার বাসস্থানের তাই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আর বাজনাও তাঁর পেশা নয়—নেশা। মার ইচ্ছায় তাই হল। আমার উদারপন্থী বাবাও এতে বাধা দিলেন না।

ভাঙ্গাচোরা আলোবাতাসহীন দু-কুঠরীর এই ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীতে সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে তিনি নির্দ্বিধায় এসে উঠলেন। মাকে মাসীমা ডেকে, আর সকলকার সঙ্গে সেইভাবে সম্পর্ক পাতিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির বড়-ছোট সকলকেই আপন করে নিলেন। তাঁর হৃদ্যতা ছিল নিখাদ। তাই সঙ্কোচ করবার, আড়াল রাখবার আর কিছুই রইল না। ক্রমে সুখে-দুঃখে একেবারে আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গেলেন বাসুদা। মার নির্দেশে মাষ্টারমশায়ের ডাক-নামটিই চালু হয়ে গিয়েছিল মুখে মুখে। তিনি অবসর সময়ে আমাদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন, এটাসেটা কিনে দিতেন, মাঝেমধ্যে দেখেছি মার হাতে দরকার অদরকারে কিছু কিছু টাকাকড়িও তুলে দিতেন। সাংসারিক বিষয়ে মাকে পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য, বাবাকে সঙ্গ দান, ছোট ভাইবোনদের পড়াশুনায় সহায়তা করা,—সবই তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে গেল একে একে। ভাইটির অসুখে তাঁর বিনিদ্র সেবার ঐকান্তিকতা আমাদের অভিভূত করেছিল অক্লেশে—হৃদয়ের একান্ত দাবীতে। বাবা সুখী হয়েছিলেন। অভিযোগ ভুলে মার মুখও দিনে দিনে আনন্দে উজ্জ্বল হচ্ছিল।

পড়াশুনা আর আমার সেতার শেখাও চলছিল সমানে। বাবার সঙ্গে বাসুদাও একমত ছিলেন যে, 'মণিকে চৌকস করে তুলতে হবে, নানাদিকে—সেই সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল।' উপযুক্ত পুত্রহীন গৃহের অদূর ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেবার জন্য আমিও এবার তৈরী হচ্ছিলাম মনে মনে। কিন্তু খুলে বলতে গেলে, বয়সে বেশ কিছুটা বড়, ধীর, গম্ভীর, সাদাসিধে, অথচ তীক্ষ্ণধী আর আত্মাভিমানী মানুষটিকে শুধু ভক্তি নয়, ভয়ও করতাম রীতিমত। এতটুকু বেনিয়ম, বেচাল দেখলে ছোটদের মত আমাকেও এমন ধমকে দিতেন যে চিরদিনের আদরিণী আমি কান্নায় ছলছল হতে গিয়ে আরও তর্জন শুনে চমকে থেমে যেতাম। কিন্তু রাগ করে মুখ ভার করতে পারতাম না বেশিক্ষণ। চূড়ান্ত শাসনপর্বের কিছু পরেই শুরু হত মধু- বর্ষণ। হাসি গল্প আর হৈ-চৈ-এ কখন ভুলে যেতাম সব। উছলে উঠতাম আবার।

তাঁর স্বজনরাও কখনও কখনও দু-পাঁচদিনের জন্য আমাদের এখানে উঠতেন। সহানুভূতি আর ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলেছিল এই দুই কায়স্থ ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে। বাসুদার বিয়ের ব্যাপারে কলকাতাবাসী হিসেবে আমাদের উপর খানিকটা দায় পড়ল প্রাথমিক মেয়ে দেখা ও খবরাখবর করার। সে কী উৎসাহ আমার—কনে দেখবার। বাসুদার বৌ যেন আমার আপন ঘরের বৌদিটি। ভাবী ননদিনীত্বের গৌরবে ভীতি কমে গেল অনেক। তাঁর বোনদের সঙ্গে একজোট হয়ে ঠাট্টায় জ্বালাতন করে তুলতাম একেবারে।

এমনই সময় একরাতে নীচুগলার আলাপে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি, নিঃসাড়ে পড়েছিলাম। আমাদের নিদ্রার অবকাশে বাবা-মা নিশ্চিন্ত হয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন যেন। ইদানীং তাঁদের এমন নিবিড়ভাবে কথা বলতে আমরা দেখিনি। তাই স্বভাবতই কৌতূহল হল। কান পাতলাম সেদিকে। মা বললেন, 'যাই বল তুমি, বাসুকে চিরদিনের মতো আমাদের করে ধরে রাখতেই হবে। যে করে হোক মণির সঙ্গে ওর বিয়ে দেবই আমি।' বাবা চিন্তিতভাবে বললেন, 'মণিকে ওঁরা যথেষ্ট স্নেহ করেন সন্দেহ নেই, কিন্তু যেরকম কনজারভেটিভ ফ্যামিলি আর জাত-পাত-কোষ্ঠী মেলাবার বাতিক দেখছি, তাতে কায়স্থর মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলবেন বলে তো মনে হয় না। আর তাছাড়া বাসুর নিজের কথাটাও

তো শুনতে হবে।' ঝঙ্কার দিলেন মা, 'রক্ষণশীলতাকে এত সম্মান-শ্রদ্ধা করছ কবে থেকে? বুড়োবয়সে অনেক গুণ তোমার হয়েছে জানি। আমি তবু ঠিক তেমনই আছি। নিজের ইচ্ছে থেকে একচুলও সরব না। নয়কে হয় করব, তবে ছাড়ব। তুমি শুধু দয়া করে বাধা দিও না, কথা কয়ো না এর মধ্যে। মেয়ের ভাল তো চাও? সে সুখী হবে,—জেন। আর বাসুকে আমি জিজ্ঞেস করব সরাসরি—।'

দৃশা, বলে বোঝাবার নয় সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। মনে হল আমার আমিত্ব যেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই দেহটাকে। ঝিমঝিমে এক অন্ধকারের শিথিলতা তনুমনের চারিদিকে। শুধু শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরে একটা হিম প্রবাহ নেমে যাচ্ছে নীচে, আরও নীচের দিকে। অন্তরের কোনও এক কোণেও যে চিন্তা কখনও আসেনি, মার মুখে তা-ই যখন আমার একটা সুখের অভিলাষ হয়ে মিথ্যারূপে দেখা দিল, তখন আনন্দের বিন্দুটুকুও ঝরল না সেখানে। অভাবনীয় আঘাতে স্নায়ুর ভারসাম্য হারিয়ে গেল। আর আতঙ্কে অস্থির, উদ্বেল হয়ে গেলাম আমি। মার কথা অসমাপ্ত রইল। সামনের বড় রাস্তায় তীব্র হর্ণ আর তীক্ষ্ণ-কর্কশ ব্রেকের আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেল ফুটপাথে নির্ভাবনায় শোয়া এক নির্দোষ মানুষের অসহায় মরণান্তিক আর্তনাদের কাতরতা। সারা পাড়া জেগে উঠল। ভিড়, পুলিশ, কোলাহল, পলাতক অপরাধীর অনুসন্ধান। সে এক বীভৎস পরিস্থিতি। সকলে ছুটে গেল বারান্দায়। আর ত্রাসে নির্জীব হয়ে বালিশে মাথা গুঁজে আমি পড়েই রইলাম ঘরের মধ্যে।

তারপরের দুটো দিন নিজেকে আমি যেন লুকিয়ে চলতে চাইছিলাম সবার সামনে থেকে। মুখ তুলে সোজা করে তাকাতে পারিনি কারও—বিশেষতঃ বাসুদার দিকে। লজ্জা, ভয়, আর অভিমানে উপচে পড়ছিলাম আমি চোখের কোণে—ক্ষণে ক্ষণে। দৃশা, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য গতি আমার প্রথম বড় ধাক্কাটা পেল বাস্তবের স্বার্থ-সংঘাত আর ভবিষ্যতের রূঢ় চিন্তার কাছে। আমি দিশাহারা হলাম। ক্ষোভ জাগল আমার সম্বন্ধে মার এই অসঙ্গত ধারণা আর বিধানে। ক্ষুণ্ণ বোধ করলাম—কেন বাবা একটিবারও আমার নিজের কথাটি জানতে চাইলেন না—ভুল ভাবলেন আমাকে। আর সন্তানের মঙ্গলকামনায় স্থির হয়ে রইলেন এক আসন্ন বিপর্যয়কে অবধারিত করে। স্পষ্ট কথায় তাঁকে 'না' বলে দেবার মত সাহস ও স্বাধীনতা তো তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা হল না। নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। শুধু মনে মনে গুমরে জ্বলতে লাগলাম। তবু তো তখন অনাগত দিনের স্বরূপ আমার ঠিকঠাক জানা ছিল না।

দুদিন পরে। বাবা আর বাসুদা সেই ছুটির দুপুরে একসঙ্গে খেতে বসেছেন ভেতরের এক চিলতে বারান্দায়। মা কথাটা পাড়লেন। বাসুদার অনুরোধে তাঁর প্রিয় একটা পদ সেদিন রান্না করেছিলাম নিজের হাতে। তিনি প্রশংসা করে আবারও আনতে বলেছিলেন। তরকারির বাটি হাতে ঘর থেকে বার হবার মুখেই তাঁদের আলাপ শুনতে পেয়ে প্রচণ্ড একটা হোঁচট খেলাম চৌকাঠে। ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ল পায়ে আর কপোল বেয়ে জল। ও'রা অন্যমন ছিলেন,—তাই জানতে পারলেন না। ভেতর থেকে ছোটবোন কলি ছুটে এল। 'কি হল রে দিদি?'—সমবেদনায় প্রশ্ন করল সে। দাঁতে ঠোঁট চেপে যন্ত্রণা সামলে ইশারায় তাকে বললাম পরিবেশন করতে। বাধ্য মেয়ে, তখনই চলে গেল করুণভাবে আমার আঘাতের দিকে চেয়ে। সরলা কিশোরী ও। শোনেনি কিছু। বুঝতেও পারল না আমার এ অবাধ্য অশ্রুর উৎস কোথায়।

নিচে থেকে কোন্ বান্ধবীর ডাকে সে নেমে গেল। আমি তখনও দাঁড়িয়ে সেই দুয়ার-প্রান্তে উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম বাইরের দিকে। প্রতিমুহূর্তে প্রত্যাশা করেছিলাম এখনই এক প্রাণখোলা

হাসির দমকে এই অসম্ভব প্রস্তাবের গুরুগম্ভীরতাকে উড়িয়ে দিয়ে পারিপার্শ্বিককে স্বাভাবিক করে তুলবেন বাসুদা। তাঁর লঘুসুরের নেতিব্যঞ্জক উত্তর এতটুকু ক্লিন্নতার ছাপ রেখে যাবে না কারও মনে। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি শুধু তাই-ই প্রার্থনা করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম। এখন মাঝে মাঝেই মনে হয় 'ঈশ্বর' বুঝি বা বধির, নয়তো একটা অর্থহীন শব্দমাত্র। নয়তো কেন তিনি কোনদিন শুনলেন না আমার মনের যত অন্তহীন আকুলতা! চিরকাল শুধু বিড়ম্বনার ভার বইতে হল আমাকে। শিক্ষক-শিষ্যার সম্বন্ধের অপার দূরত্বই তো শুধু নয়, শিশুর সহজতায় যাঁকে একই পিতামাতার সন্তান বলে কল্পনা করতাম, তাঁর সঙ্গে এমন সম্পর্কের কথা যে ভাবতেও পারা যায় না। এখানে প্রত্যাখ্যান করলে নারীত্বের লাঞ্ছনা হত না বিন্দু পরিমাণ, শুধু সেই সৌজন্যবোধে আরও সশ্রদ্ধ, অবনমিত হতাম আমি। কিন্তু আমাকে অবাক করে ঘটল অন্যরকম। কিছুক্ষণ চুপ করে নীচু মুখে থালার ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন তিনি। কপাটের পাশ থেকে আমি তাঁকে চুপিচুপি দেখছিলাম। যাবার আগে হঠাৎ-ই মুখ ফিরিয়ে বললেন,—'ভেবে দেখি।' তারপর তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সন্তর্পণে সরে গেলাম সেখান থেকে।

দিনগুলি বয়ে চলল যথাপূর্ব। সাধারণভাবে খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায় না কারও। শুধু ভেতরের ঝড় আমার শরীরে সুস্পষ্ট ভাঙ্গনের ছাপ এঁকে দিল। কিন্তু আমি যে কিছু শুনেছি, জেনেছি—তা তো কেউ জানত না। একাকী তাঁর সামনে যাওয়া এ কদিন সযত্নে এড়িয়ে চলছিলাম। সেই সকালে চা নিয়ে তবু আমাকেই যেতে হয়েছিল ও'র কাছে। ধারেকাছে ছিল না যে কেউ পাঠাবার। স্নান করে সামান্য প্রসাধন সেরে জলখাবারের বিলিব্যবস্থায় মাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম রোজকার নিয়মে। আর সকলে উপস্থিত হয়নি তখনও। ধূমায়িত চায়ের কাপ আর নিমকির প্লেট আমার হাতে তুলে মা দিয়ে আসতে বললেন ওঘরে। থরথরিয়ে উঠল বুক। এদিক ওদিক তাকালাম নিরুপায়ের মত। তারপর যেতেই হল পায়ে পায়ে এগিয়ে।

উনি পিছন ফিরে চেয়ারে বসে কি যেন একটা বই পড়ছিলেন। টেব্‌লের উপর হাতের জিনিসগুলি কোনরকমে রেখেই আমি চলে আসছিলাম। হঠাৎ ডাকলেন—'শোন।' ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এগিয়ে এলেন আমার কাছে। নির্ণিমেষে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সে দৃষ্টির সামনে বিবশ হয়ে গেলাম। মাটির বুকের শরণ খুঁজলাম সব্যস্তে। স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বললেন সহসা, 'মা-বাবা চান তুমি আমি এক হয়ে যাই। তোমারও কি তাই ইচ্ছে?' আঁধারের অনুভব আবার নেমে এল চতুর্দিকে, রক্তস্রোত থেমে যেতে চাইল, স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আবারও প্রশ্ন করলেন অনেক আদর আর আগ্রহে, 'বল?' বিবর্ণ মুখে, কাঁপা ঠোঁটে কোনও কথা না বলেই ছুটে পালিয়ে গেলাম আমি।

আমার মৌনতাকে ওঁরা সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই এক মধ্যদিনে প্রায় সবার অজানিতে, বিনা শঙ্খ-হুলুধ্বনিতে মাত্র কজন সাক্ষীর উপস্থিতির মধ্যে আমাদের বিয়ে সারা হল ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে। আমি কুমারী অঞ্জনা সরকার, কলমের আঁচড়ে মিসেস্ বাসব ব্যানার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম কম্পমান কয়টি মুহূর্তের ব্যবধানে। ওপক্ষ থেকে প্রবল বাধা আসবার আশঙ্কা থাকায় তাঁদের কাছে আপাতত চাপা রইল সব। নির্জীবের মত আমি যখন সমাগতজনের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা গ্রহণ করছিলাম—আমার কাছে সেটা উপহাস বলে বোধ হচ্ছিল। অশুভ মনে হচ্ছিল সেই ক্ষণ। আর অঘটনের আশঙ্কায় দুরুদুরু করছিল অন্তর। বিদ্রোহ করতে, পালাতে চেয়েছিলাম সেখান থেকে। কিন্তু ভাঙ্গা মনে প্রতিরোধ করবার শক্তি, সাধ্য জোগায়নি। ভাগ্যকে আমি নত মাথায় মেনে নিয়েছিলাম—নিতে বাধ্য

হয়েছিলাম।

কুমারীর মত সাদা সীমন্ত নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আবার নিয়মিত কলেজ করতে শুরু করলাম। তোরা এ বিবর্তনের কথা কিছুই জানতে বা বুঝতে পারলি না, দৃশা। চমৎকার অভিনয় করে চলেছিলাম আমি। সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মুক্ত মনের মেয়েটি তো আর ছিলাম না। যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছিলাম জাগতিক ব্যবহার সম্বন্ধে এই সামান্য কালের মধ্যেই। তবু অনেক নিদারুণ অভিজ্ঞতার বাকী ছিল তখনও।

স্বামী বলে যাঁকে মেনে নিতে হল, প্রিয় বলে তাঁকে বরণ করতে পারিনি। তাই সুখের লেশটুকুও ছিল না আমার মনে। তবু সকলকে কর্তব্যে আর সুখী হবার ছলনায় তৃপ্ত করবার কী অবিরাম চেষ্টা! তাঁর আন্তরিক সোহাগে ক্লিশিত হতাম, বিক্ষোভ আর বেদনায় মথিত হয়ে যেতাম ভিতরে। তবু অনুরাগের ভান করতাম, আপ্রাণ চেষ্টায় মুখে আনতাম আনন্দের ব্যঞ্জনা। অনুতাপে পুড়ে যেতাম, বড় হীন মনে হত নিজেকে।

এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলতে পড়ায় মনোযোগ দিলাম বেশী করে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে গেল। পাশ করলাম ভালভাবে। তাঁর ইচ্ছা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও ছিল এই সফলতার একটা বড় কারণ। এবার বাঙ্গালায় অনার্স নিয়ে ঐ কলেজেই বি-এ পড়তে শুরু করলাম। এখানেও তুই, বিশাখা আর আমি সহাধ্যায়িনী। বারবার জায়গা বদলানোয় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে একটু বেশী বয়সই হয়ে গিয়েছিল আমার।

এই সময়ে ওঁদের নিজেদের বাড়ী শেষ হয়ে গিয়েছিল। উনি পরিজনদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। তবে যাওয়া-আসা চলত নিয়মিত। কিন্তু এবার সব জানাজানি হয়ে গেল আমার শ্বশুরবাড়ীতে। যেমন ভেবেছিলাম,—অনেক অভিশাপ আর অপমানের কথা শুনতে হল আমাদের, বিস্তর গঞ্জনা সহ্য করতে হল আমাকে। সে দুঃখজর্জর চোখের জলের অধ্যায়ের কথা সবিস্তারে বলার প্রয়োজন নেই। সবই আমি পাওনা বলে, একটা স্নেহপ্রীতির সংসারকে ঠকিয়ে তাদের ছেলেকে কেড়ে নেবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে অপ্রতিবাদে গ্রহণ করেছিলাম। তাঁরা ওঁকে ফিরিয়ে নেবার সবরকম চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত উনি অনমনীয় রইলেন আর ওঁরা হার মানলেন। সে সময়ে আমার স্বামীর সহানুভূতি আর উদারতা হৃদয়ের গহন কন্দরে কন্দরে এক নতুন আলোর দীপ্তি এনে দিয়েছিল। তাঁর চিত্তের বিশালতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। প্রথম প্রেমের অভিষেক হয়েছিল আমার নিভৃত অন্তরের অঙ্গনে—নব বসন্তের সু-সমারোহে।

এবার আমাকে লৌকিকভাবে ঘরের বৌ-এর স্বীকৃতি দিয়ে এ ষড়যন্ত্রের যাঁরা মূল অর্থাৎ আমার বাবা-মা, তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হল। আমি ব্যথা পেলাম, তবু এই প্রাণান্তকারী আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় বেশ কিছুটা খুশী হয়ে উঠলাম। তাছাড়া সবার চোখের সামনেই তো আমার পরম পুরুষের স্ত্রীত্বের মর্যাদা পেতে চলেছি এবার। দৃশা, সংস্কার আমাদের মধ্যে এমন করেই শিকড় গেড়ে বসেছে যে, জীবনের সব শুভ-লগ্নগুলিতে সমাজের সানন্দ অনুমোদন না পেলে আমরা এক পাও এগোতে পারি না।

গ্রীষ্মাবকাশের এক প্রবল বর্ষণ-মুখরিত সন্ধ্যায়,—কয়েকজন নিমন্ত্রিতের কোলাহল ও শঙ্খ-হুলুর আনন্দ-উৎসার, পুষ্পগন্ধের মাদকতা আর পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে আমাদের মিলন সিদ্ধ, বন্ধন সুদৃঢ় হল। দৃশা, মনে পড়েছে মা যখন আমাকে বধূবেশে সাজিয়ে দিচ্ছিলেন, নতুনত্বের ভাবনায় পুলকে কেঁপে কেঁদে কতবার আমি বলেছিলাম, —'আর কেউ না হোক্‌ দৃশা আর বিশাখা যদি জানত, তবে নিশ্চয়ই এসে দাঁড়াত আমার বিয়েতে।' কিন্তু অত

সৌহার্দ্য সত্ত্বেও তোদের বাড়ী আমি চিনতাম না, আর সব কিছুই যে বড় তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। সেই দ্বৈত পথযাত্রাব প্রাক্ সময়ে প্রিয় সখীদের শুভৈষণার পাথেয়ই তো আমার সবচেয়ে কামনার ধন ছিল। তাব থেকে আমি অনুপ্রেরণা পেতে পারতাম। নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে মা আমাকে তখন ভুলিযে দিতে চেয়েছিলেন।

আমি জানি এ বাড়ী থেকে আমার চলে যাওয়া মার মনঃপূত হয়নি। কিন্তু যথার্থ খুশী হয়েছিলেন বাবা। চোখের জল আর মুখের হাসিতে তিনি আমাদের বিদায় দিয়েছিলেন। ওঁর হাত ধরে অনুনয় জানিয়েছিলেন, 'দোষ গুণে তুমি আমার মণিকে একই চোখে দেখ বাবা। তোমরা এখন থেকে অভিন্ন— এমনই থেক চিরদিন।' আমার ভাই-বোনেদের মুখেও ছিল হাসি-কান্নার হীবে-মুক্তোর ছড়াছড়ি। দৃশা, অমন দুর্লভ দিন জীবনে বহু আসে না।

ওখানে আমাকে ববণ করতে কেউ হর্ষিত হননি। কিন্তু আমি তো সব জেনেশুনে আর মনঃস্থির করেই গিয়েছিলাম। আপন সত্তাকে একরকম বিসর্জন দিলাম, ছায়ার মত ফিরলাম সবার পিছনে, নিজের আরাম বিশ্রাম ভুললাম, ওদের সেবায় যত্নে বিলিয়ে দিলাম সবটুকু সামর্থ্য। আর শেষ পর্যন্ত আমার এই আয়াস আর অধ্যবসায়ের ফল ফলল। বীতরাগ আর অবহেলার উপলমুখর পথ পাব হলাম ক্ষতবিক্ষত হয়ে। গিয়ে পৌছলাম সুখসৌভাগ্যের চূড়ায। সোহাগিনী প্রিযবধূ হলাম। অপরিহার্য হয়ে গেলাম প্রতিজনের কাছে। আমাকে ছাড়া সে গৃহেব সব কিছুই এখন অচল।

দৃশা, মনে হয়েছিল মেযেদেব জীবনের পূর্ণতা বুঝি এখানেই। নিজের ভাগ্যকে জয় করে নিয়েছি সেই গৌরবের বন্যায, আমি তখন টলো মলো। কিন্তু একটা কথা আমি বিস্মরণ হয়ে ছিলাম। আমাব স্বামীকে অনেকটাই বঞ্চিত করতে হচ্ছিল আমার সঙ্গ থেকে। এর থেকে আর এক অবাঞ্ছিত তিক্ততার অভিঘাত এসে পড়ল আমার উপর। যার জন্য এতটুকুও প্রস্তুত ছিলাম না। সেই রাত্রে যখন নিজের কৃতিত্বের কথা সালঙ্কারে জাহির করে এ নিয়ে তাঁর মনের বিক্ষোভ দূর করতে চেয়েছিলুম, হঠাৎই তিনি বিছানায় উঠে বসলেন আর তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'থামো, থামো তোমার বাহাদুরী এতে কিছুই নেই। রোজগেরে বড় ছেলেটিকে পাছে হারাতে হয় সে ভয় তো আছে মনে। সেই স্বার্থেই·· ।' রাগের উত্তাপে বাক্‌রোধ হয়ে গেল তাঁর। শুযে পড়লেন উনি। দৃশা, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। এই অনিপ্সীত দিগ্‌ভ্রান্ত জীবনে সবুজ সত্যের সুন্দর সামীপ্য যদি কখনও নাই ঘটে, তবে মরুমায়ার নন্দন থেকে নির্মমের মত আমাকে বঞ্চিত করে কি সুখ হল! আমি না হয় নির্গুণ, কিন্তু আপনার জনের দোষ দেখাতে গিয়ে আমার চোখে নিজেকেই কি ক্ষুদ্র করে ফেললেন না উনি। অশ্রদ্ধায় চূর্ণ করে ফেললেন না নিজের উচ্চাসনটি! যে বিশাল বনস্পতির উপর লতিকার মত ভর দিয়ে উপরে উঠে আনন্দের আলো দেখব, ফলে ফুলে সৌন্দর্যে সুগন্ধে বিকশিত হব আশা করেছিলাম, ভিতরে ভিতরে সে যে এমন করে সন্দেহ অশান্তির কীটে ক্ষয়ে ভঙ্গুর হয়ে গেছে তা তো জানতাম না। আমি অত্যন্ত আশঙ্কিত হলাম।

আমার স্বামী করিৎকর্মা ছিলেন। বিশেষতঃ স্ত্রীর অনুসঙ্গী বাড়তি দায়িত্ব এসেছে এখন। তাই উপার্জন বাড়াতে সচেষ্ট হলেন তিনি। পূর্ব আফ্রিকায় একটা ভালোমত কাজের যোগাড় হল। পরিজনদের অমতেই আমাকে বাবার কাছে রেখে তিনি পরবাসে চলে গেলেন। সেখানে দেখেশুনে, সবকিছু ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবেন এসে। আমি বুঝলাম, স্বজন বন্ধু আর সমাজ থেকে দূরে পালিয়ে বাঁচতে চান তিনি। সবার বিরুদ্ধে এতকাল বিদ্রোহের পর এবার অবশ্যম্ভাবী অবসাদ এসেছে তাঁর মনে। জীর্ণ হয়েছে ধৈর্য, সহ্য আর যুদ্ধের পরাক্রম। নিজেকে সুস্থ ও স্বস্থ

করতে এখন সময় ও একাকীত্বের প্রতিষেধক একান্ত প্রয়োজন। আমি তাঁকে সে অবসর দিলাম।

সেই দূরদেশ থেকে আসা চিঠিগুলির কথা তুই শুনেছিস। প্রোষিত-ভর্তৃকা আমাকে তারা আশার বারতা জানাত। ভরা ভালবাসায় অভিষিঞ্চিত করত। আমি যেন বুঝতে পারছিলাম, তিনি ক্রমে আবার সেই আগের প্রেমময় মানুষটি হয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি চাইছিলেন, বারেবারেই কাছে ডাকছিলেন। 'তুমি এস, এস মণি, তোমাকে ছাড়া আমার সব বৃথা। শূন্য ঘর তুমি পূর্ণ কর, সার্থক কর, সম্পূর্ণ কর আমাকে। প্রস্তুত হয়ে থাক তুমি, এবার যাব তোমায় আনতে।' দৃশা, তাঁর সেই কাছে পাবার ঔৎসুক্য আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছিল সেখানে। আমি তখন মা হতে চলেছি। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী গৃহকোণ রচনার স্বপ্ন দেখছি।

কিন্তু এ বিষয়ে বিস্ময়কর রকমের অনিচ্ছুক ছিলেন মা। তাঁদের কাছে পত্রলেখাগুলিও একই ইচ্ছা আর অনুরোধ বহন করত। আর কঠিনভাবে মা প্রতিবারই আমাদের জানিয়ে দিতেন, 'তা হয় না, মণিকে অন্ততঃ বি-এ পাশটা করতেই হবে। আর ছেলেপুলে হোক্,— তারপর যা হয় দেখা যাবে।' আমি সঙ্কুচিত হয়ে যেতাম। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে আমাকে চুপ করেই থাকতে হত। তবু কেমন মনে হত, আমার দরুণ যে মোটা অঙ্কের টাকাটা পাওয়া যায়, সেটা হারাবার ভয়েই তিনি এমন করছেন। আর্থিক স্বার্থের জগৎ জোড়া দৃষ্টিকটু রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত হতাম। বলতে ভুলেছি, আমার বিয়ের পরপরই বাবাকে রিটায়ার করতে হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন। ছমাস পরে ছুটি নিয়ে, আরও কিছুকাল অপেক্ষা করবার জন্য আমার সবিশেষ মিনতি—যা আমি স্বেচ্ছায় করিনি—অগ্রাহ্য করেই এলেন। আর আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন। আমি তাঁর স্ত্রী—আইনত আমার উপর তাঁর দাবী আছে সেই কথাই বললেন স্পষ্ট ভাষায়। আর তাতেই ঘনিয়ে এল বিপত্তি। মা, বাবা, আমি আর উনি ছিলাম সেই ঘরে। মার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে উত্যক্ত হয়ে উনি সংযম হারালেন। নীচু মাথায় চুপটি করে বসে কাঁপছিলাম আমি লাজে ভয়ে। আইনের কথা শুনেই অগ্ন্যুৎপাত হল মার মুখেচোখে। উৎকট রকম অশালীনভাবে তিনি বলে উঠলেন, 'ওকে ছাড়া আর চলছে না তোমার কোনোমতেই, তাই নিয়ে যেতে চাও, কেমন কি না?' কানের ভেতরটা পুড়ে গেল উত্তপ্ত বাক্যস্রোতে। নিমেষের বিহ্বলতার পর কোনমতে চেয়ে দেখি ঐ অতবড় লোকটা কেমন বিস্রস্ত হয়ে নুয়ে পড়েছে। আর তারপরেই শুরু হল দুহাত মুখে ঢেকে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কান্না, 'আপনি আমাকে এমন করে বললেন, আপনি—!' চোখের জলে ভেসে যেতে যেতেও দেখলাম বাবা অস্থির হয়ে আমাদের মুখে চাইছেন। কি যেন শুনতে চাইছেন আমার কাছে। কিন্তু বুঝতে পারলেও কিছুই বলতে পারলাম না আমি। সব বিরূপতা আর প্রতিবন্ধককে অস্বীকার করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে যে অবকাশের প্রয়োজন তা আমাকে আক্ষরিক বা বিশেষ কোনও অর্থেই দেওয়া হয়নি। তাছাড়া একমাত্র নির্ভরস্থলই যে আজ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আমার সমক্ষে—নীচতম বিরুদ্ধতাও না সইতে পেরে। কি করতে পারি আমি এক্ষেত্রে আমার অসমর্থ দেহমন নিয়ে!

তারপরের কথা,—সবই তো নিরর্থক হয়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল অবশেষ জীবনের আদিগন্ত বিস্তার করে। উনি ক্রুদ্ধ, অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন নিজের বাড়ীতে আমাকে একলা ফেলে। তারপর কোর্টের মাধ্যমে ত্যাগ করতে চাইলেন মিথ্যা কলঙ্কের অজুহাতে। আমার বুক জুড়ে আসা সেই ছোট্ট একরত্তি ছেলেকেও তিনি স্বীকৃতি দিলেন না, দৃশা। সদ্যলব্ধ

মাতৃত্বের সুখ-স্বর্গ থেকে আমাকে একটানে নামিয়ে দেওয়া হল অপবাদের নারকীয় অতলান্ততায়। কিন্তু পৃথিবীর জীব আমরা। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনই আমাদের স্বভাব-ধর্ম। তাই এই হঠাৎ দুর্বিপাকের মাঝে পড়ে প্রাণেমনে যথেষ্ট সবল হয়ে উঠলাম। যে বিয়েতে ফুল ফুটল না, ভুলের হুলই ফুটিয়ে গেল শুধু—তার গ্রন্থি উন্মোচন করতে স্থিরসঙ্কল্প হলাম। নিজের মধ্যে জোর পেয়েছি—পায়ের তলার মাটি থাক্ আর যাক—মা ছেলেতে যুঝেই চলব ভাগ্যের বিরোধী-ধারার সঙ্গে যতক্ষণ পারি—এমনই কিছু একটা ভেবেছিলাম সেদিন।

সব থেকে অবাক-কথা যে আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাঁদের বৌ আর বংশধরকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার তৎকালীন স্বামী আর আমিও এতে অ-রাজী ছিলাম। দৃশা, আমাদের দেশের অগ্নি, ব্রাহ্মণ আর নারায়ণ শিলার সাক্ষাতে হওয়া বিয়েও আজ চিরস্থায়ী নয়। 'জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন' বলে কথাটা একেবারেই অলীক হয়ে গেছে। আদালতে ওদের চোখ আমি বাষ্পাচ্ছন্ন দেখেছিলাম। পিতৃতুল্য শ্বশুরমশাই এক বিরলে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ক্রন্দনকাতর সেই বৃদ্ধ মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'মা, ছেলেটা এবার সত্যিই লক্ষ্মীছাড়া হল। ওকে আর অভিসম্পাত দেবই বা কি। তুমিও তো পুত্রবতী হয়েছ, মা-বাপের উপায়হীন যন্ত্রণা আশাকরি বুঝবে।' বেদনার পাষাণভার আমার অশ্রুর উৎস নিরুদ্ধ করেছিল। নিষ্পলকে আমি সব শুনলাম, বুঝলাম, তারপর তাঁর পায়ের ধুলোর স্পর্শ নিয়ে নির্বাক্যে সরে গেলাম।

দৃশা, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবার আগের সেই অন্তর্বর্তীকালীন বিচ্ছিন্ন অবস্থা চলতে লাগল। কুমারী জীবনে তোরা আমাকে চিনতিস। সামাজিকভাবে বিয়ে হবার পর যখন আরক্ত সীমন্তে কলেজ গেলাম, তখন বিস্মিত হয়েছিস, এতদিনের লুকান খবর শুনে কৌতুকবোধ করেছিস, আবার আমার বধূ জীবনের সুখী দিনগুলোর কথায় যথার্থ খুশী হয়ে উঠেছিস। তুই আর বিশাখা, তোদের কাছে আমি বিরহের দিনেও সমানুভবের সাড়া পেয়েছি। আর মা না স্বামী—কার উপরোধ আমি মানব সেই অকূল চিন্তায় যখন বিড়ম্বিত হচ্ছিলাম তখন তোকেই আমি চুপিচুপি সব কথা বলে পরামর্শ চেয়েছি। আমার দুঃখে প্রথমে স্তম্ভিত পরে বিচলিতনয়ন হলেও তোর পরিশীলিত বুদ্ধি আমাকে লোক ও মন্ত্রসিদ্ধ জীবনসাথীর সতত অনুগমন করতেই স্থির নির্দেশনা দিয়েছিল। কিন্তু ভ্রম তো মানুষেরই হয়। তাই পথভ্রষ্ট হলাম আমি। আর এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে চললাম, যেখানে নারী হয়েও অবিবাহিতা নয় বিবাহিতা এমনকি বিধবাও নয়, পতি পরিত্যক্তা সমাজ-সমস্যারূপেই শুধু আমার পরিচয়।

দৃশা, এতটা তোদের জানা ছিল না। ক্যাজুয়াল স্টুডেন্ট বলে ক্লাসে আমার উপস্থিতি অনিয়মিত ছিল। কিন্তু টেস্টেও যখন আমি বসতে গেলাম না তখন তোরা সন্দিগ্ধ হলি। আর খুঁজে খুঁজে হানা দিলি এখানে। এক কালের ধনী লোকের কয়মহলা বাড়ী এখন পাকা বস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। নানান জাতের স্বল্পায়ী লোকের পঞ্চাশ ভাড়াটের মেলা বসেছে ঘরে ঘরে। দুর্গন্ধ, নোংরামী আর চির আঁধারের ঘন বসতি সর্বত্র। তারই মাঝে তুই আর বিশাখা এসে দাঁড়ালি বেশ বাস আর রুচিতে পরিমার্জনার ছাপ নিয়ে। অনেকজন কৌতূহলী উঁকিঝুঁকি মারল, এসে জমলও চারপাশে। বাইরের উদার খানিকটা আলো-হাওয়ার ঝলকানি যেন সর্বাঙ্গে মেখে এসেছিলি তোরা। প্রতিদিনের প্রাণ-ধারণের চেষ্টায় অভিহত ওই অধিবাসীরা যেন তারই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া কিছু রেশ থেকে উজ্জীবনের অবলেপ খুঁজে ফিরছিল। আমার মুখের শুকিয়ে যাওয়া হাসিও আবার ফুটে উঠেছিল তোদের নামে। খোকাকে কোলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম দরজার গোড়ায় অভ্যর্থনা করে নিতে—সেই ভুলে-যাওয়া মেয়েটির

মতই। কিন্তু এই আবেষ্টন তোদের বিব্রত করেছিল, আমার শুভ্র সিঁথি তোদের বিমূঢ় করেছিল। আর সব চাঞ্চল্য হারিয়ে আমি তখনই ফিরে গিয়েছিলাম বিষণ্ণতার বিধৃতিতে।

মার মুখে সংক্ষেপে সব শুনলি। বেশ বুঝলাম, আমার এই ত্যক্ত অবস্থার চাইতে বৈধব্যের রিক্ততাই অধিক সহনীয় হতে পারত তোদের শ্রুতিতে। দুঃখের অনুভব জাগাতে পারত আপন মহিমায়। কিন্তু এখন শুধু কিছু ভর্ৎসনা আর কিছু করুণার দক্ষিণা ছাড়া অপর কিছুই তো পেতে পারি না—সে অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি চিরদিনের মত আপন নির্বুদ্ধিতায় পূর্বাপর জ্ঞানহীনতার দোষে। বিনা মন্তব্যে শুধু নয়নভঙ্গিতে যা বলবার বলে তোরা পথে পা বাড়ালি। কত সন্তর্পণে বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে পেরিয়ে গেলি দরমাঘেরা বারান্দা, ভাঙ্গা কাঠের সিঁড়ি নানাজনের কলরব-মুখরিত পিচ্ছিল কলতলা, তারপর আবর্জনার স্তূপে ভরা গলিপথ থেকে একছুটে পাশের রাস্তায়। বাড়ী আমাদের রাজপথের উপর, তবু পিছনের ঘুরপথেই সেখানে পৌঁছান যায়। দৃশা, হতবুদ্ধি হয়ে প্রথমে দু-তলা থেকে, তারপর সিঁড়ির নীচের ঘুলঘুলি দিয়ে আমি তোদের পালিয়ে যাওয়া দেখছিলাম। পথে দাঁড়িয়ে তোরা বুক ভরে শ্বাস নিলি, রৌদ্রোজ্জ্বল মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে দেখলি তারপর তপ্ত যাতনায় পরস্পরে বলাবলি করেছিলি—অনুচ্চকণ্ঠে হলেও তার ছিন্ন অংশ আমার কানে গিয়েছিল—'বুকচাপা অন্ধকার আর অস্বাভাবিকতায় ভরা এক জীবন্ত নরক যেন। এই দারুণ আবেষ্টনের প্রতিক্রিয়াতেই অমন সুকুমারমতি প্রাণবন্ত মেয়েটা তিল-তিল করে নিঃশেষ হয়ে গেল। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য-মাধুর্য্যের সংশ্রব ছাড়া হয়ে কেমন করে বাঁচবে ও। কোন সর্বনাশা পরিশেষ আছে ওর কপালে কে জানে।...আর ঐ মা'টিকে ভদ্রমহিলা বলে মনে হল না একটুও। যেমন কুৎসিত দেখতে, তেমনই ধরণধারণ কথাবার্তা।' ঘৃণাবিকৃত মুখে তোরা শিউরে উঠলি। তারপর চলে গেলি দেখার আড়ালে। ক্লান্ত পায়ে আমি ফিরে এলাম।

মা খনখন করে উঠলেন, 'আহা, মরে যাই, আদরিণী ধনীর দুলালী সব। দেমাক-ঠমক কত। গরীব ঘরে শ্রীচরণ ফেলতে যেন কতই মান্যহানি—কি তাচ্ছিল্যের ভাব। কোনও রকমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দায় সেরে গেল। একটা ভাল কথাও শোনাল না কেউ এই দুঃসময়ে। ওরাই তোমার বন্ধু—আর ওদের কথাতেই তুমি পঞ্চমুখে উথলে ওঠ।' বহিরাগতদের দেখে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠা আমার ভাইবোনেরা তটস্থভাবে সেখান থেকে সরে পড়ল, বাবা আবার নির্লিপ্ত দৃষ্টি ফেরালেন দূরের দিকে। নিরুত্তরে আমি ভিতরে ঢুকলাম। দৃশা, তোদের হিতৈষিণী বান্ধবী বলে নিশ্চিত জেনেছি। তাইতো শুনে-ফেলা কথাগুলো সেদিন চিন্তায় অমন ভয়ঙ্কর ঝড় তুলেছিল।

ডিভোর্স হয়ে গেল। দৈনিক পত্রের কোর্ট-নিউজ কলমে এক দুঃসংবাদ হয়ে গেলাম আমি। হয়তো তোরা তা দেখেছিলি—বিষাদবিদ্বিষ্ট হয়েছিলি আর বাসি খবরের সঙ্গে আমাকেও ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে ফেলার সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে গিয়েছিলি, দৃশা। সত্যিই বড় অভাগ্যবতী আমি। কিন্তু আরও অনন্ত দুঃখ ছিল তখনও আমার ললাটলিপিতে।

ছোটরা মনমরা,—মুখে হাসি নেই, প্রয়োজন ভিন্ন কথা নেই। এই বছরখানেকে কত যে বিচক্ষণ হয়ে গেছে ওরা। কোন্ অদৃশ্যবোধে দিদির হতবিধির জন্য তারা নিজেদেরই অপরাধী ভেবেছে। বর্মের মত ঘরে-বাইরের যত বীতরাগ আর কটূক্তির আক্রমণ আপনাদের উপর নিয়ে, আমাকে রক্ষা করতে চেয়েছে অনুক্ষণ। ভাগাভাগি করে দুর্ভোগে ভুগেছে একসঙ্গে। দাহ-আতপ্ত দিনগুলিতে ওদের অবিরল প্রীতির নিষেকেই তো কোনও মতে অর্ধ মৃত হয়ে ধরণীর ধূলিতে টিকে থাকতে পেরেছিলাম।

আর আমার সেই অপার মমতাময় দেবোপম বাবা। তিনি যে তাঁর নয়ন মণির উপর

এতদুর রূঢ়, বিমুখ হতে পারেন—তা কি কখনও কৌতুকচ্ছলেও মনে এনেছি। আমার অবিমৃষ্যকারিতা তাঁকে নির্দয় রকম ক্ষমাহীন করেছিল। উপস্থিতি মাত্র সইতে পারতেন না।

তবু শতধা হয়ে যেতে যেতেও আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করেছি বুঝতে তো আমার বাকী ছিল না। প্রাণাধিকা কন্যার সংসারাচরণের বিষম অসাফল্যই তাঁর অনুপায় আবেগকে মথিত করে এমন বিপরীতরূপে প্রকাশ পেয়েছে। নিত্য-রোগে তিনি ভুগছিলেন। বার্ধক্য নয়, আমিই তাকে এত অচিরে মৃত্যুর দেহলীতে এনে দিয়েছিলাম। শত গঞ্জনা-নিষেধ সত্ত্বেও দৈনন্দিন শুশ্রূষা থেকে তিনি আমাকে বিরত করতে পারেননি। ব্রতচারিণীর নিষ্ঠা আর নিবিষ্টতায় আমি সেবা করতাম। সব দুর্বহতার মাঝে সেইটুকু ছিল আমার তৃপ্তি। তিলে তিলে পাপ-স্খালন হত যেন।

বহুদিনের অভ্যাসে সুপটু গৃহিণী আর মাতৃত্বের যে সহজাত আস্তরণটা পড়েছিল, উত্তরোত্তর অভাবের তাড়নায় সেটা ক্রমেই খসে পড়ছিল, আর ভিতর থেকে রণ-চর্চা কদর্যতায় ভরা মার স্বরূপটা অতি দ্রুত প্রকট হচ্ছিল। অক্ষম স্বামী, বেকার তিন ছেলেমেয়ে আর অপোগণ্ড দুধের শিশুর উদ্দেশ্যে নিরন্তর যে বাক্যবাণ তিনি বর্ষণ করতেন, ভাষায় তা ব্যক্ত করবার নয়। অবিশ্বাস্য মনে হত যে তাঁরই প্রীতিময় এক প্রতারণার নির্বন্ধে ভুলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি আমি। প্রতিদিন ভাতের থালায় বসে নির্বাধ অশ্রুতে লবণাক্ত গ্রাস মুখে তুলতে নিজেকে এক অনুগ্রহের ভিখারীর মত মনে হত। আমার নিঃসহায় কাতরতা তাঁকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলত। সঞ্চয়ের শেষ কণাটুকু এমন কি সবার গায়ের সোনাদানাগুলিও একে একে চলে যাচ্ছিল। সামান্য পেনসন-এর টাকায় কি-ই বা হয়। শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া গহনাগুলি তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম-যে মুর্খামির জন্য রাত্রিদিন লাঞ্ছিত হতাম। সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সব সয়েছি। কর্মের চাকায় অবিরত নিজেকে জুড়ে রেখেছি মূক পশুর অসহায়তায়। আয় বাড়াতে পারি নি—তাই ব্যয়সঙ্কোচ করেছি শ্রম দিয়ে। দাসদাসীর বিলাসিতা তো আমাদের জন্য নয়। ইকনমিক্স-এর মতে এও তো এক রকমের অর্জন—নয়রে দৃশা? তাই ভেবেই মনকে প্রবোধ দিয়েছি।

কিছু দিন ধরেই যেটা সন্দেহ হচ্ছিল মা-বাবার এক প্রবল ঝগড়ার মধ্য দিয়ে সেটা ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে দেখা দিল। যৌবনের মোহে একদা-সুরূপা আমার মাকে দেখে বাবা ভুলেছিলেন, পাঁক থেকে তুলে তাঁকে অন্তঃপুরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমাজ-সংসারের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে বাইরে কাজ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যথা-যথভাবে বিয়েটা আর ঘটে ওঠেনি। নতুনত্বের মায়া, তাঁর প্রগাঢ় সম্প্রীতি আর একে একে আসা ছেলে মেয়েদের কচি হাতের টানে মা মোটামুটি জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবু আশৈশব যিনি প্রচুর ভোগের দীক্ষা পেয়েছেন, দিবসে নিশীথে তারই জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছেন, মনের মানুষকে নিয়ে বাঁধা বিভব-সমারোহহীন নীড়ের পরিমিতি তাঁকে চিরকালের তৃপ্তি দিতে পারেনি। নিঃশেষে আত্মদান করায় আর আরেকজনের অকুণ্ঠ সমর্পণ পাওয়ায় যে গরিমা, অপার সন্তোষের উপলব্ধি—স্বধর্মেই তিনি তা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা আর দায়িত্ব-জ্ঞানের পাশবদ্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধ নাগিনীর মত বিষ-নিঃশ্বাসে জর্জরিত করেছিলেন আবহাওয়া। ঘরের লোকের অপদার্থতা সম্বন্ধে অসংশয় হয়ে যখন-তখন তাঁকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। সহনশীলতার মাত্রা যখন অতিক্রান্ত হল, আমার শান্তিপ্রিয় বাবা তখন কর্মফল ভোগ ভেবে আপনাতে গুটিয়ে গেলেন। আর মা উপায়ান্তরহীনভাবে ওদিক থেকে নিবৃত্ত হয়ে প্রবল বিক্রমে তাঁর গৃহাঙ্গনের পরিধিতে ক্রমান্বয়ে আধিপত্য বিস্তার করে চললেন। মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের স্বাদ আমিই তাঁদের প্রথম দিয়েছিলাম। তাই দুজনের কেউই

আমার উপর থেকে একচ্ছত্র দাবী সরিয়ে নিতে চাইতেন না। এতদিনে সব রহস্য উদ্ঘাটিত হল। এজন্যই আপনজনরা আমাদের প্রতি উদাসীন। খবরাখবরও নেই কোন পক্ষে। দৃশা, কলুষলিপ্ত এমন অগৌরবের পূর্বকথা শোনার পরও শিক্ষা, সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্তা আমি বেঁচে থাকতে পেরেছিলাম!

কিছুদিন পরেই বাবা চলে গেলেন। মুক্তি পেলেন সব বিড়ম্বনা থেকে। মৃত্যুকালে তিনি ফটফট করে কাকে খুঁজছিলেন। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলের রস করা রেখে ছুটে তাঁর মুখে ঝুঁকে পড়লাম উৎকণ্ঠ হয়ে। কোলের খোকাকে বুকের পাশে শুইয়ে দিলাম। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে পক্ষ্ম নিমীলিত হল। তারপরই সব শেষ। এতকাল পরে আকুল কান্নায় আমি মুখর হলাম।

শোকপর্ব বিলম্বিত হবার ছিল না। এই বিশাল অথচ অনুদার ধরিত্রীর এক কোণায় আমরা কয়টি প্রাণী অদ্বিতীয় শুভার্থীকে হঠাৎ হারিয়ে অথই পাথার দেখলাম চারিদিকে। কিন্তু এ ঘোর সঙ্কটে শীঘ্রই আমাকে স্থিতধী হতে হল। ভাইবোনদের মনোবল ফেরাতে সচেষ্ট হলাম। ভালমন্দ যাই হোক, বাবার বিচ্ছেদে মা কাতর হননি। অর্থাগম একেবারে বন্ধ। কিন্তু জীবিকার তাড়না আছে। খাওয়া, পরা, থাকার নিম্নতম মান রক্ষা করতেও বুঝি আর পারি না। ষ্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স-এর প্রান্তরে কত নগণ্য আমরা! দারিদ্র্য দিনে দিনে ঘনীভূত হল। কর্মসংস্থানের জন্য ঘরের মেয়ে পথে বার হলাম। নিঃস্বার্থ সাহায্যের হাত এগিয়ে এল না কোথাও থেকে। রূপ ছিল না, কিন্তু লালিত্য ছিল। সর্বোপরি আমি তো একটি মেয়েই। ক্রূর অভিসন্ধির চাহনী আর শ্বাপদ প্রবৃত্তির থাবা উঁচিয়ে আছে সর্বত্র। পালিয়ে এসেছি ভয়ে। কিন্তু এততেও সম্মান বিসর্জন দিতে পারিনি। এ দেশের সনাতন নারীত্বের আদর্শ ও পবিত্রতাবোধ আমার মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল। পিতৃ-রক্তের মহিমা আমাকে পদস্খালন থেকে ত্রাণ করেছিল। মার প্রতিনিয়ত কুপথের প্রলোভন, বিনতি, অযুত অত্যাচারেও ভ্রষ্ট হইনি। বসন্তবিক্ষত কুশ্রী-দর্শনা ঐ জন্মদাত্রীকে দেখামাত্র আমি এখন কন্টকিত হয়ে যেতাম। কলি আর কমলের পড়া বন্ধ হয়েছে। মা তাদেরও পাপবুদ্ধি দেন, 'সৎ-অসৎ ভুলে দুটো টাকা আনবার উপার কর।' উত্তরকালের পটভূমিকায় নিরাশার কালো ছাড়া আর কিছুই দেখি না। দৃশা, এমন তো ভাবিনি কোনদিন!

বংশের মুখোজ্জ্বল করা রত্ন আমি নই। পুরাণের সেই অঞ্জনার মতই সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আমাকে কলঙ্কের অভিধা নিতে হল। স্বামীর হৃদয়বত্তা আমার খণ্ডিত মানসকে সপ্রেম ক্ষমায় উপেক্ষা করে দাম্পত্যের পূর্ণতায় পরিকীর্ণ করল না। অনায়াস অবহেলায় তিনি আমাকে ত্যাগ করলেন। কিন্তু সবই কি আমার অপরাধ? সবাকার প্রীতির অর্থী ছিলাম—তবে সকলের অসূয়ার ভাগী হলাম কেন? কাঙ্গালিনীর ধন ওই ছেলেটাকেও বিনাদোষে হারাতে হল! কদিন থেকেই ও জ্বরে ভুগছিল। ওঁর একমাত্র নিদর্শন সেটিং-এর আংটিটা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারিনি। সেটাকেই বিক্রী করে ডাক্তার ডেকেছিলাম। ওষুধ নিয়ে ফিরে দেখলাম সে অভিমান করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কালনিদ্রা আর ভাঙ্গল না। আমাকে হস্তগত করবার প্রতিবন্ধক ভেবেছিলেন ওকে মা। তাই কি তাকে অকালে চলে যেতে হল? এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

আর নয়। আমি আর পারছিনা। তার শিশুকণ্ঠের আধো আধো মা ডাক আকাশে বাতাসে কেঁদে কেঁদে আমাকে খুঁজে ফিরছে। মায়ের প্রাণ তো সবারই এক নয়। দু-একটা অচেনা মুখ সুহৃৎ-এর ছদ্মবেশে মার আশেপাশে আজকাল ঘুরছে। ওদের গূঢ় অভিপ্রায় আমার অজানা নয়।

রাত্রির মুখোমুখি

শ্রীলেখা বসু

সে কালো, বেঁটে আর মোটা। বয়সও তার চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। মধ্যবিত্ত ঘরের খুব সাধারণ মেয়ে, তবু বিয়ের মতো একটা সাধারণ ঘটনা তার জীবনে ঘটেনি। ডিগ্রী সর্বস্ব শিক্ষা নিয়ে সে কাছেপিঠে একটা স্কুলে পড়াতে যায়। কিন্তু তার অন্তর্লোকে যে এখনো রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে আসে সে কথা কি কেউ জানে?

বর্ষণক্ষান্ত শ্রাবণের ভ্যাপসা গরম। অর্ধেক সময় পাখাগুলো কাজ করে না। টীচার্সরুমে বসে অচল পাখার দিকে চেয়ে গবেষণা করছিল যে লোডশেডিং চলছে, না যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ পাখাটা বিকল। এমন সময় প্রিন্সিপাল ডেকে পাঠিয়ে বললেন, মলিনা মুখার্জী আসেননি, আপনি ক্লাস টেনে আজ ওর ক্লাসটা নেবেন।

ক্লাস টেন, আর ইংরেজির ক্লাস। তার জিভ শুকিয়ে গেল। সে ইংরেজি ভালো করে বলতে পারে না, উচ্চারণ ভুল হয়, কথা আটকে যায়। এ কথা কি প্রিন্সিপাল বুঝতে পারেন না? নাকি বুঝেই এই ব্যবস্থা নেন? জ্যোতিদি দু'বছর হলো রিটায়ার করেছেন। তাঁর জায়গায় ইনি এসেছেন। বয়স তারই কাছাকাছি, কিন্তু আর কোনো বিষয়েই সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ইনি ধনী-গৃহিনী সুশিক্ষিতা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। স্কুলের যাবতীয় ব্যাপার তাঁর নখদর্পণে। তাই বলে কে এক প্রতিমা সরকার ইংরেজি পড়াতে হবে শুনলে ঘেমে ওঠে এমন অবান্তর কথা তিনি জানতে চান না। তাকে দেখে কোনোদিন কারো অহেতুক মমতার উদ্রেক হয় না।

সে জিজ্ঞেস করে, ইংরেজির কি পড়াব?

—ওই তো টেকসট্, প্রিন্সিপাল অবহেলা ভরে একটা বই সামনে ঠেলে দেন।—যে কোন একটা লেসন করান। নয়তো কিছু গ্রামার বা কম্পোজিশন করান। মোটকথা ওই পীরিয়ডে ওদের অক্যুপায়েড রাখা চাই। অন্য ক্লাস ডিসটার্বড হলে চলবে না।

টীচার্সরুমে বসে সে ভেবে ভেবে তিনটি বিষয় ঠিক করে। প্রবন্ধ লেখাবো। পাঠ্যবইটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে। শক্ত নয়, কিন্তু পড়াবো কি করে? কোনো কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা মনে পড়ে যায়। ঠিকমতো প্রিপোজিশন যোগায় না, আর বড়ো বড়ো মেয়েদের চোখে কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

আসলে সে বড্ডো ভালোমানুষ। চাকুরীজীবি হবার কোনো যোগ্যতা নেই তার, কোনো সাধও ছিল না। এতোদিন ধরে একা চলাফেরা করেও তার বাইরের পৃথিবীটাকে বড়ো ভয় করে। চেনা রুটের বাইরে সে বাস করতে পারে না।

একপাঁজা খাতা সামলে গলদঘর্ম হয়ে বাড়ী পৌঁছলো। এসেই বুঝলো আবহাওয়া গরম। তাকে দেখে ভাইঝি নিনি রাগে অভিমানে কেঁদে ফেললো।

প্রতিমা ক্লান্ত হাতে তার মুখটা তোলবার চেষ্টা করলো। নিজের গায়ে যা ঘাম।

কি হয়েছে ? নিনিসোনার কি হয়েছে? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মধ্যে থেকে যতোটা উদ্ধার হলো তাতে বোঝা গেল নিনির বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থায় তার মা বাগড়া দিয়েছে।

প্রতিমা ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকালো। বৌদিকে তার বড় ভয়। ভাইঝিকে সান্ত্বনা

দেয় অস্ফুট স্বরে, বৌদির দিক টেনে কথা বলে।

না হয় নাই গেলি বন্ধুদের সঙ্গে, মা বলেছে যখন—

নিনি ফুঁসে উঠলো একেবারে, কেন বলবে? কেন বলবে শুনি? আমি কি বড়ো হইনি? আমার কি ইচ্ছে করে না?

রাগে লাল মুখ, বিস্রস্ত চুল, জলে আর আগুনে ভরা বিস্ফারিত চোখ, সপ্তদশী ভাইঝিকে বড়ো সুন্দর দেখলো প্রতিমা। যে আগুন তার মধ্যে কোনোদিন জ্বলেনি, সেই আগুনের ফুলকির দিকে সে একটা ভয়-মেশানো মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

নিনি তার মায়ের রূপ পেয়েছে, মায়ের প্রখরতাও। প্রতিমার সাদামাটা চেহারার দাদার জন্য তার বাবা মা সুন্দরী কন্যা এনেছিলেন। বর্তমানে বিত্ত নেই বটে কিন্তু বংশমর্যাদা নিয়ে সে মেয়ে বড়ো গর্বিত। তাহলেও তার বৌদি মানুষ ভালো। স্বামীর রূপের অভাব, ব্যক্তিত্বের অভাব নিয়ে যদিও সে চিরদিন অসুখী, তবু স্বামীকে, ননদকে সে নিজের ধরনে ভালোবাসে। প্রতিমাকে সে নিজের সংসারের অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মেনে নিয়েছে। ওই চেহারা দেখে তো সত্যি কেউ পাত্রী পছন্দ করতে পারে না, অতএব থাক ও এই সংসারে—ভালোভাবেই থাক। বৌদির ব্যবহারে আন্তরিকতার অভাব নেই। শুধু যদি মনোভাবটা একটু কোমল হয়ে প্রকাশ পেত— যাকগে ওটুকু না ধরলেই হয়। বৌদির বাপের বাড়িব অবস্থা পড়ে যাওয়ায় তাদের ভিটের দোলদুর্গোৎসব বন্ধ হয়ে গেছে, তার বদলে সমগ্র পরিবারটি গিয়ে জড়ো হয় শ্রীশ্রীআনন্দবাবার আশ্রমে। সেখানকার বারো মাসের তের পার্বণে আগেও বৌদি ননদকে টেনে নিয়ে গেছে, প্রতিমা উনচল্লিশে পা দেওয়ার পর তো মন্ত্র নেওয়ার জন্যে রীতিমত চাপ দিতে আরম্ভ করেছে। দুদন্ড গিয়ে বাবার চরণে মন দিলে তো পারো প্রতিমা, বৌদি একটু রাগতভাবেই বলে। এদিকে প্রতিমার এমনই অসাব মন যে আশ্রমে গিয়ে বয়স্থা মহিলাদের চুলোচুলি দেখতেই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। কিছুতেই সেসব দৃশ্য ও শব্দ অতিক্রম করে বাবার চরণে নিবদ্ধ হতে চায় না। আশ্রমে যাবার আগে বৌদির খরদৃষ্টির সামনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। ও-কি, ও-কি প্রতিমা? বেগুনী রঙের ছাপাশাড়ী পরার বয়স আছে নাকি তোমার? আমার ছোটো বোন তো তোমার চেয়েও ছয় মাসের ছোটো। সে তো কবে থেকেই শাদা ছাড়া আর কিছু পরে না। আর যেখানে যা করো, অন্তত আশ্রমে যাবার সময়টা একটু দেখে শুনে সাজবে তো। আর সাজবার আছেই বা কি?

প্রতিমা থতমত খেয়ে যায়। একে তো সে সাজতে জানে না। পাউডারের প্রলেপ গলে আসল রঙ বেরিয়ে পড়ে। মোটা এবং অমসৃণ ভুরু সরু ও বংকিম করার বিদ্যে তার জানা নেই। তার চেহারাটাই যেন প্রসাধনের পরিপন্থী। বৌদির বোন যখন বাবার চরণে প্রণত হয় তখন পিঠঢাকা আঁচলের ফাঁক দিয়ে কোমরের খাঁজটুকু দেখা যায়। শাড়ীর শাদা রঙে চামড়ার শুভ্রতা কিরকম যেন মহিমময় হয়ে ওঠে। প্রতিমার কোমরে শুধু কালো কালো মাংসের থাক। আবরণ তো নিশ্চয়ই দরকার, সে আবরণটা অন্তত একটু চোখটানার মতো হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু প্রতিমা কি এতো কথা বৌদিকে বুঝিয়ে বলতে পারে কখনো?

ভাইঝি নিনি অনেক সময় পিসীকে ছেলেমানুষী রঙীন কাপড় পরতে মনোবল জোগায়। এটা তুমি পরবে, বুঝেছো? বাবার সঙ্গে গিয়ে আমি তোমার জন্যে কিনে এনেছি। প্রতিমা কৃতার্থ হয়ে যায়। পিসী অত নরম আর ভালোমানুষ বলে নিনিই যেন অভিভাবক হয়ে তাকে আগলে রাখে। নিনি তার মতো ভীরু নয়। তীক্ষ্ণ মুখশ্রী আর সোজা চাউনিতে সতেরো বছর বয়সেই তার ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত। বৌদির বাপের বাড়ী এবং বৌদির শ্বশুরবাড়ীর মর্যাদা ধূলিসাৎ

করে সে নানাবিধ পোষাক পরে, সোজা হয়ে হাঁটে। সাহেবী স্কুলে, কলেজে মেয়েকে পড়াতে অবশ্য বৌদির আপত্তি হয়নি, কিন্তু তা বলে মেয়ে যে আশ্রমে যেতে নারাজ হবে এমন কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। এইতো তার বোনঝিও তো লরেটো কলেজের ছাত্রী, কিন্তু কী তার ভক্তি, কী গদগদ ভাব। আর নিনি এদিকে তার মাকে আশ্রমে যাবার অখণ্ড অবসর দিয়ে বাবাকে আর পিসীকে টেনে নিয়ে যায় কুরোসাওয়ার ফিল্মে। কাগজ হাঁটকে বলে, বুঝেছো পিসী বুধবার তোমাকে চাকভাঙা মধু দেখাতে নিয়ে যাব। প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে যায়। কিন্তু সত্যি বলতে কি সে বিশেষ বুঝতে পারে না। এসব সিনেমাও বটে, নাটকও বটে, কিন্তু কেমন যেন ঠিক দানা বাঁধে না। তার ভালো লাগে মিষ্টি প্রেমের মিলনান্তক গল্প। যতো সোচ্চার হয় ততই ভালো। হল থেকে বেরিয়ে এসে রোদ্দুরে চোখ পিট পিট করে। বাড়ীমুখো বাসে বসে পড়ন্ত বেলার কনেদেখা আলোয় নিজেকে কল্পনা করে সুখী হয়।

ভাইঝিকে চুলে বিলি কাটতে কাটতে সে জিজ্ঞেস করে, কি বই রে?

ফ্রেন্ডস্। ইরফান দেখাচ্ছে।

প্রতিমা দুর্বল গলায় বলে, তুই একলা ওর সঙ্গে—

আঃ—নিনি বিরক্তিভরে মাথা ঝাঁকায়। একলা নয়, নার্গিস, টিনা সবাই থাকছে। তারপর সোজা পিসীর দিকে চেয়ে বলে, একলাই বা যাবো না কেন? গেলে কি হয়?

কি হয়? তা কি প্রতিমা জানে? ছোটো থেকে শুনে এসেছে যেতে নেই। সেই নিষেধবাণী অন্ধকার নিভৃতে কোনো পুরুষের সান্নিধ্যের রোমাঞ্চকর কল্পনার সঙ্গে মিলে-মিশে একটা অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। সেই অনুভূতির প্রাবল্যে প্রতিমা একটু চুপ করে থাকে, তারপর দুর্বল গলায় বলে, না-ই গেলি, পরে না হয় আমাকে নিয়ে যাস।

তোমাকে নিয়ে? নিনির গলায় বিস্ময় ও বিরক্তি দুটোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—কী যে এক একটা কথা বলো পিসী—বন্ধুদের সঙ্গে যাওয়ার অন্য মজা।

প্রতিমার মুখটা বোধহয় একটু শুকিয়ে যায়। নিনি সেদিক তাকিয়ে অনুতপ্ত গলায় বলে, পরে একদিন তোমায় নিয়ে যাবো, এখন তো ওদের সঙ্গে দেখে আসি।

ঘর থেকে চলে যেতে যেতে দৃঢ় স্বরে নিনি বলে, কাল আমি যাবোই যাবো।

প্রতিমাও জানে যে ও যাবেই। বৌদির সাধ্য কি যে নিজের আত্মজার সঙ্গে পেরে ওঠে। আগে চেঁচামেচি রাগারাগি হতো, কিন্তু নিনির ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি প্রখর। সেদিন তো মেয়ের সঙ্গে একপ্রস্থ হয়ে যাবার পর বৌদি বলেই ফেললো, পিসীর মতো নরম স্বভাব যদি পেত। প্রতিমা শুনে তো অবাক। নিজের প্রশংসা শোনা তার অভ্যেস নেই। তারপর বিস্ময়টা যখন কাটলো তখন চোখ বুজে মনে মনে বললো, ভাগ্যিস! ভাগ্যিস তা পায়নি।

অথচ এই মেয়েই যখন ঘুমোয় তখন যেন পদ্মফুলটির মতো নরম হয়ে এলিয়ে থাকে। কখনো পাশ ফিরতে হয়তো চোখ খোলে, লাল লাল ঢলমলে চোখে তাকায় পরমুহূর্তেই ঘুমের মধ্যে আবার তলিয়ে যায়। যেন সত্যিকারের এক রাজকন্যা। শিয়রে সোনার কাঠি নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। খাতায় লাল নীল পেন্সিলের দাগ বসাতে ভুলে গিয়ে প্রতিমা চেয়ে থাকে। কন্যা কি সেই রাজপুত্রের স্বপ্নে বিভোর।

মানায়, ওকে সবই মানায়। ওর জন্যেই আকাশ নীল। ওর জন্যেই পৃথিবী রোদে জলে স্নিগ্ধ। কিন্তু প্রতিমাও যে এখনো স্বপ্ন দেখে তার থেকে হাস্যকর কথা আর কি আছে।

বাসে যেতে যেতে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, দু ধারের বাড়ীর খোপে খোপে সংসার। পুরুষ আর নারী—নারী আর পুরুষ—এবং তারপর সন্তান। সিনেমার বিজ্ঞাপনে নায়কের মুখ,

নায়িকার দেহ। আশ্রমে গিয়ে কি হবে, সদ্‌গ্রন্থ পড়েই বা কি হবে, প্রতিমার জগতে যে অনেক শরীর।

স্কুলে তরুণী ইরা বলে, প্রতিমাদি, একটু ফ্রীহ্যান্ড একসারসাইজ করো না কেন? দেখো অনেক ট্রিম থাকবে ফিগার। ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনগুলো লুকিয়ে পড়ে, আমি তিনটে সন্তানের জননী, আপনাদের ফর্মূলা অভ্যাস করে আশাতীত ফল পেয়েছি। ছবিগুলো তো বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়, তাছাড়া গ্যারান্টি। কিন্তু কোথায় আনায় সে। বাড়ীতে? স্কুলে? বাথরুমে লুকিয়ে ইরার দেখানো ব্যায়ামগুলো করে। অল্পসময়ের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে করতে গিয়ে হাঁপিয়ে যায়। কিন্তু তাছাড়া আর উপায় কি? চল্লিশ ছুঁই ছুঁই প্রতিমা সরকার শরীর চর্চা করছে—যে শরীর কারো মনোযোগ কাড়েনি, কোনো কাজেই আসেনি—এ কি জানাবার কথা?

শরীর নিয়ে লজ্জাই নাকি নারীর ভূষণ। কিন্তু কি দুস্তর ব্যবধান লজ্জায় আর গ্লানিতে। যৌবনোদগমে উমার লজ্জা, বয়ঃসন্ধিকালে রাধার লজ্জা, তা নিয়ে মধুর কাব্য রচিত হয়। তরুণী নায়িকা যেন যৌবন সম্পদে রাজরাজ্যেশ্বরী, পদপল্লবে তার পুরুষোত্তম প্রেমিক। উন্মোচনে তার যতো লজ্জা ততো অহংকার। কিন্তু অনাবরণে যার শুধুই গ্লানি, আচ্ছাদন তার আত্মরক্ষা, সে কি কখনো নায়িকার গৌরব জানতে পারে?

মলিনাদির ক্লাসে প্রবন্ধ লেখাতে গিয়ে সদ্যপরিণীতা ছাত্রীর দিকে চোখ পড়ে। নীচু মাথায় লিখছে বলে টুকটুকে সিঁথিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিমা বিকর্ষণ বোধ করে, কেমন যেন অশ্লীল লাগে তার, চোখ ফেরাতে পারে না। কচি মুখখানায় তো কোন অভিজ্ঞতাই লেখা নেই। এও কি সম্ভব যে জীবনের সব রহস্য এই কিশোরী জেনে গেছে? কি করে এ? কেমন করে সেই রহস্যের মোকাবিলা করে? প্রতিমার অজান্তেই তার চিন্তাগুলো অবচেতনের আদিম নগ্নতাকে টেনে আনে। যেন কোনো পুরুষের চোখ দিয়ে সে মেয়েটির সমস্ত গোপনতাকে উদঘাটিত করে ফেলতে সচেষ্ট হয়।

হোল তোমার?

মেয়েটি চমকে উঠে বলে, আর একটু বাকি আছে।

ও আর হবেও না, প্রতিমা স্বগতোক্তি করে। কখন যেন মেয়েটি তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনে কতো আকস্মিক ঘটনাও তো ঘটে। সিনেমায় গেলে পাশের আসনে কে বসবে তা কি বলা যায়? বাসে তার পাশেও তো মানুষ এসে বসে। ফুটপাথে ক্যালেন্ডারের ছবি, স্টলে নিষিদ্ধ বইয়ের মলাট, আর পাশে বসা মানুষের শরীরে জান্তব গন্ধ। প্রতিমা ব্রীড়াবনত হয়ে যায়, মুখ তুলে তাকাতে সংকোচ হয়। এমন নিবিড় চিন্তা তার মুখে প্রতিফলিত হবে না, এও কি সম্ভব?

বিয়েবাড়ী যাবার আগে বৌদি একপ্রস্থ গয়না আর শাড়ি এনে বিছানার ওপর রাখে। এই নাও তোমার জামাকাপড়, আর তোমার ভাইঝিকে বলো যেন দয়া করে বিয়েবাড়ীতে একটা শাড়ি পরে যায়।

তা নিনি শাড়ীই পরে। তবে মার বেনারসীর উপরোধ উপেক্ষা করে একটা জামরঙা শিফন পরে। দেহলগ্ন শাড়ীর রেখায় তার তন্বী দেহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিক্‌চিকে সজল চামড়ায় ও চলনের ছন্দে আপনা থেকেই আমন্ত্রণ ফুটে ওঠে। সে সুষমার দিকে—সে নির্লজ্জতার দিকে চেয়ে প্রতিমার কেমন যেন লজ্জা হয়। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বিয়েবাড়ী যেতে তার ভালো লাগে। উৎসব ব্যসনের সোচ্চার প্রকাশে সে মুগ্ধ হয়ে যায়।

শাড়ীগয়না মানুষজনের জমকালো সমাবেশের সামগ্রিক একটা প্রভাব পড়ে তার ওপর। সেই যে কিশোরী বয়সে মার সঙ্গে উৎসববাড়ীতে গিয়ে কোনো আকস্মিকের প্রতীক্ষায় থর থর করে ভেতরে ভেতরে কাঁপতো, এখনো স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে সেই রূপকথার রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সত্যি কি তার জীবনেও আকস্মিক কিছু ঘটে?

ভিড়ের চাপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলো। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ির দোতলার ল্যান্ডিং-এ বৌদিকে খুঁজে পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছুটা এগিয়ে গিয়েই প্রতিমার চলন কেমন এলোমেলো হয়ে আটকে গেলো। বৌদির পাশে তার বোন সুধা। আর সুধার একটু পেছনে, কিছুটা আড়ালে, রেলিং-এ ঠেস দিয়ে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

এইটা তো সেই শাড়ীটা, না দিদি? বাঃ প্রতিমাকে বেশ মানিয়েছে।

বৌদির হাসিভরা চোখ ননদের ওপর মমতায় কোমল হয়ে পড়লো। বৌদির ওপর ভালোবাসার কৃতজ্ঞতায় প্রতিমা যেন অভিভূত হয়ে গেল। সেই অনুভূতির তাড়নায় সে বৌদির নিকটতর সান্নিধ্য চাইল। তাকেও তবে মানায় কিছু। উজ্জ্বল আলোর নীচে বৌদিরা দুই বোন দাঁড়িয়ে আছে, যেন রাজেন্দ্রাণী। এই আলো তাকেও হয়তো সুন্দর করে তুলেছে। সুধা সেকথা বললোও তো। আর কার সামনে বললো—সুখে, লজ্জায় প্রতিমা মুখ তুলতে পারছিল না।

আমার ননদ, বৌদি তার পরিচয় দিল।

প্রতিমার মনে হলো আলো যেন বড়ো বেশী উজ্জ্বল। পাতলা পাঞ্জাবির আবরণ ভেদ করে পুরুষের কাঁধ আর বাহু দেখা যাচ্ছিল। নমস্কারের ভঙ্গীতে একত্র আনা হাত দুটো জোরালো, আবার একটু মাংসল হওয়ায় যেন বাসনায় ভরপুর। কি করতে হবে, কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে প্রতিমা কেমন অবশ বোধ করে।

সেই ঘোরের মধ্যেই প্রতিমা বিয়েবাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়। চেয়ে চেয়ে দেখে নতুন জোড়া খাটে যুগল শয্যা। এতো ভিড় এতো আলোর মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সাজিয়ে রাখা রয়েছে। বাসরঘরের ফুলের ঝালর। মেঝের পুরু নরম বিছানায় বর কনে পাশাপাশি বসে।

বিয়েবাড়ী থেকে ফিরে উঃ আঃ করে নিনি বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। তিন ঘণ্টা ধরে কী বোরিং ব্যাপার! একগাদা লোক আর তাদের কী সব বোকা বোকা প্রশ্ন!

প্রতিমা বললো, আয় তোর চুলটা বেঁধে দিই।

দেবে? বাঁচালে। নিনি মুহূর্তে মুখ ধুয়ে ঢিলে পোশাক পরে বিছানায় এসে বসলো। পিসীর হাতে চিরুনি ফিতে ধরিয়ে দিতে গিয়ে অবাক হয়ে বললো, কই তুমি শাড়ি বদলাওনি?

আগে তোর চুলটা বেঁধে দিই।

বালিশে মুখ গুঁজে আরাম করে শোবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিনি ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়লে সে একেবারে শিশুর মতো গাঢ় ঘুমোয়। তার অচেতনতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রতিমা এতোক্ষণে দরজা বন্ধ করে। বড়ো আলোটা নিভিয়ে দিয়ে টেবিলের ছোটো আলোটা জ্বালে। তারপর সেই আবছা অন্ধকারে বড়ো সন্তর্পণে সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ভয় করে। নিষিদ্ধ কিছু জেনে যাওয়ার আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে ফেলে। সে কি নিজেকে কখনো সম্পূর্ণ স্বরূপে অনুভব করে দেখেছে? কিন্তু দেখতে দেখতেই আতঙ্ক কেটে যায়। ধীরে ধীরে স্পর্শ করে, অলজ্জিতভাবে ভালোবেসে দেখতে ইচ্ছে করে। ঈষৎ মাংসল কোনো হাতের স্পর্শ যেন রোমাঞ্চ জাগায়। এই অনুভবে প্রতিমা আপ্লুত হয়ে যায়। অন্ধকারে আয়নার প্রতিবিম্ব আর কল্পনা যেন মিলে-মিশে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

টীচার্সরুমে অনেকগুলো মুখে কৌতুক ঝলসে ওঠে। ইরা বলে; সে কি মলিনাদি? এই বয়সে আবার?

রাখ্ রাখ্, প্রায়-প্রৌঢ়া মলিনাদি বিব্রত হাসিমুখে বলেন, বিয়ে তো হয়নি বাপু, হলে বুঝবি।

তরুণীরা হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। হাসিঠাট্টায়, মিষ্টি খাবার বায়নায় সারা ঘরটা জমজমাট হয়ে ওঠে।

প্রতিমার মুখে কিন্তু কথা সরে না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মলিনাদির রগের কাছে পাকা চুল। শিথিল শরীরে নাকি নানা ব্যাধি। মলিনাদি কখনো বলেন বাত, কখনো হাঁপানি। তবু এখনো এ শরীর বাসনা উদ্রেক করার ক্ষমতা রাখে ? প্রতিমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। পৃথিবীটা যেন নড়েচড়ে আকার বদল করছে। তার গোচরের বাইরে জীবনের যে বৃত্ত তার সম্বন্ধে সে এমন নিঃসাড় ছিল কি করে?

বৌদি বলল, আশ্রমে কাল উৎসব তুমিও চলো প্রতিমা।

না-না, সে প্রায় শিউরে উঠলো। তার শরীর মন অদ্ভুতভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আত্মীয়বাড়ীতে, পথে ঘাটে কোথাও তাকে রেহাই দেয় না। এইতেই তার আতঙ্কের অবধি নেই আর শেষে যদি আশ্রমে গিয়ে তার কল্পনা বিপথে দৌড়ায়। কী সর্বনাশ! না জানি কী সর্বনাশ হবে তাহলে?

বাড়ী এসে দেখে বৌদি নেই। অফিস ফেরত দাদাকে চা করে দিল। নিজেও এক কাপ নিয়ে সামনে এসে বসলো। সন্ধ্যের ঘনায়মান অন্ধকারে পারস্পরিক সঙ্গ একটা ঘনিষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুললো। ছোটখাটো খবরের আদান প্রদান, ছেলেবেলার কিছু কৌতুক, এমন আত্মীয়দের কথা যারা শুধু তাদের কাছেই প্রিয়—সব মিলিয়ে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। বৌদি আর নিনির অনুপস্থিতি তাদের মতো দুজন মুখচোরা মানুষের কাছে মাঝে মাঝে বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে।

মনে আছে তোর? রাজগীরের কথা? তখন তো তুই এক ফোঁটা মেয়ে।

ওমা মনে থাকবে না কি? তখন আমার বারো তেরো বছর বয়স তো নিশ্চয়ই।

তার জীবনের কুড়ি বাইশটা বছর স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে। স্কুলে যাওয়া, পাশ করা, কলেজে ঢোকা, দাদার বিয়ে— এমন অনেক ঘটনা বছরগুলোকে বেশ নির্দিষ্ট খোপে সাজিয়ে দিয়েছে। তার পরেই সবকিছু যেন ধূসর হতে আরম্ভ করেছে। মায়ের অসুখ, তার বিয়ে দেওয়ার জন্য মা-বাবার ব্যস্ততা, পাত্রী দেখা নিয়ে আশা নিরাশার টানাপোড়েন, এইসব মিলিয়ে আরো গোটা কতক বছর তবুও নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু তিরিশের পর, মা-বাবার মৃত্যুর পর, বছরগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। অনুভবে অভিজ্ঞতায় এই আট নটা বছর যেন বিবর্ণ জড়পিন্ড একটা। বয়স লুকোবার তাগিদে পঁয়ত্রিশকে তেত্রিশ বলে সে যেন সত্যি হিসেবটা ভুলে বসেছিল। তারপর এখন—

প্রতিমার দাদা বললো, আর এক কাপ চা দিবি রে?

দাদার আবদার শুনে প্রতিমা খুশি হলো। এই হঠাৎ পাওয়া অন্তরঙ্গতা তার বড়ো ভালো লাগছিল। কিন্তু অনেক ভালোবেসেও সে অস্বীকার করতে পারছিল না যে পুরুষ হিসেবে দাদা সত্যি বড়ো অকিঞ্চিৎকর। বিরল কেশ, থপ্‌থপে মোটা দাদার পাশে বৌদির দীর্ঘ উন্নত দেহটা কল্পনা করে বৌদির জন্যে অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছিল। এই? সারাজীবন শুধু এই? খুব অস্পষ্টভাবে ততোধিক অস্পষ্ট কিছুর বিরুদ্ধে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

চা নিয়ে এসে দেখে বৌদি এসেছে।

কখন ফিরলে বৌদি? তোমার জন্যে একটু চা আনি?

না—না, তুমি বোস প্রতিমা, দরকারী কথা আছে। বৌদিকে ভীষণ উত্তেজিত মনে হচ্ছে, উৎফুল্লও।

প্রতিমা মোড়াটা টেনে বসলো।

নিনির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। আজ ও'রা পাকা কথা দিলেন। সবই বাবার কৃপা—বৌদি উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো—বাবার সামনেই সব কথা হলো।

প্রতিমা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল? বৌদি নিজের আনন্দে আবেগে কতো কী যে অসংলগ্নভাবে বলে গেল তার অনেকটাই সে বুঝতে পারলো না। কলকাতার বাড়ী, বিলিতী ডিগ্রী, একমাত্র সন্তান হবার অসামান্য যোগ্যতা, মাইনের অঙ্ক ···সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বৌদি বললো, আর কী চেহারা। তুমি তো সেদিন দেখলে প্রতিমা—সম্পর্কে সুধার ভাগ্নে হয় সে।

বৌদির মুখ থেকে কথাটা নির্গত হবার আগেই প্রতিমার ষষ্ঠ চেতনা যেন তাকে অবহিত করে দিয়েছিল। সেই অহংকারী পুরুষের দৃষ্টি ঈষৎ মাংসল হাতের বাসনা কাকে কামনা করে তা কি সে অবচেতনে ইতিমধ্যেই জেনে ফেলে নি?

এখন তোমাকেই বাপু তোমার মেয়েকে রাজী করাতে হবে, আমার কথা তো কানে তুলবে না। এইই ঠিক বয়স বিয়ের, এখনই ওর যা মতিগতি। দেরি করলে কখন কি করে বসবে তার ঠিক কি? মেয়ের চিন্তায় বৌদির গলাটা যেটুকু কঠোর হয়ে ওঠে সেটুকু আবার প্রসন্নতায় এলিয়ে পড়ে, তাছাড়া এমন ছেলে কি হাতছাড়া করা যায়?

প্রতিমা দাদার দিকে তাকায়। সামনে রাখা চায়ের কাপে সর পড়েছে। দাদা মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে? কেমন যেন অপরাধীর মতো বসে আছে। কিন্তু দাদার কি অপরাধ?

ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললো প্রতিমা। আয়নার দিকে তাকালো।

একজন পৃথুলা মধ্যবয়স্কা মহিলাকে দেখলো সে। গোল মুখখানার চোখ দুটোতে সতৃষ্ণ দৃষ্টি। বিশ্ব সংসারের লোভনীয় সবকিছু যেন চেটেপুটে খাবে।

কিছুদিন ধরে বাড়ীর আবহাওয়া গরম হয়ে রইলো। নিনি হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল। তাকে বিয়েবাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে মার এমন গভীর একটা উদ্দেশ্য ছিল তা টের পেলে সে কি কোনোদিন, কোনোদিন সেখানে যেত? মা তাকে ভাবে কি? ওদিকে বৌদি পাল্টা প্রশ্ন করল, নিনি নিজেকে ভাবে কি? প্রশ্ন এবং প্রতিপ্রশ্নের এই অস্থির তোলপাড়ের মধ্যে দাদা একেবারে চুপ। আর প্রতিমা নিনিকে বোঝাতে গিয়ে, বৌদিকে সামলাতে গিয়ে নিজের সামান্য শক্তির এতোটা ব্যয় করে ফেললো যে হঠাৎ এক চরম ক্লান্তি এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। যা হবার হোক। সে আর পারে না। তাছাড়া শুধুই তো ক্লান্তি নয়,মনের গভীরে কেমনভাবে যেন সে নিশ্চিত পরিণতিটা জেনে গেল। এবং জানার পর একটা অদ্ভুত ধূর্ততা নিয়ে সে অপেক্ষা করে রইলো।

স্কুলে প্রিন্সিপাল ডেকে পাঠিয়ে বললেন, মলিনা মুখার্জি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। নানারকম কমপ্লিকেশন দেখা দিয়েছে। ওর সাড়ে দশটার ক্লাসটা—

প্রতিমা কথাটা শেষ করতে দিল না। অনায়াসে মিথ্যে বললো, আমি তো নিতে পারবো না। হিস্ট্রির কোর্স শেষ হয়নি, একটা স্পেশাল ক্লাস নিচ্ছি এই পিরিয়ডে।

প্রিন্সিপালকে চুপ করিয়ে দিতে পেরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। বরং অন্য ক্লাস বাড়তি নেব কিন্তু মলিনা মুখার্জির ক্লাস নেব না। শখ হয়েছে, নিজে ভুগুক, অন্যের সুবিধে করে দেবে কেন? ক্লাসে গন্ডগোল হবে, হোক। প্রিন্সিপালের কান অবধি আওয়াজ পৌছাক। চিরদিনের স্নেহশীলা মলিনাদির কমপ্লিকেশনের খবরে কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কারণে সে খুশি হয়ে উঠলো।

কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর অপ্রীতিভাজন হবার পথ প্রশস্ত করে দিতে সচেষ্ট হলো।

টীচার্সরুমে ইরা বললো, কি হলো প্রতিমাদি?

দেখ তো আহ্লাদ? বুড়োবয়সে ঝামেলা বাধিয়ে তিনি নার্সিং হোমে পড়ে থাকবেন আর আমরা ওর কোর্স শেষ করবো। আমরা যেন—বলতে বলতে ইরার ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসি দেখে প্রতিমা থেমে গেল।

ও, তোমরা তাহলে এই ভাবছো। আমার বিয়ে হয়নি, আমি মা হইনি, তাই তোমরা ভাবছো সৌভাগ্যবতীদের হিংসেয় আমি জ্বলেপুড়ে মরছি। ও হাসি আমি চিনি, ওই অনুকম্পভরা চাউনিও। সদ্য-বিবাহিতা ছাত্রীকে অমনোযোগের জন্যে বকতে গিয়ে তার ঠোঁটে ওই হাসি দেখেছি। নিনির বিয়ের ব্যাপারে বৌদি যখন বার বার বলে আমার মেয়ে, তখন তার চোখে ওই চাউনি দেখেছি। তোমরা জেনে বসে আছো যে আমার হিংসে হচ্ছে তাই আমাকে মনের ভাবটা লুকিয়ে শেয়ালের মতো ধূর্ত হতে হবে। কিন্তু আমাকে এমন অপমান করে তোমরা সবাই পার পেয়ে যাবে?

নতুন ফ্যাশানের চুলের ছাঁটটা ইরার মুখে যখন বেমানান হয় তখন ধূর্ত হয়ে ওঠা প্রতিমা বলে, বেশ দেখাচ্ছে ভাই তোমাকে।

গলদঘর্ম হয়ে বাড়ী ফেরে। নিনির ফুরফুরে চেহারাটা দেখেই ভেতরের জ্বালাটা হঠাৎ চিড়বিড় করে ওঠে। কটু গলায় বলে, ওটা কি ধরনের জামা নিনি? ওর চেয়ে কিছু না-পরলেই হয়!

নিনি চমকে তাকায়। পিসীর এমন গলা শোনা তার অভ্যেস নেই। তাকিয়ে দেখে পিসীর নাকের দুপাশের রেখা আরো গভীর দেখাচ্ছে, ঠোঁটের কোণ দুটো যেন নীচের দিকে বেঁকে গিয়ে মুখখানায় একটা অসুখী ভাব এনে দিয়েছে। পরনের কাফ্‌তানের ঢিলে গলাটা সামনে থেকে তুলে একটু পিঠের দিকে টেনে নিল নিনি। তারপর খুব নরম গলায় বললো, চা খাবে পিসী? না শরবৎ?

প্রতিমা ঠোঁট কামড়ে ধরে। কী যে হয়েছে তার, এই তুচ্ছ কথায় চোখে জল এসে যায়। হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব আবেগ এসে তাকে বিপর্যস্ত করে দেয়, প্রতিমা কোনো থই পায় না।

রাত্রে নিনি ডাকে, আমার খাটে এসে বোস না পিসী? একটা কথা বলবো।

কি রে?

শুক্রবার সন্ধ্যেয় আমাকে নিয়ে বেরুতে পারবে? আমার একটা নেমন্তন্ন আছে।

প্রতিমার ষষ্ঠ চেতনা আবার তাকে জানিয়ে দিল সবকিছু। চুপ করে সে নিনির বিছানায় বসে রইলো।

আমাকে নামিয়ে দিয়ে দু-এক ঘণ্টা তোমার স্কুলের সেই ভদ্রমহিলার বাড়ী কাটাতে পারবে না? তাহলে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো তোমার সঙ্গেই ফিরতুম। একটু হেসে নিনি বললো, কার সঙ্গে যাবো, কোথায় যাবো, জানতে চাওনা পিসী?

প্রতিমা আস্তে মাথা নাড়লো।

চাদরটা গায়ের ওপর টেনে নিয়ে নিনি কিছুটা আপনমনেই বললো, আমি এসব লুকোচুরি ভালোবাসিনা পিসী। কিন্তু—তোমাকে এর মধ্যে টানতে ইচ্ছে করছে না। অঞ্চলটা তো খারাপ না হলে বলতামও না। পিসীর হাতের ওপর নিজের পাতলা নরম হাতখানা রাখলো নিনি, তোমার কি ভয় করছে পিসী? তাহলে তুমি যেও না।

সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রতিমা কতকটা যেন কর্তব্যের খাতিরেই বোঝাবার শেষ চেষ্টা

করলো, তোর ভবিষ্যতের কথাটা ভাববি না তুই? টাকাকড়ি, এমন পরিবার, কতো সুখ, কেমন নিশ্চিন্তি —এসব ভাববি না তুই? আর অমন ছেলে?

অগাধ সরলতায় আর অসীম সততায় নিনি বললো, আমি যে একজনকে জানি পিসী।

দেখেছো, কেমন সূক্ষ্মভাবে আমাকে অপমান করে সকলে? অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো প্রতিমা। ভাগ্যিস অন্ধকার আছে। ভাগ্যিস নিজের সমস্তটুকু নিয়ে অন্ধকারে নিভৃত হওয়া যায়। প্রতিমার সমস্ত স্নায়ু টান টান হয়ে আছে। নিনি কোনো একটি তার জিগীষা চরিতার্থ করেছে, সেজন্যে সে কৃতজ্ঞ, উল্লসিত। কিন্তু নিনি বা কে? পৃথিবীর সব রসটুকু টেনে নিয়ে সে এমন ফুল্ল হয়ে থাকবে? অন্ধকারের গুহায় বসে নগ্ন প্রতিমা প্রতিহিংসার উত্তেজনায় জান্তব হয়ে উঠলো।

সিলভার ড্রাগনের সামনে পৌঁছে অপেক্ষমান একটা ফিয়াট দেখে নিনি নিশ্চিত হলো। ওই তো এসে গেছে পিসী, আগে তোমাকে তোমার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

না-রে, প্রতিমা খুব শান্ত গলায় বললো। আমি আর একজনের বাড়ি যাবো । তুই যা।

আর একজনের বাড়ি? ঠিক যেতে পারবে? রাস্তা চেনো?

বাসরুটটা জেনে নিয়েছি। আর শোন, প্রতিমা নিনির হাতে একটা চাবি দিল। ফেরার সময় ওর সঙ্গেই ফিরিস। পাশের দরজা দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে পড়তে পারবি না?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কেমন করে ফিরবে?

ফিরবো রে। ওরাই পৌঁছে দেবে।

কিন্তু যদি আমার ফিরতে দেরি হয়? তবে তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবে। শুনি না কোথায় তোমার বন্ধুর বাড়ি—আমি তোমায় তুলে নেব।

প্রতিমা নিনির পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, নিনি আমি যদি সারারাত বাড়ী নাও ফিরি তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই রে। কোনো চিন্তারও কারণ নেই। তুই ঠিকমতো ফিরতে পারলেই হলো।

পিসীর গলায় কি যেন একটা ছিল। নিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পিসীর দিকে তাকালো। বেগুনীরঙের ছাপা শাড়ী পরা প্রায়-প্রৌঢ়া পিসীকে কিরকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বোধহয় এই রেস্তোরাঁর লাল-নীল আলোর জন্যে। নিনির মনটা খচ্‌খচ্ করতে লাগলো, কিন্তু প্রিয়সান্নিধ্যের আগ্রহ তাকে আর দাঁড়াতে দিল না। মস্ত এক প্রজাপতির মতো সে উড়ে গিয়ে গাড়ীটার মধ্যে ঢুকলো। রঙীন আলোগুলো তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বপ্নলোকের রাজকন্যায় রূপান্তরিত করে দিল।

একটু অপেক্ষা করে প্রতিমা এগুলো। কিন্তু কোনো বাস ধরল না। একটা রিকশা থামিয়ে তাইতে উঠে বসলো। যেতে যেতে রাস্তার আলো আঁধারির মধ্যেই মুখে গলায় পাউডার মাখলো, ঠোঁটে টক্‌টকে লিপস্টিক লাগালো। তারপর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে রিকশা থেকে নেমে দাঁড়ালো।

নির্জন রাস্তা। আলোগুলো টিম-টিম করে জ্বলছে। ওদিকে একটা বাসস্টপ আর এদিকে একটু দূরে একটা পানের দোকান। রাস্তার ধারে অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। রিকশাওয়ালা পয়সা গুনে নিয়ে রিকশাটা ঘোরালো এবং তখনো তাকে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দিহান হয়ে তার আপাদমস্তক দেখলো। তারপর চলে গেল।

সে দাঁড়িয়ে রইলো। অল্প আলোয় শিথিল করে কাপড় পরা টকটকে লিপস্টিক মাখা তাকে প্রায় ভৌতিক লাগছিল। পানের দোকানের লোকটা দুবার ঘুরে ঘুরে দেখলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে লাগলো। সে দাঁড়িয়েই থাকলো। অপেক্ষা করা তার

অভ্যেস আছে। শবরীর ধৈর্য নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে পরে এক-একটা বাস এসে স্টপেজটায় দাঁড়াচ্ছিল। অল্প কটি মানুষ নেমে পড়ছিল। ফাঁকা পথে হেঁটে আসতে আসতে হঠাৎ তার মুখোমুখি হয়ে তারা চমকে উঠছিল। নেহাৎই গৃহস্থ সব—তাদের চোখে মুখে চলনেই ঘর সংসারের পৌনঃপুনিক আবর্তনের কথা লেখা আছে। অবাক হয়ে তাকে দেখে তারা পা চালিয়ে চলে যাচ্ছিলো। পানের দোকানটায় পৌঁছে দড়িটার মুখের আগুনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তারা অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। তবে কি এ রাস্তা সে অঞ্চল নয়? নাকি সে আর কামিনী পর্যায়ভুক্ত নয়?

তার মনটা কেমন শূন্য হয়ে আছে। বর্তমান বা ভবিষ্যতের পরিস্থিতি ভেবে কোনো উত্তেজনাই সে বোধ করছে না। তার যে কোমল সত্তাটাকে সবাই মাড়িয়ে যেত আর সে আবার তুলে নিয়ে ধুয়ে মুছে প্রলেপ লাগাতো, সেই পবিত্রতাকে লালন করার কোনো দায়িত্বই সে অনুভব করছে না। জোর করে কারো কারো কথা সে ভাববার চেষ্টা করলো। আশ্রমে এখন রঙ লাগানো চোখের পাতা নত করে সুধার মেয়ে কীর্তন গাইছে আর বৌদি নিশ্চয়ই শুনতে শুনতে তার নিজের ঘরের অশান্তির কথা ভাবছে। আর নিনি? কিন্তু মনটা কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাকে ধরে রাখতে চাইছে না। কতো রাত এখন? তার কাছে ঘড়ি নেই। দীর্ঘসূত্রী প্রতীক্ষা তার সময়কে অন্তহীন করে তুলেছে।

নির্জন রাস্তার অন্ধকারে মিশে একা সে দাঁড়িয়ে। চারিদিক ফাঁকা। মনের ভেতরটাও তাই। সেই অপার শূন্যতার মধ্যে এক-একটা কথা উঠছে আর ডুবে যাচ্ছে। কোনো বইয়ের মলাট, সিনেমার বিজ্ঞাপন, পরীক্ষার খাতা, নিনি—। আধফোটা কোনো কষ্টের অনুভবে পরিবর্তিত নিনি। ক্লান্ত শরীরের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে বদল করলো। আর তক্ষুণি হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলো সে।

একটা লোক ওদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। তাকে? হ্যাঁ, তাকেই দেখছে। প্রতিমা চেয়ে থাকতে থাকতেই সে নড়লো। রাস্তাটা পার হয়ে এদিকে এসে পৌঁছলো।

আর তক্ষুণি প্রতিমার এতোক্ষণের নিঃসাড় হয়ে থাকা সমস্ত আবেগ, ভয় আর উত্তেজনা যেন উত্তাল হয়ে উঠে তাকে অভিভূত করে ফেললো। কোনো কথা তার চিন্তায় স্পষ্ট আকার নেবার আগেই মোটা শরীর নিয়ে থল থল করতে করতে সে পানের দোকানটার দিকে দৌড়লো। শিথিল কাপড়ে, উগ্র প্রসাধিত মুখে একজন বয়স্কা মহিলার দৌড় অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গচিত্রের মতো দেখালো। পানের দোকানে দোকানী ও খরিদ্দার সকলেই এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হাসলো, অশ্লীল রসিকতা করলো। কিন্তু সে কিছু শুনতে পেল না। হাঁপাতে হাঁপাতে অপেক্ষাকৃত আলোকিত অঞ্চলে পৌঁছে সে একটা ট্যাক্সি দেখতে পেলো। এতো রাত্রে একলা সে কখনো ট্যাক্সিতে চড়েনি। কিন্তু এই মুহূর্তে আরো বড়ো কোনো আতঙ্ক তাকে ট্যাক্সিটার মধ্যে ঠেলে দিল। তারপর চলমান ট্যাক্সিতে সে সীটের গায়ে এলিয়ে পড়ল। ভয়ে তখনো তার হাত পা কাঁপছে।

ভয়টা কিসের? চাহিদার না বর্জনের তা সে জানতে চাইলো না।

আশ্রয়

উমা বন্দ্যোপাধ্যায়

রুদ্রনাথের দুপুর-ঘুমের আমেজটা বেশ জমে আসতে না আসতেই আফিমের নেশা ভাঙার মতন ভেঙ্গে গেল। ঝোড়ো হাওয়া নারকেল গাছের ডালপালাগুলো নিয়ে কি ভীষণ শব্দের মাতামাতি তুলেছে। পশ্চিম আকাশে একখণ্ড ছাই রঙা মেঘ দেখেই একটু গড়িয়ে নিতে গিয়েছিলেন রুদ্রনাথ, খাওয়া দাওয়ার পর। এই অল্পসময়ের মধ্যে যে খণ্ড মেঘ এত বড় আকাশখানা ছেয়ে ফেলল কখন—কখনই বা থম্ হয়ে থাকল পৃথিবী তা টেরই পাননি রুদ্রনাথ। ভাত ঘুমে এমন ঝিমিয়ে ছিলেন। আধো তন্দ্রায় কত ছবি আসা যাওয়া করছিল বন্ধ চোখের ভেতরে। একা হলেই এই পিছু টান, পিছু-হাঁটা পেয়ে বসে তাঁকে।

রুদ্রনাথ ধড়ফড় করে উঠে ছাদে ছুটলেন শুকনো কাপড় তুলে আনতে। কাজের বৌ সন্ধ্যার মা মেলে দিয়েছিল সকালে। বিকেল ফুরোনোর আগেই কাপড়গুলো তুলে রেখে চা করে দিয়ে যায় তাঁকে। আজ এই মাঝ দুপুরেই ঝড় উঠল। বেশ ভার ভার চোখ মুখে ছাদে এলেন রুদ্রনাথ। সেকেলে বাড়ি শহরতলিতে। অনেকখানি ফাঁকা জায়গায়। উঁচু ছাদ। বড় বড় দরজা জানালা। বড় বড় গাছের মাথায় অসহায় পাখিরা ওড়াওড়ি করছে। কত বাসা ভাঙবে। এখনও তেমন জমে ওঠেনি ঝড়টা। ধেয়ে আসার শব্দ শুনতে শুনতে দ্রুত হাতে কাপড়গুলো তুলছিলেন রুদ্রনাথ। এখুনি আছড়ে পড়বে ঝড়। শুকনো পাতা ধুলোয় ছেয়ে যাবে সব।

জানালা দরজা বন্ধ করতে করতে ধুলোয় ভরে গেল ঘরদোর। পায়ের তলায় ধুলোর স্তর। বিছানার চাদর, আলনার কাপড় চোপড়ে ধুলো। ভারী অসহায় বোধ করতে লাগলেন রুদ্রনাথ। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চলছে। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিও জানালার শার্সিতে পড়ল। যাক্ বৃষ্টি নামলেই ভালো। কখন আসবে সন্ধ্যার মা। তবে ঘরদোর পরিষ্কার হবে। চায়ের সময়ও হয়েছে। এ বয়সে বিপত্নীক রুদ্রনাথের মাঝে মাঝে দিশেহারা লাগে। পালে-পার্বণে ছেলেমেয়েরা এলেও কি করে যে কি হবে থৈ পান না রুদ্রনাথ। অথচ মমতা কি অনায়াসেই না সব সামলে গেছে। ভেবেছিলেন অবসরের জীবন কাটাবেন নিরুপদ্রব শান্তিতে। মমতা নিঃসঙ্গ করে রেখে গেল।

বড় বড় ফোঁটায় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। রুদ্রনাথ উঠে পূবদিকের জানালা খুলতেই একঝলক সোঁদা গন্ধ ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়ল। ঘর থেকে একটা ভ্যাপ্‌সা গরম বাইরে বেরিয়ে গেল। রাস্তার ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে চোখ পড়তেই দেখলেন, এক বছর দশেকের মেয়ে একটা কালো রুগ্ন ছাগলছানা বুকে করে ভিজছে দাঁড়িয়ে। আধময়লা ছেঁড়া ফ্রকখানি ভিজে জবজবে। চুল বেয়ে, মুখ বেয়ে জল নামছে। রুদ্রনাথ গলা ছেড়ে ডাকলেন—এ্যাই খুকী। বৃষ্টির মধ্যে তাঁর গলা ডুবে গেল। সেই সময়েই তীব্র কলিংবেলের আওয়াজ। দরজা খুলতেই আধভেজা সন্ধ্যার মা ঝড়ের মতন ঢুকে পড়ল। কি দুর্য্যোগ বাপু…। ভিজে মরি এতখানা পথ আসতে। চা করে দিচ্ছি মেসো। ঘরদোর ঝাঁটপাট দিয়ে দিই আগে। যে ধুলো জমেছে। রুদ্রনাথ কাতর গলায় বললেন—ও সন্ধ্যার মা, দেখোনা একটু ঐ গাছের তলায় কেমন দাঁড়িয়ে ভিজছে মেয়েটা। ওকে বারান্দায় ডেকে নাও। সন্ধ্যার মা জানালা দিয়ে

উঁকি দিল। ওঃ এই মেয়ে। এতো মোছ্লমান বাস্তির মেয়ে গো মেসো। মা টারে সেবার ধরে নে গেল নাকি কারা। কোথাকার বেড়া পার করে দেল। বাপ তো মদ খেয়ে পড়ে থাকে হেথা হোথা। প্যাটে ঘা হয়েছে না কি। রাত বিরেতে যন্ত্রণায় পুকুরের জলে লাফ দে পড়ে। জ্বালা জুড়োতে। রুদ্রনাথ আকুল হয়ে বলেন—আগে ওকে ডাকো না।

সন্ধ্যার মায়ের পেছনে পেছনে ছাগলছানা কোলে যে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো, তার বৃষ্টি ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে রুদ্রনাথ চমকে গেলেন, অবিকল পথের পাঁচালীর দুর্গা তাঁর সামনে। সেই মুখ। দু'টি চোখে আদিগন্ত আকাশ। কাশফুল মাঠ ধরে ছুটে চলা—রুক্ষ চুলে ঘেরা মুখ, সে-ই দুর্গা। বুকের মধ্যে কিসের সাড়া শব্দ জেগে উঠল তাঁর। বৃষ্টি ভেজা শরীরের জল তখন বারান্দা বেয়ে গড়িয়ে চলেছে। রুদ্রনাথ তাড়াহুড়ো করে ঘরে ঢুকলেন। মমতার আলমারি খুলে হাতড়াতে শুরু করলেন। মমতার শরীরের গন্ধ এখনও লেগে আছে আলমারির কাপড়-চোপড়ে। আনাচ কানাচ ঘেঁটে নাতনির রেখে যাওয়া দু'চারটে ফ্রক পেলেন রুদ্রনাথ। তা-ই খুঁজছিলেন। জানতেন, আগে আগে মমতা ওদের কিছু জামাকাপড় রেখেই দিতেন। ব্যস্ত হাতে আলমারির পাল্লা ভেজিয়ে বারান্দায় এলেন—এ্যাই খুকী, নে, ছেড়ে ফ্যাল ভিজে জামা। এইটে পর। মেয়েটার চোখে রাজ্যের বিস্ময় কথা বলে উঠল। সন্ধ্যার মা গালে হাত দিল—ওমা, তুমি এই জামা দে দিলে মেসো। ও তো এখুনি বাড়ি চলে যেত। রুদ্রনাথ মেয়েটার হাতে শুকনো জামা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমেছে। নিচু রাস্তার উপর দিয়ে হু হু জল বয়ে যাচ্ছে। বাতাস ঠাণ্ডা। মেয়েটা ভিজে ফ্রক গায়েই শুকনো জামাখানা হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল বৃষ্টি-ভেজা রাস্তা ধরে। সন্ধ্যার মায়ের মুখরা ঝাঁটা বারান্দার সব জল সাফ করে দিল।

রুদ্রনাথের দু'টি ছেলে। মেয়ে তিনটি। সকলে ঘোর সংসারী এখন। আগে তবু ছুটি ছাটায় এখানে দু'চারদিন কাটিয়ে যেত। কখনো পুজোয় বা ভাইফোঁটায় একসঙ্গে সকলেও এসেছে। মমতা যাবার পর অনেকই কমে গেছে সে আসা যাওয়া। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ রুদ্রনাথের মনে হয় সত্যিই কি এতগুলো ছেলেমেয়ে তাঁদের? কত মধ্যরাতে ঐ ক্যান্সার রোগগ্রস্ত এরশাদের অমানুষিক চিৎকার শুনে ঘুম ছুটে গেছে তাঁর। এরশাদ মৃত্যুর দিন গুণছে। যন্ত্রণার সাথে যুঝতে যুঝতে শরীরের জ্বালায় পুকুরের জলে লাফ দিয়ে পড়ে, রাতে ঘুমন্ত বস্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। ওরই অমন ফুটফুটে মেয়েটি!

সন্ধ্যার মা ঘর ঝাড়ামোছা করে চায়ের কাপটি নিয়ে যখন এসে দাঁড়ালো তখন সন্ধ্যে নেমেছে। আবির-রাঙা আকাশের তলায় বড় গাছগুলো ঝুপসি কালো দেখাচ্ছে। রুদ্রনাথ কাপটি নিয়ে বললেন—হ্যাঁ সন্ধ্যার মা, ঐ মেয়েটার বাপ ছাড়া আর কে আছে! কেউ আর নেই গো মেসো। সার দিনমান এবাড়ি ওবাড়ি ফেলাছড়া খেয়ে বেড়ায়। রাত্তে বারান্দায় ছাগলছানাগুলোর সাথেই পড়ে থাকে। বাপ তো এদানিং পয়সা রোজগার করতে পারে না। ও মলেই কী বাঁচলেই কী—মেয়েটার ঐ এক অবস্থা।

পরদিন খুব ভোরে ফুলবাগানের গাছের দেখাশোনা করছিলেন রুদ্রনাথ। হাতে চায়ের কাপ। তখনই দেখলেন গেটের কাছে কালকের দেখা মেয়েটি। নাতনির ফ্রকটি পরণে। কোল খালি। একটু চকিত হয়েই এগোলেন রুদ্রনাথ। যেন ওরই অপেক্ষায় ছিলেন এতক্ষণ। অগোছালো চুলে ঘেরা মুখে সকালের আলতো রোদ পড়েছে। হাত নেড়ে ডাকলেন ওকে। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে বারান্দার ধারে এসে চুপ করে দাঁড়াল। নরম চোখে ওর দিকে তাকালেন রুদ্রনাথ।—তোর নাম কি রে?—ঝারি। চা খাবি? ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে ফিক্

করে হেসে ফেলল ঝারি। ওকে বারান্দায় বসতে বলে সন্ধ্যার মাকে ডাক দিলেন রুদ্রনাথ। সন্ধ্যার মা গজ্ গজ্ করতে করতে চা পাঁউরুটি আনল—মোছলমান বস্তির মেয়েকে ঘরে উঠালে মেসো! রুদ্রনাথ কান দিলেন না। ঝারি পরম আগ্রহে নিমেষের মধ্যে সব খেয়ে ফেলল। কেমন মায়ায় পড়লেন রুদ্রনাথ ওর খাওয়া দেখতে দেখতে। বলে ফেললেন—এইখানে থাকবি ঝারি, আমার কাছে? মেয়েটার বিস্ময়ের শেষ নেই। এই সাত সকালে এত অযাচিত দয়া কেন, এমনই জিজ্ঞাসা ভেসে উঠল ওর চোখের তারায়। আরো মায়ায় জড়ালেন রুদ্রনাথ। চৈত্রের শেষদিকে গরমটা হুড়োহুড়ি করেই এসে পড়ল এবার। সকাল, দুপুর রুদ্রনাথ বিশেষ বাইরে বেরোতে পারেন না। তপ্ত দুপুরে হু হু শব্দে গরম হাওয়া বয়। ফাঁকা মাঠে ঘুরে ঘুরে ধুলো উড়ে যায়। জানালা খোলা যায় না। শেষ দুপুরে ঝারি বারান্দায় বসে রুদ্রনাথের সাথে গল্প করে যায়। অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে রুদ্রনাথের নিঃসঙ্গতা ভরে রাখে রোজ রোজ।—ও দাদু, জানো আমার ছাগল ছানার গা গরম হয়েছিল। রুদ্রনাথ বলেন হুঁ। কখনও সকালবেলাকার খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে রাখা রুদ্রনাথকে বলে চলে—ওই খালের ধারে কচু ক্ষ্যাতের ধারে একডা কি সোন্দর গাছ পাইছি দাদু—বাগানে পোঁতবা? রুদ্রনাথ বলেন হুঁ।

আজ বিকেলের ডাকে বড় ছেলে রঞ্জুর চিঠি এলো। গরমের ছুটির শুরুতেই ওরা ভাইবোনেরা দিন কয়েকের জন্য আসছে। গরমটা বেশী পড়ে গেলে এদিকের আবহাওয়ায় ওরা তিষ্ঠোতে পারবে না। রুদ্রনাথের এবার কাজ শুরু হল। ওপরের ঘরগুলো খুলিয়ে সন্ধ্যার মাকে দিয়ে পরিষ্কার করালো, বাসনপত্রের ব্যবস্থা—নানান ব্যস্ততায় দিন কাটতে থাকলো। ঝারি পিছু পিছু ঘোরে আর অবিরাম কথা বলে যায়। আজকাল আর বাড়ি যেতেই চায় না মেয়েটা। সন্ধ্যার মা রান্না করে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। রুদ্রনাথ ঝারির সাথে ভাগাভাগি করে খান। টেবিলে রুদ্রনাথের খাবার। মেঝেয় একপাশে বসে ঝারি। খেতে খেতে ওর দিকে আড়চোখে তাকান রুদ্রনাথ। চোখের ঐ আলোকেই কি স্বর্গীয় দ্যুতি বলে! রাত্রে কিন্তু কিছুতেই এ বাড়িতে থাকতে চায় না ঝারি। ঐ মেটে ঘরের দাওয়ায় ছাগলছানাগুলোকে কাছে নিয়ে না শুলে তার নাকি ঘুমই হয় না। মাঝরাতে হিম হয়ে যান রুদ্রনাথ এরশাদের জান্তব চিৎকার শুনে। মেয়েটার ভয় হয় না? আবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঝারি ওর ছাগলছানাগুলোকে সামনের মাঠে ছেড়ে দিয়ে রুদ্রনাথের বাগানে চলে আসে। এক একটা করে ঘাস বাছে, শুকনো ঝরা পাতা সরায়, গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে হাতের চেটোয় ধুলো মুছে নেয়। হাত উল্‌টিয়ে বলে—গাছগুলোরে নাওয়াতে হবে গো দাদু। রুদ্রনাথ ভাবেন ওকে একটু একটু লেখাপড়া শেখাবেন। তার সুযোগই দেয় না মেয়েটা।

বারোই মে রবিবার, হাঁকডাক করে ওরা এসে পড়ল, দুটো গাড়িতে। দুই ছেলে, বৌ, নাতি-নাতনিরা, ছোট মেয়ে, জামাই। ওদের সোরগোলে কোণঠাসা ঝারি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।—কি গ্র্যান্ড লন্ তোমার দাদু। মোসান্ডা লাগাওনি? রজনীগন্ধা? আমরা কিন্তু একদিন মুনলাইট পিকনিক করব দাদুভাই।

মাথায় বেশ লম্বা হয়েছে নাতি নাতনিরা। প্রাণবন্ত, ছটফটে। জড়সড় ঝারির দিকে অবজ্ঞার আঙুল তুলে বড় নাতি বলে—এ আবার কে দাদু? কোত্থেকে এল? নতুন কাজের লোক? অচেনা লোক দেখলেই ঝারি বোবা।

খাবার সময় আর ঝারিকে দেখতে পেলেন না রুদ্রনাথ। নাতি-নাতনিদের হল্লোড়ের মাঝে একটু আনমনা হয়ে রইলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সমস্ত বাড়ি দুপুরের রোদে ঝিমিয়ে

পড়েছে। সে সময়ে শুকনো মুখে ঝারি এলো। বারান্দার পাশেই রুদ্রনাথের ঘর। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বাইরে চোখ মেলে বসেছিলেন তিনি। ঝারির চোখে সন্ত্রস্ত হরিণীর চাউনি। রুদ্রনাথ রাগের গলায় বললেন—কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কোথায় ছিলি? ঝারি অপরাধীর মত উঠে এলো। রুদ্রনাথ রান্নাঘরে খাবার খুঁজতে গেলেন। বললেন, সন্ধ্যার মা! ঝারির ভাত? সন্ধ্যার মা অপ্রসন্ন মুখে উঠে এসে দায়সারা ভাবে খানিকটা অবহেলায় ভাত তরকারি দুম করে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে দপ্‌দপিয়ে চলে গেল। বাইরের দিকের বারান্দার মেঝেতেই ঝারি অপ্রস্তুত মুখে খেতে বসল। সন্ধ্যার মায়ের চলার শব্দের অবজ্ঞাটুকু রাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল রুদ্রনাথের সমস্ত শরীরে। দুপরের তাতে চোখ মুখ জ্বালা করছে তাঁর। শুকনো হাওয়ায় ঝারির থালার ভাতগুলো শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে উঠেছে। রুদ্রনাথ গাছগাছালির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ঝারি খেয়ে এঁটো থালা হাতে কলতলায় ধুতে গেল। সন্ধ্যার মা বলেই দিয়েছে ও মোছলমানের এঁটো আমি মাজতে পারব না। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। পায়রার ডাক মাঝে মাঝে নৈঃশব্দ ভাঙ্গছে। রুদ্রনাথ ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে টের পেলেন ঝারি বাগানের গেট খুলে রাস্তায় নেমে যাচ্ছে।

পনেরো তারিখের সকাল থেকেই আয়োজন, ব্যস্ততার সমারোহে মেতে উঠল বাড়িটা। উঁচু উঁচু ছাদ, ঘরের আনাচে কানাচে হিসেবি বেহিসেবি কথার তর্কের হাসি আর প্রাণোচ্ছলতার ঢেউয়ের ওঠা পড়া টের পেলেন রুদ্রনাথ। আজ ওদের মুনলাইট পিকনিক। আগের দিন রুদ্রনাথ রান্নার ঠাকুরের কথা বলতেই ছোটো ছেলে সঞ্জু বলেছিল ও ঠাকুর ফাকুর দিয়ে চলবে না বাবা। আমি ষ্টেশন রোডে ক্যেটারারের সাথে কথা বলে এসেছি। কী মেনু শুনে টুনে ও পারবে বলল। আজকাল এসব দিকেও ক্যাটারিং-এর ব্যবসায় বেশ রমরমা দেখলাম। আমাদের এই বাড়িটাই যা একঘেয়ে । তা গাড়ি আছে। নো প্রবলেম। রুদ্রনাথ তবু বললেন—তা পাঁঠার মাংস হবে না মুরগি—ব্যবস্থাটা—মানে, আজ হাটবার।

ছোট নাতি চোখ কপালে তুলে বলল—রেড মিট! তুমি কি পাগল হলে দাদু ভাই। বাবা, কাকামণি দু'জনেরই বারণ। বড় ছেলে রঞ্জু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন বাবা। ও সব ব্যবস্থা করে নেব আমরা। এইতো ক'টা লোক। তাছাড়া গাড়ি দুটো আছে। রুদ্রনাথ আর কিছু বলেন নি।

ঝারি এই দু'দিন একবারও আসেনি আর। ওকে কি কেউ কিছু বলেছে? না ও নিজেই—ঘৃণার কি কোনো গন্ধ থাকে!

সন্ধ্যার মায়ের কাছে ওর কথা তুলতে সাহসই পেলেন না রুদ্রনাথ। এমনিতেই ওর ঘোর আপত্তি। এখন বৌমাদের পেয়ে রণমূর্তি ধরেছে। ওকে চটিয়ে মুস্কিলে পড়বেন রুদ্রনাথ নিজেই। এসব হিসেবি চিন্তার মাঝে ঝারির জন্য মনে মনে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন রুদ্রনাথ। ওর বাবার কিছু হয়নি তো? শেষ দুপুরে বারান্দায় বসে এসব ভাবতে ভাবতেই শরীরে একটা নরম স্পর্শ অনুভব করলেন রুদ্রনাথ। ছোট মেয়ে মানুর কন্যা পিয়া। তুমি এলে কি করে দিদি ভাই? মা দেখেননি? পিয়া রুদ্রনাথের কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।—সবাই তো ঘুমুচ্ছে দাদু ভাই। রাত্তিরে পিকনিক আছে না। দাদা ক্যাসেট প্লেয়ার এনেছে। নাচও হবে। বাবাদের ড্রিঙ্কস্ এসেছে। আমাদেরও কোকাকোলা। মা বলছিল সামনের বার ক্লাবের আঙ্কেল আন্টিদেরও নিয়ে আসবে। রুদ্রনাথের হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে আসতে থাকে। যেন কোন নদীতীরের বালিতে বসে আছেন তিনি। কথাগুলো শন্‌শন্ হাওয়া হয়ে তাঁর চোখ, মুখ, কান, ত্বক ছুঁয়ে ছুঁয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। জলস্রোতের শব্দের সাথে ঝারির গলা মিলে মিশে

যাচ্ছে।—ও দাদু এই লাউগাছড়া কি চিকণ।—হ-ই মাঠে বড় গাছের উপরে জিন থাকে না কি দাদু, আব্বা কইছিল —'আমার ছাগলডারে নইলে আমার মেলা রাত পর্য্যন্ত ঘুম আসে না।' রুদ্রনাথ বারান্দা থেকে সরে এলেন।

সন্ধ্যের মুখে বাড়িটা চনমন করে উঠল। পূর্ণিমার আলো ম্লান করে ঘাস ঢাকা সবুজ জমিতে রঙিন ছাতা পড়ল। বেতের সোফাসেট বাইরে এলো। বাগানের ফাঁকাটুকুতে সামিয়ানার তলায় খাঁ খাঁ উনুনের তাপে রান্নার পাঁচমিশেলি গন্ধ। দোতলার বারান্দায় বড় একটা যান না রুদ্রনাথ। আজ ওপর থেকে ওদের পিকনিকের সাজটুকু দেখতে উঠে এসেছিলেন। ছোটছেলের ঘরের আধভেজানো দরজার কাছে পৌঁছতেই দু'একটা কথা তাঁকে পাথর করে দিল।—মেয়েটাকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন বাবা। যা-ই বল কেমন যেন ঘেন্না করে। একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে—বস্তির যত জার্ম—তার ওপর মুসলমান—ডিসগাস্টিং।—মুসলমান না হলে ওকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যেত। কাজের লোকের যা প্রবলেম। বাচ্চাগুলো বেশ সার্ভিস দেয় ভাই। প্রসাধনরতা দুই বউ-এর কথাবার্তা সন্ধ্যার মায়ের চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তি যেন। কেমন একটা অবসাদ সান্ধ্য জ্বরের মতন রুদ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ঝারির মুখটা বারবার জাগছে মনে। লনে অচেনা গান বাজনার সুর উঠেছে। এক ধরনের চটুল বাজনার সাথে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে পুতুলের মতন হেলেদুলে নেচে যাচ্ছে কিশোর বয়সের নাতি নাতনিরা। জামাই আর ছেলেরা রঙিন ছাতার তলায়। সৌখিন গ্লাসে টলটলে পানীয়—দামী সিগারেটের গন্ধ বাতাসে। এ যেন রুদ্রনাথের পাহাড়পুরের 'মমতা আলয়' নয়। যৌবনে দেখা ইংরেজী সিনেমার পর্দ্দায় ফোটা ছবি। এখন দিন বদলের সময়ের রীতিনীতি কিছুই জানা নেই রুদ্রনাথের। কত বছর হয়ে গেল তিনি আর মমতা এই পাহাড়পুরের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিলেন। বাঙ্ময় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্তের ভাষাই ওঁদের নিজস্ব অভ্যস্ত ভাষা। বাগানের পাশের ছোটো গেট দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলেন রুদ্রনাথ। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভরে যাচ্ছে পাহাড়পুর। চাঁদের আলো গাছপালা, মাঠঘাট ছুঁয়ে অসীম নৈঃশব্দের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। 'মমতা আলয়'-এর বেসুরো আওয়াজ ছাড়া আর সবই শান্ত সমাহিত অবধারিত। এই যে পৃথিবী অতি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে তার আভাস নেই পাহাড়পুরে। তেমনি অমাবস্যার জমাট অন্ধকার আর জ্যোৎস্নার আলোয় প্লাবন এখনও। বেড়ে ওঠা বসতি হিন্দু-মুসলমান বস্তির—মানুষের টানা সীমারেখা, ভেঙ্গে ধুয়ে মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্না এখন। প্লাবিত করছে সব ভেদবুদ্ধিকে। সেই শব্দময় আলো মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে রুদ্রনাথের।

এরশাদের মেটে দাওয়ায় ছাগলছানাদের চিকণ কালো গা ঘেঁষে বসে আছে ঝারি। ভাষাহীন বোবা চোখ। জ্যোৎস্না ওর রুক্ষ চুলে, দুর্গন্ধ গায়ে, আবর্জনাময় পরিবেশে আদর বোলাচ্ছে। উঁইয়ে খাওয়া আধবোজা দরজার পাল্লার ওপাশে একটানা গোঙানির আওয়াজ থেমে গেছে। হিম নীরবতা চারিদিকে। রুদ্রনাথ দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিলেন। এরশাদের শরীর শব্দহীন। নাকের কাছে হাত রাখলেন। শ্বাস নেই। এরশাদের শবদেহের পাশে একটুখানি বসে রইলেন রুদ্রনাথ। তারপর বাইরে এসে লোক ডাকলেন। ওদের বললেন—গোর দেবার ব্যবস্থা কর। আমি খরচ দেব। ঝারির মাথায় হাত রাখতেই রুদ্রনাথের প্রশস্ত করতলে মুখ লুকোলো ঝারি। তাঁর সব ক'টি আঙুল বেয়ে গড়িয়ে চলল ঝারির সমস্ত কান্না। রুদ্রনাথ ঝারির হাত ধরলেন। বস্তির সরু আবর্জনাময় পথ বেয়ে ঝারিকে নিয়ে 'মমতা আলয়'-এর দিকে এগোতে থাকলেন।

নিশ্চিন্তে থিসিসটা শেষ করতে পারতুম! না, নাটকগুলোই লিখতে পারতুম।' তারপরে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'একবার থিসিসটা জমা দিতে দাও না, দেখবে যাযাবরের মতো বেরিয়ে পড়ব দু'জনে।'

মাঝে মাঝে যাযাবরের মতো বেরিয়ে পড়লেই যে আমার সমস্যার কোনও সমাধান হবে না একথা ওকে বুঝিয়ে লাভ নেই। মানুষ একচক্ষু। যে দিকটা দেখতে, ভাবতে অভ্যস্ত সেদিকটাই দেখে, ভাবে। অন্য দিকে চোখ ঘোরাতে পারে না। আমার এতো অভিমানই বা কিসের? বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বই তো নই! বাবা অবশ্য অনেক আগেই গত হয়েছেন। কিন্তু মা দাদারা কেউ এ-বিয়ে মেনে নিলেন না বলেই তো এতো অসম্মানের মধ্যে দিয়ে আমায় শ্বশুর বাড়ি আসতে হল। সুশান্ত ভেবেছিল পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি আছে বলে, কলেজে পড়াই বলে আমার খাতির হবে। ও জানে না মেয়েদের সম্মান তাদের চাকরি, শিক্ষা, ডিগ্রি এসব দিয়ে হয় না। সমাজের এমন স্তর এখনও অনেক আছে যেখানে এগুলো বরং মেয়েদের অসম্মান বাড়ায়। চাকরি করে?—এ মা! কলেজ? ওই হল। মাস্টারনি! পি. এইচ. ডি.? এম. এ-র পরেও আরও পড়েছে? বয়সের কী গাছ পাথর নেই গা? মেয়েদের সম্মান হয় তাদের রূপে, তাদের বাবা, স্বামী এদের পদমর্যাদায়, আর যৌতুকে। আমার রূপ? নেই। বাবা? চলে গেছেন। স্বামীর পদমর্যাদা? এখনও তৈরি হয়নি। আর যৌতুক? ভাঁড়ে মা ভবানী।

তাই এঁদের বাড়ির সব বউয়ের গুণ আছে, খালি বউমার কোনও গুণ নেই। বড় বউয়ের চোখ ঝলসানো রূপ। সেজ বউটি কেমন সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, টিপটপ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেজ বউমা ছুঁচের কাজে এক্সপার্ট, বড় বড় শাড়ি, বেড-কভার ফুলে লতাপাতায় ভরিয়ে ফেলছে, অবাক মানতে হয়। ন বউমা তো সাক্ষাৎ ষষ্ঠী দেবী, মমতাময়ী জননী, কোলে কাঁখে দেবশিশুর দল। কনে বউমা! হিসেব জ্ঞান টনটনে। কোথাও এতটুকু অপচো করো তো! কনে বউমার চোখে না পড়ে পারে না! নতুন বউমা? সব চুপ।

শাশুড়ি একদিন একগোছা সোনার চুড়ি আর একটা মটর দানা দিয়ে বললেন, 'এগুলো পরো বউমা। ন্যাড়া গায়ে ঘোরো ফেরো, আমার বড় লজ্জা করে।'

আমি বললুম—'ট্রেনে, বাসে যাতায়াত করি, এসব তো ডাকাতি হয়ে যাবে মা!'

—'তো বাড়িতে ফিরে এসে পরো।' এইভাবে আমার কিছু গহনা বা সম্মান লাভ হলো। আদর করে উপহার দেওয়া নয়, দায়ে পড়ে নিতান্ত ব্যাজার হয়ে হাত-উপুড়। তা তা-ই সই। সঙ্গগুণে আমারও কেমন একটা হীনমন্যতা জন্মে গেছে। গয়নাগুলো পরে মনে হল জাতে উঠলুম।

জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন দুপুরবেলা দিদিশাশুড়ি বললেন—'বউমা ভাত-পাতে আগে ঠাকুরের প্রসাদটুকু খেয়ে তারপর অন্যসব খেয়ো।' খিচুড়ি আর পায়েস, একমুঠো। খেয়ে চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'এ প্রসাদ কোথাকার দিদি?'

—'ও মা, জানো না? বামুন বাড়ির! বামুন-কর্তা বারোমাস সমস্ত শক্তি পুজো নিজের হাতে করেন যে! বামুন-মা নিজের হাতে ভোগ রাঁধেন।'

বড় জাকে জিজ্ঞেস করে জানলুম বামুন-বাড়ি আমাদের পেছনেই। নাম তারানাথ ভট্টাচার্য। পেশায় পুরোহিত বা পণ্ডিত কিছু নন, কোন মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভক্তিমান। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই। তাই আজ সারাদিন ধরেই খুব শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর ইত্যাদির আওয়াজ পাচ্ছি। এ বাড়ি থেকেও ঠাকুরের পুজো বাবদ শাড়ি, মিষ্টি ইত্যাদি

কীসব গেল। দিদি শাশুড়ি জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—'পুজো তো কতই হয় কিন্তু বামুন-কর্তার পুজো একেবারে সাক্ষাৎ ঠাকুরের আবাহন করে এনে প্রতিমার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া। এমন জায়গায় পুজো পাঠাতে পারাও অনেক পুণ্যি, অনেক ভাগ্যির কথা।'

ফর্সা মতো ছোটোখাটো একজন লালপেড়ে শাড়ি পরা মহিলা আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন বটে এ-বাড়ি আসার পর। শুনলুম তিনিই বামুন মা। আর তারানাথবাবুকে আমি মাঝে মধ্যেই ট্রেনে দেখি। যাওয়ার সময়েই বেশি। আসবার সময়েও কখনও কখনও। ফর্সা দোহারা চেহারা, চমৎকার প্রশান্ত মুখ। চুলগুলো বেশিরভাগই সাদা হওয়ায় খুব সৌম্য লাগে। শার্ট-প্যান্ট পরে প্রৌঢ় মানুষ ভিড় ট্রেনে ওঠা-নামা করেন, সৌম্য দর্শন হওয়া সত্ত্বেও কোনদিন আঁচ করতে পারিনি তিনি এতো ভক্তিমান। কিম্বা নিজের হাতে সব মাতৃপুজো করবার মতো শক্তি ধরেন।

খুব কৌতূহল হল। পুজো অর্চনার আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আমার বাপের বাড়িতে খুব একটা রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু আমার ওই ধূপ-ধুনো, শঙ্খ-ঘণ্টা, মন্ত্র পাঠ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে আবহাওয়াটা তৈরি হয় সেটা ভীষণ ভালো লাগে। স্কুল-কলেজে পড়তে সরস্বতী পুজোয় আলপনা দেওয়া, ফল-কাটা, প্রসাদ-বিতরণ, অঞ্জলি বা আরতির সময়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকা-এসব আমার ভালো লাগত।

সরস্বতী পুজোর দিন শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলুম—ভট্‌চায বাড়ির পুজো দেখতে যাবো কি না। এ বাড়িতে আবার বড়দের অনুমতি না নিয়ে পাড়ার কোনও বাড়ি যাবার নিয়ম নেই। উনি সানন্দেই সম্মতি দিলেন। যখন পৌঁছলুম তখন তারানাথবাবু আরতি করছেন, বিচিত্রভাবে পঞ্চ প্রদীপ নাচিয়ে নাচিয়ে। বামুন-মা শাঁখে ফুঁ পাড়ছেন। কাঁসর বাজাচ্ছে ওঁদের নাতি, বড় মেয়ের ছেলে, আরও দু'চার জন নাতি নাতনি দাঁড়িয়ে আছে। বড় মেয়েও রয়েছেন। কিন্তু পরিবেশ সত্যিই অপূর্ব।

শুধু ধূপ-ধুনোর পবিত্র ভাবদ্যোতক গন্ধই নয়, মঙ্গলবাদ্যই নয়, গাঁদা ফুলের মালায় সজ্জিত ছোট্ট সরস্বতী বিগ্রহের দেবীভাব, উপস্থিত সকলের মগ্নতা, তারানাথ ভট্টাচার্য মশাইয়ের বাহ্যজ্ঞানশূন্য তদগত তন্ময় পুজোর ভঙ্গি সব মিলিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দিল।

উপুড় হয়ে প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করে, পুজো শেষ করে এদিকে ফিরলেন ভট্টাচার্যমশাই। আমাকে দেখবা মাত্র ওঁর মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে গেল। কেমন একটা উল্লাসের সঙ্গে বললেন—'জানতুম, আমি জানতুম, মা আমার ডাক শুনেছেন, সশরীরে এসে নিজেই নিজের পুজো নিচ্ছেন সন্তানের হাত থেকে', আমাকে জোড় হাতে নমস্কার করলেন উনি।

এগুলো বয়স্ক মানুষের অভ্যস্ত কথার কথা বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারতো, যদি না তাঁর মুখের সেই দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের ভঙ্গিটা থাকত। বামুন-মা বলে উঠলেন 'উনি ঠিকই বলেছেন মা, তুমি যে একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী। তোমার সব কথা শুনেছি মা আমরা, ঠিক চিনেছি তোমাকে।'

আমার চোখ ভর্তি করে জল এসেছিল, মুখ নিচু করে কোনমতে বললুম—'কী যে বলেন কাকিমা, কবে থেকে ভাবছি আপনাদের পুজো দেখব, আজ এসে এতো ভালো লাগল!'

ওঁরা তিনজনে স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা আমাকে যত্ন করে বসিয়ে প্রসাদ না খাইয়ে ছাড়লেন না। খিচুড়ি, বাঁধাকপির ডালনা, বেগুনি, কুলের অম্বল, পায়েস। কী অসাধারণ যে সেই প্রসাদের স্বাদ। আমি বললুম—'এমন রান্না আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।' কাকিমা বললেন—'নিশ্চয়ই দেবো মা। তুমি আবার এসো, যখনই সময় পাবে এসো, তুমি এলে আমরা ভাগ্যি মানবো।'

বাড়ি ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি কেঁদে ফেললুম। জীবনে অনেক দিন পর, কিম্বা বোধহয় এই প্রথম কেউ আমায় বড় সমাদর করল, বড় সম্মান! আমার সব কথা শুনেছেন ওঁরা? কোন কথা? অসবর্ণ-বিবাহ, পিতৃকুল শ্বশুরকুল উভয়েরই অসম্মতি, তৎসত্ত্বেও জোর করে কাগজের বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে পড়া, স-ব? চিনেছেন আমাকে? কী চিনেছেন? কী দেখলেন যে এত আদর! আমার এতদিনের মুখের ম্লানিমা, চোখের জল, অন্তরের গ্লানি সব যে একেবারে ধুয়ে গেল! কোনকালে বাবাকে হারিয়েছি। মায়ের মুখখানা দেখিনি কতদিন হয়ে গেল! বাপের বাড়ির কারুর সঙ্গে রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে চোখ-ফিরিয়ে নেয়। এখানে আমি আছি যেন অনাহূত অবাঞ্ছিত অতিথির মতো। আর এই রক্ষণশীল, ভক্তিমান দম্পতি কি না অনায়াসে বলে দিলেন—'তোমাকে ঠিক চিনেছি। তুমি একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী!' অন্য কিছু না, কত বড় মন, কত স্নেহ গড়া অন্তর হলে তবে কেউ একথা বলতে পারে!

এতদিন পরে আমার বোধহয় একটা জুড়োবার জায়গা হল। মাঝে মাঝেই যাই, ভট্টাচার্য দম্পতিকে কাকাবাবু-কাকিমা ডাকি। গল্প করি। আমি আর কী গল্প করবো, আমার জগতের লোকই নন ওঁরা। আমি শুধু শুনি। কাকিমার বাপের বাড়ির গল্প। শ্বশুরবাড়ির দেশের গল্প। একটা কোনও সূত্র পেলেই হল, সেটাকে উপলক্ষ্য করে উনি অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন, সব কথা বুঝতে পারি না, তাড়াতাড়ি বলেন, তার ওপর ঢাকাই টান, কিন্তু স্নেহ আর আন্তরিকতা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। একেকদিন কাকাবাবু এসে বসেন, হেসে বলেন—'কাকিমা তোমার কানের পোকা বার করে দিচ্ছেন, না?' কাকিমা তখন বলেন—'সত্যি! তুমি কত বিদুষী। তোমার কাছে আমি মূর্খ বকবক করে মরি। কিছু মনে করো না তো মা!' আমি বলি—'বিদুষী-টিদুষী বলে আমায় লজ্জা দেবেন না কাকিমা।' আন্তরিকভাবেই বলি। বিদ্যার মূল্য কতটুকু, তা যদি ভাব দিতে না পারে?

.কাকিমা একদিন বললেন—'তোমায় প্রথমদিন দেখেই লক্ষ্মী ঠাকরুণ বলে বুঝতে পেরেছিলাম মা উঠোনে এসে দাঁড়ালে মুখ নিচু করে কিন্তু কেমন সোজা, কোথাও কোনও মিথ্যে সংকোচ নেই। লক্ষ্মী যে! নিজের সিংহাসনে দাঁড়াতে কি মায়ের মনে সংকোচ আসে?' আমি আর থাকতে পারলুম না। আস্তে আস্তে বললুম—'কিন্তু কাকিমা আমাকে তো কেউ লক্ষ্মী ভাবে না। আমি তো উড়ে এসে জুড়ে বসা একটা আপদ,—'লক্ষ্মী যখন কাউকে দয়া করেন, তখন সব সময়ে তাঁকে চিনতে পারবে, এতো সৌভাগ্য মানুষের হয় না মা।' দেখি কাকাবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'লক্ষ্মী কে? লক্ষ্মণ কী ? শ্রী-সম্পদ যখন কল্যাণের সঙ্গে, সংযমের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় মা। তোমার শ্বশুরগৃহে সম্পদ ছিল মা, শ্রী ছিল না, কল্যাণ ছিল না, সংযমও ছিল না। এবার হল। আমি মায়ের পূজা করি, টের পাই কখন তাঁর অকারণ কৃপা প্রকাশিত হয়। তোমার মধ্যে দিয়ে সেই কৃপা প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যার সঙ্গে সংযম, বিনয়, সম্পদের সঙ্গে মঙ্গল। তাই বলছিলাম তোমাকে চিনেছি। তুমি নিজে চেনো নি মা নিজেকে। মেয়েদের মধ্যে যখন শক্তির প্রকাশ হয় তাঁরা কি নিজেদের চিনে কাজ করেন?'

কাকিমা আসবার সময়ে বললেন—'তোমার কাকাবাবু যে তোমাকে কী চোখে দেখেছেন মা! আমাকে সবসময়ে বলেন তোমাকে যেন বিশেষ যত্ন করি।'

আমি হেসে বলি—'আপনাকে কি যত্ন করা শেখাতে হয় কাকিমা?'—'তা নয়, কিছুই তো পারি না।' উনি বললেন, 'কিন্তু তোমাকে বড় ভালো লাগে।'

ধীরে ধীরে ভট্‌চায্যি বাড়ির বিশেষ আদরের হাওয়া আমার শ্বশুরঘরেও লাগল। প্রথম দিককার সেই বিরূপতা, উদাসীনতা, অশ্রদ্ধা এখন যেন আর নেই। বরং জায়েরা মাঝে মাঝে আমার পরামর্শ নিয়ে যায়, শাশুড়িও আমার মতামত উপেক্ষা করেন না। দিদিশাশুড়ি কথায় কথায় বলেন—'বাব্বা, বামুন-কর্তা স্বয়ং তোমাকে যা মান্যি করেন নাতবউমা!' বুঝতে পারি ওঁদের মতামতই এ বাড়ির হাওয়া পাল্টে দিচ্ছে।

· কাকা-কাকিমার স্নেহ যে অকৃত্রিম, যে কোনও কারণেই হোক আমাকে যে তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। খালি একটা কথা আমার মনে বারবার উঠতে থাকে। ওঁরা যেমনি ভক্তিমান, শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কিন্তু নিষ্ঠাবানও বটে। অর্থাৎ আচার-বিচার মানেন। খুব বেশি রকম। অতিরিক্ত আচার পরায়ণতা থেকেই তো মনুষ্যত্বের যত অপমান! আমাকে ওঁরা মা বলেছেন, আমার মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। অব্রাহ্মণ বলে আমার আত্মার অপমান ওঁরা করেন নি। ঠিক কথা। এই সহনশীলতা, মমতা, অন্তর্দৃষ্টি যদি ওঁরা ভক্তি থেকে পেয়ে থাকেন তো ওঁরা সত্যিই অসামান্য। কিন্তু আমার পরীক্ষা করে দেখতে খুব ইচ্ছে হয় কতটা, কতটা উদারতা ওঁদের আছে। আমি যে যুক্তিবাদী! পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণাই আমার স্বভাব! তাই একদিন বললুম—'কাকিমা, আমাকে তো আপনারা যখন-তখন খাওয়ান। আমারও কিন্তু নিজের হাতে আপনাদের খাওয়াতে ইচ্ছে করে।'

কাকাবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন—'আমি যে স্বপাক ভিন্ন খাই না মা, নেহাত অসুখে-বিসুখে অপারগ হলে তোমার কাকিমা রেঁধে দ্যান।'

কাকিমা বললেন—'সে-ও কি কম হাঙ্গামা! তসর পরতে হবে। সদ্য চান করে তবে রাঁধতে হবে। রান্নার সময়ে কথা বলতে পারবো না।'

আমি বললুম—'রান্নার সময়ে কথা না বলা, খুবই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। কিন্তু তসর কেন কাকিমা? তসরের শাড়ি কি কেচে নিয়ে পরেন?'

—'না, তোলা থাকে, পুজো-টুজোর সময়ে বার করে পরি, ময়লা হলে কাচি।'

আমি বললুম—'এটার কিন্তু কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। পবিত্র মানে যা একেবারে পরিষ্কার। সাবান দিয়ে কাচা কাপড় যত শুদ্ধ, তুলে রাখা সিল্ক কাপড় কি তত শুদ্ধ হতে পারে? কাকিমা বললেন—'নাও এবার কী জবাব দেবে দাও। সরস্বতীর সওয়াল এ। শক্ত-ঠাই।' কাকাবাবু বললেন—'সুতিবস্ত্রে যত সহজে ময়লা লাগে, তসরে তত সহজে লাগে না মা। অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ, ব্যাকটিরিয়ার কথা ভাবতে গেলে পরিষ্কার সাবান-গরম জলে কাচা বস্ত্রই শুদ্ধ। তবে কি জানো মা শাস্ত্রের অনেক বিধানের পিছনেই কিন্তু যুক্তি আছে। যুক্তিগুলো কালের প্রভাবে হারিয়ে গেছে। আমরা অন্ধের মতো আচার বলে পালন করে যাই সবই। যেমন তুলসী গাছকে পবিত্র বলা হয়ে থাকে। বাড়িতে তুলসী রাখার নিয়ম। আমি শুনেছি তুলসীর অক্সিজেন উৎপাদন করার ক্ষমতা অন্য গাছের থেকে বেশি। তাছাড়াও তুলসী ঔষধি। বহু রোগের নিরাময়ের উপায় আছে তুলসীর পত্রে, ছালে। বাড়িতে সব সময়ে একটি ঔষধিবৃক্ষ থাকলে গৃহস্থের কত সুবিধে বলো তো?'

আমি হেসে বললুম—'বুঝলুম। নিশ্চয়ই তুলসী-ভক্তির পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। কিন্তু আমি যদি চান করে পরিষ্কার শাড়ি পরে, না হয় তসরই পরলুম, আপনাকে রেঁধে দিই আপনার না খাওয়ার কোনো শাস্ত্রীয় বা বৈজ্ঞানিক কারণ থাকে কী?'

চোখ বুজিয়ে কাকাবাবু স্মিত মুখে বললেন—'যা দেবী সর্বভূতেষু অন্নরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। আমি কারো হাতে খাইনি মা, শাস্ত্রীয় অন্ধতাই হবে হয়ত,

কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি আমার মা, তোমার যখন এতো আগ্রহ নিশ্চয়ই খাবো।'

আমার মনের ভেতরটা আলোয় আলো হয়ে গেল। চান করে, বাড়িতে ধোয়া সাদা কাপড় পরে রেঁধে দিলুম, খেতে বসে আমার দিকে চেয়ে বললেন—'তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে, না মা?'

আমি শুধু হাসলুম। উনি বললেন—'আনন্দরূপংযদ্বিভাতি···আনন্দই ঈশ্বর। আমাকে খাইয়ে যদি তুমি আনন্দ পাও মা, তো সেও একরকম ঈশ্বরকেই পাওয়া। তোমার সেই পাওয়ার উপলক্ষ্য হতে পেরেছি বলে আমি ধন্য।'

মনে মনে ভাবি আমিও ধন্য, এমন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের দেখা পেলুম যিনি আবেগের বশেই অব্রাহ্মণ-কন্যাকে মানুষের অধিক সম্মান দেন নি, মনে প্রাণে যিনি আচার-বিচারের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে, সত্যিকারের শ্রেয় লাভ হলেই মানুষ এমন হয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার বাইরেও হয়।

কাকাবাবুর মধ্যে আমি আমার বাবাকে ফিরে পেলুম, কাকিমার মধ্যে মাকে। ওঁরাও আমাকে মেয়ে বলে মনে করেন। কাকিমার অসুখ করলে আমি ওঁদের বাড়ি গিয়ে যতদূর পারি সেবা-শুশ্রূষা করে আসি। ওঁরা আমার কাছে সেবা নিতে কোনরকম কুণ্ঠা করেন না। শীতকালটাতে কাকাবাবুর হাঁপানি বাড়ে। খুব কষ্ট পান। কলকাতা থেকে আমার এক সহকর্মিনীর চেনা ভালো ডাক্তারকে সেবার আনলুম। তাঁর চিকিৎসায় থেকে উনি খুব আরাম পেলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমাকে আড়ালে ডেকে বলে গেলেন—'এতদিন ফেলে রেখেছেন, চিকিৎসা করাননি কেন? এতো কার্ডিয়্যাক অ্যাজমা! হার্টের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, যে কোনওদিন খারাপ টার্ন নিতে পারে।' ওধুষ-পত্রের ব্যবস্থা হল, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম হল। শিশুর মতো উনি আমার সব কথা মেনে নিলেন। ওঁদের ছেলে নেই। তিনটি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়জন ছাড়া বাকি দু'জন খুবই দূরে দূরে থাকে। হার্টের কথা কী করে ওঁদের বলি! মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে কাকাবাবু প্রেসক্রিপশনটা হাতে করে ভালো করে দু'তিনবার পড়লেন। কিছু বললেন না।

আগস্ট মাসের সন্ধ্যেবেলা। সারাদিন মেঘ করে আছে। ভীষণ গুমোট । বিকেলের দিকে ঠিক বেরোবার মুখে ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। গরম কমল না। মাঝখান থেকে রাস্তাগুলো কাদায় কাদা হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সবে গা ধুয়ে বেরিয়েছি, বিজলি চলে গেল। গঙ্গার দিকের জানালাগুলো খুলে দিয়ে একটু দাঁড়িয়েছি, আমার এক ভাসুরের মেয়ে বলে গেল—'ও বাড়ির বামুন-মা তোমায় সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি করছেন—কাকিমা।'

—'কেন রে?'

—'কি জানি! বোধহয় বামুন-কর্তার শরীর ভালো নেই।'

মনের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সুশান্তকে বললুম—'চলো তো আমার সঙ্গে।'

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ওঁদের দোতলায় উঠতে কাকিমার গলা পেলুম—'এখন কেমন বোধ করছ? কথা বলছ না কেন?'

উত্তর নেই। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় দেখলুম কাকাবাবুর মারাত্মক টান উঠেছে। চোখ বেরিয়ে আসছে এককেবারের টানে। সুশান্ত সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনতে চলে গেল। কাকিমাকে জিজ্ঞেস করলুম—'কখন থেকে এমন হয়েছে?'

কাঁদো-কাঁদো গলায় উনি জানালেন, কাল রাত থেকে জ্বর, সকালে প্রায় কিছুই খান নি। খালি দুধ। শেষ দুপুর থেকেই টান উঠেছে। কাকিমা ওঁর বুকে মালিশ করে দিচ্ছিলেন। বারণ

করলুম হার্টের ব্যাপার। দেখতে দেখতে টানটা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। ওষুধ-পত্র যা খাওয়ার ছিল খাওয়ালুম, জিজ্ঞেস করলুম—'কাকাবাবু, কষ্ট হচ্ছে খুব? একটু ধৈর্য ধরুন, এক্ষুনি ডাক্তার এসে পড়বেন।' বললে কী হবে, দেখছি বুকটা ওঁর হাপরের মতো ওঠানামা করছে। অনেক কষ্টে বললেন—'জল, একটু জল' কাকিমা তাড়াতাড়ি গ্লাসে করে জল নিয়ে এলেন। তাঁর হাত কাঁপছে, বললেন—'আমার বড্ড ভয় করছে শান্তা, তুমিই খাইয়ে দাও।' আমি ফীডিং ক্যাপে জলটা ঢেলে ওঁর গলায় একটুখানি ঢেলেছি কি না ঢেলেছি, হঠাৎ উনি প্রাণপণ শক্তিতে কাপটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। বুকে ভর দিয়ে উঠে বসেছেন। যন্ত্রণায় চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তারপর খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিয়েই বিছানার ওপর কাত হয়ে পড়ে গেলেন। চোখ আধখোলা, নিশ্চল।

কাকিমা কেঁদে উঠলেন—'কী হল? কী হল? শান্তা একি ওঁর পা এমন ঠাণ্ডা কেন? অজ্ঞান হয়ে গেলেন, না কী? কী হল, বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু কোন প্রাণে বলি? ওঁকে সান্ত্বনা দিতে নিজের চোখের জল সামলে ঠাণ্ডা সাদা পা ঘষে ঘষে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। সুশান্ত ডাক্তার এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ফিরল। ডাক্তার ওঁর ডান হাতখানা একবার তুলে ধরেই নামিয়ে রাখলেন।

এমনি করেই শেষ হয়ে গেল কয়েক বছরের সুন্দর সম্পর্কের গল্প। বেচারি কাকিমা। খালি বলেন—জল খাবার জন্যে অমন তেড়েফুঁড়ে উঠতে গেল বলেই বোধহয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল, না মা? জলটা বোধহয় গলায় আটকে গিয়েছিল। না? কী করে শোকার্ত মানুষটিকে বোঝাই যে বিশাল হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তার থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনও আশাই ছিল না কাকাবাবুর।

শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেছে। কাকিমা একদম একা। ওঁর বড় মেয়ে কলকাতায় থাকেন, তিনিই আপাতত ওঁকে নিয়ে যাবেন। বাড়ির বিলি-ব্যবস্থা হচ্ছে। ওঁর অন্য দুই মেয়েও উপস্থিত। সবাই মিলে গোছগাছ চলছে। আমিও রোজ সন্ধেয় বাড়ি ফিরেই যাই। যতদূর সম্ভব সাহায্য করি। দিন কয়েক পর। পরদিনই কাকিমা চলে যাবেন, মনটা বিহ্বল হয়ে রয়েছে, কাকিমার বড় মেয়ে একটা সুন্দর লালপাড় শাড়ি আমার হাতে তুলে দিলেন, কাকিমা বললেন—'শেষ সময়ে মুখে জল দিলে একটা শাড়ি দিতে হয় মা আমাদের, নাও।' শেষ সময়ে? মুখে জল? সহসা শেষ দিনের শেষ দৃশ্যটা নির্মম ভাবে ঝলসে উঠল আমার চোখের সামনে। বাক্‌রোধ হয়ে গেছে, চোখ ঠিকরে আসছে, কাকাবাবু তাহলে ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন মহাকাল সামনে! বিদ্যুচ্চমকের মতো এক লহমায় আমি সমস্তটা বুঝতে পারলুম। গলা বুজে আসছে, শাড়িটা ফেরৎ দিয়ে বললুম—'আপনি ভুল দেখেছেন কাকিমা, শেষ জল দেবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। জলটা উনি নিজে নিজেই খেয়েছিলেন।'

পরলোকের আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গতি সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন আজীবন শক্তির পূজারী। শূদ্রাণীর হাতের জল পান করবার ঝুঁকিটা কিছুতেই নিতে পারেন নি।

ফিরে দেখা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সকালে প্রথম চোখ খুলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন অনুপমা। আর দেরি নয়, আজই বেরিয়ে পড়বেন। সময় বড় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তার আগে তাঁকে একবার পৌঁছতেই হবে সেখানে।

বিছানায় উঠে বসে অনুপমা দুহাতে চোখ ঘসলেন ভাল করে। জোরে জোরে শ্বাস টানলেন। রোজকার মতোই রাতভর বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কখন যেন ভোরের মুখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ঠিক নয়, ঘুম ঘুম ভাব। অনিদ্রার ক্লান্তি এখনও জড়িয়ে আছে চোখের পাতায়। শরীর নতুন করে গড়িয়ে পড়তে চাইছে। না, আজ আর কোন ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেবেন না অনুপমা। পুবের জানলা দিয়ে ওই যে শৈশবের মত নিষ্পাপ নতুন সকালটা এক মুঠো নরম আলো ছড়িয়ে হামা টানছে ঘরের মেঝেতে, ওই আলো প্রবীণ হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়া দরকার। বলা যায় না ভোরের ইচ্ছে বেলা বাড়লে কখন ফুরিয়ে যায়।

খাট থেকে নেমে অনুপমা রোজকার মতই ঠাকুর প্রণাম সারলেন আগে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল বসালেন। বাথরুম থেকে মুখ চোখ ধুয়ে এলেন। ভোরের এমন সুন্দর আলোতেও গোটা বাড়ি ভুতুড়ে রকমের থমথমে। এ সময় রোজ এরকমই থাকে। এ বাড়ির আর সবার এখন মাঝরাত। সাতটা নাগাদ কাজের লোক এসে চা করে ডাকলে তবে একে একে বিছানা ছাড়বে সকলে। ততক্ষণে অনুপমা পৌঁছে গেছেন স্কুলে। গেছেন মানে কদিন আগে অব্দিও যেতেন। ঘুম থেকে উঠেই চা বিস্কুট খেয়ে নিজের টিফিন নিজেই তৈরি করে নিতেন। দু-চার পিস্ মাখন পাঁউরুটি, একটা ডিমসেদ্ধ বা কলা ব্যস্। স্বামী বেঁচে থাকতে অবশ্য তাঁর জন্যও এক কাপ চা বানাতে হত। মারা যাওয়ার আগে, শেষ দুটো বছর, কে জানে কেন সমীরণও উঠে পড়তেন তাড়াতাড়ি। বেলা না বাড়া পর্যন্ত বাইরের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারটায় বসে থাকতেন চুপটি করে। সেও তো প্রায় বছর দশেক আগের কথা।

সমীরণ তখন মাঝে মাঝেই গজগজ করতেন,— এখনও তোমাকে নিজে চা তৈরি করে খেয়ে বেরোতে হবে কেন?

—কি করব? ভাল একটা রাতদিনের কাজের লোক আর পাচ্ছি কোথায়?

—কেন? খোকনের বউ উঠে একটু করে দিতে পারে না?

শুনে অনুপমা চোখ পাকাতেন,—আস্তে বলো শুনতে পাবে।

—শুনুক। শাশুড়ি উঠে সকালবেলা এতগুলো কাজ সেরে চাকরি করতে বেরোবে···

—থামো তো। নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন তো একটু বেলা অব্দি ঘুমোবেই।

—নতুন আর কোথায়! বছর তো ঘুরতে চলল!

— বারে, বছর ঘুরলেই বুঝি নতুন পুরনো হয়ে যায়?

সমীরণ হেসে ফেলতেন। হাসতে হাসতেই একটা সিগারেট থেকে আরেকটা সিগারেট ধরাতেন,—তাহলে আমরা দুমাসেই পুরনো হয়ে গেছিলাম বলতে চাও?

—আমাদের কথা বাদ দাও।

—কেন? বাদ দেব কেন? আমার সব মনে আছে। যত তোমাকে আটকাতে চাই, তুমি

ছটফট করে মরো। কি, না শাশুড়ি রাগ করবেন, বাড়ির সবাই কি ভাববে…

—বলব না? তোমার মা যা ছ্যার ছ্যার করে কথা শোনাতেন।

—তুমিও তোমার ছেলের বউকে কিছু বলো।

অনুপমা গম্ভীর হয়ে যেতেন,—ছিঃ, তোমার মা বলতেন বলে আমাকেও সেটা রিপিট করতে হবে! তাছাড়া দিনকাল এখন বদলে গেছে। ওভাবে আর বলা যায় না।

—বেশ তো। আমার কি। বুড়ো বয়সেও তবে খেটে মরো।

—খাটছিই তো। যতদিন হাত পা আছে নিজেরটুকু নিজেই করে নেব। আমি কারুর অপেক্ষায় থাকি না।

বলতেন বটে, তবু কখনও কি একবারের জন্যও হু হু করে ওঠেনি মনটা? কে'ই বা কবে তাঁর জন্য কিছু করেছে? সমীরণ যে সমীরণ তিনিও তো কোনদিন মুখ ফুটে বলেননি, তুমি সরো, তোমার টিফিনটা আজ আমি তৈরি করে দিচ্ছি। খোকনও তো এক দিন মুখ ফুটে বলতে পারত,—তুমি আজ রেস্ট নাও মা। আমি ঘরের সব কাজ করে দেব। কেউ বলেনি। অনুপমা যখন চাকরিতে ঢোকেন খোকনের বয়স তখন পুরো দশ। পাকিস্তানের সঙ্গে পুজোর ঠিক মুখে মুখে যুদ্ধ লেগেছিল সেবার। তখন থেকেই তো ঘর বার দুহাতে সামলাতে হয়েছে অনুপমাকে। তাও সে সময় শাশুড়ি ছিলেন, ছোট জা ছিল। দু দুটো আইবুড়ো ননদও ছিল সংসারে। তবু ঘরের কাজে ফাঁকি দেওয়ার জো ছিল না। স্কুল থেকে খেটেখুটে ফিরেও প্রাণ মন দিয়ে সাহায্য করতে হত সকলকে। করতেই হয়। মেয়েদের জীবনটাই যে এরকম। তাদের শরীর শরীর নয়। মনটাও মন নয়। অনুপমারও এ নিয়ে অভিযোগ ছিল না কোন। উল্টে জেদ ছিল। কারুর ওপর নির্ভর করবেন না। করেনও নি। তবুও কেন যে ইদানিং বুকের ভেতর একটা গোপন কান্না দানা বাঁধতে চায়! বড় অর্থহীন মনে হয় সব কিছু। কার জন্য, কিসের জন্য খেটে মরলেন জীবনভর? সমীরণ চলে গেলেন দুম করে। বিনা নোটিশে। ছেলে, ছেলের বউ নিজেদের ঘিরে একটু একটু করে আলাদা পরিমণ্ডল গড়ে তুলল। সংসারও এখন তাদেরই। তাদের ছেলে, তাদের মেয়ে, তাদের নিজস্ব সুখ, দুঃখ, সমস্যা। অনুপমার সেখানে জায়গা কোথায়? জায়গা কি আদৌ কোথাও ছিল? সংসারে? বাইরে? থাকে কি? বৃথাই মানুষ ভাবতে ভালবাসে তাকে ঘিরেই পৃথিবী চলছে। তার জন্যই সূর্য উঠছে। চাঁদ ডুবছে। তার জন্যই বেঁচে আছে প্রিয় পরিজন। ভুল ভুল। এ এক ভয়ানক নিষ্ঠুর ভ্রান্তি।

প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিলের এক কোণায় বসে অনুপমা চা শেষ করলেন। শু-ধু চা'ই। আর কিছু খেতে ভাল লাগছে না। যদি প্রয়োজন হয় সেখানে পৌঁছে কিছু খেয়ে নেবেন। পথ তো বেশি নয়। টারমিনাস থেকে বাসে বসলে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে বড়জোর ঘণ্টাদেড়েক। ভোর ভোরই বেরিয়ে পড়তে পারলে আরও কম সময় লাগবে। ইচ্ছে করলে দুপুরে খাওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারবেন। বেরোনোর আগে শুধু স্নানটা সেরে নেওয়া দরকার।

ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি শাড়ি ব্লাউজ গুছিয়ে নিতে গিয়েও অনুপমা থমকে দাঁড়িয়েছেন। দরজার মাথায়, দেওয়ালে, সমীরণের ছবি। মারা যাওয়ার মাস আট নয় আগে তোলা। বোধহয় খোকনদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীর দিন। অনুপমা স্থির তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। প্রথম প্রথম প্রতিদিন বাসী মালা ফেলে টাটকা মালায় সাজিয়ে দেওয়া হত সমীরণকে। অনুপমাই দিতেন। তারপর কবে থেকে যে মালা পাল্টানোর ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগল! শেষ কবে মালা পরানো হয়েছিল ছবিতে। শুকনো কালো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে অনুপমার

বুকটা হাহা করে উঠল। এরকমই তবে হয়। এভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হয় সকলেই! এমনকি একান্ত প্রিয়জনও! নিজের বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ছাড়া আর মনে পড়েনা তাকে! এত কাল পর এই যে সেদিন হঠাৎই সেই মুখটা মনে পড়ে যাওয়া, সেটাও কি তবে নিজেরই প্রয়োজনে! তাই যদি, তবে তো ওই ছবির মানুষটা, যাঁর সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ঘর করেছেন, সুখ-দুঃখ হাসিকান্না ভাগ করে নিয়েছেন নিজেদের মত করে, যাঁকে ছাড়া আর কাউকেই ভাবতে চাননি কখনও, তাঁর কথাই আগে মনে পড়া উচিৎ ছিল। অথচ সমীরণ নন, ছেলে নাতি নাতনিরাও নয়, আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব কেউ নয়, এমনকি অনুপমার এতদিনকার প্রিয় পরিবেশের ছোট বড়, কোন স্মৃতিও নয়, বিদায়ের মুহূর্তে একচল্লিশ বছর আগের একটা মুখ কেন যে চকিতে ভেসে উঠল মনের পর্দায়! তাও অমন এক ভরাট সভার মাঝে!

স্কুল ছুটির এক পিরিয়ড আগে সেদিন শুরু হয়েছিল অনুপমার বিদায়ী অনুষ্ঠান। ফেয়ারওয়েল। স্কুলের বড় হলঘরটায়, কাঠের ডায়াসের ওপর বসানো হয়েছে তাঁকে। তাঁর দুপাশে স্কুলের বাকি চার সিনিয়ার টিচার। সুষমা, রমা, কেয়া, প্রতিমা। সামনে সাদা টেবিলক্লথ ঢাকা প্রকাণ্ড এক টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ঝাড়। ছাত্রীরা বসেছিল বেশ খানিকটা তফাত থেকে, ডায়াসের নিচে পাতা শতরঞ্চিতে। তাদের পিছনে, আরও দূরে সার সার চেয়ারে বাকি সব শিক্ষিকারা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছোট্ট একটা ফুটফুটে মেয়ে এসে যখন মালা পরিয়ে দিল অনুপমাকে, হাতে তুলে দিল ফুলের তোড়া, সঙ্গে একরাশ বিদায়ী উপহার, তখনও এক অন্য ধরনের আবেগে আচ্ছন্ন ছিলেন অনুপমা। সে আচ্ছন্নতায় শূন্যতাবোধ ছিল। শূন্যতাবোধ? নাকি হাহাকার? হারিয়ে যাওয়ার। ফুরিয়ে যাওয়ার। বাতিল হয়ে যাওয়ার।

মেয়েটি স্টেজ থেকে নেমে যাওয়ার পর সুষমা উঠলেন ভাষণ দিতে। তখনও অনুপমার বুক জুড়ে হাল্কা কুয়াশার মত ভেসে বেড়াচ্ছে শূন্যতাটা। তাঁর আঠাশ বছরের কর্মজীবন কেমন নিবে যাচ্ছে এক ফুঁয়ে। খুব মন কেমন করছে। খুউব। তিনি যে কাল থেকে এই স্কুলের আর কেউ নন এ কথাটা ভেবেও ভাবতে পারছেন না কিছুতেই। ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে আছেন। সুষমা কি যে বললেন কানেই গেল না।

সুষমা বসে পড়ার পর ক্লাস নাইনের সেই মেয়েটি উঠল গান শোনাতে। মেয়েটির গান আগেও কয়েকবার শুনেছেন অনুপমা। ভারী মিষ্টি গলা। প্রথমেই ঢিপ করে তাঁকে একটা প্রণাম করে নিয়ে মেয়েটি খালি গলায় গান ধরল। একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। সব গানই অনুপমার চেনা। বহুবার শুনেছেন। তবু হঠাৎ যে কি হয়ে গেল! প্রতিটি কলি, সুর যেন অনুপমার হৃদয়কে ভেদ করে চলে যাচ্ছিল সেদিন। সব কেমন ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছিল। সব। অনুপমার বর্তমান, অনুপমার অতীত, অনুপমার ভবিষ্যৎ। তিনি শিহরিত হচ্ছিলেন বারবার। গানের সুরে ভাসতে ভাসতে এ কোথায় চলে যাচ্ছেন তিনি। কোন কোন মুহূর্তে গানও তবে পারে জীবনকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে চলে যেতে! নাকি গানটা উপলক্ষ মাত্র! প্রান্ত থেকে প্রান্তে ফেরার এ প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আরও আগে থেকে। কবে থেকে যে শুরু হয়েছিল! সমীরণের মৃত্যুর পর থেকে! না আরও আগে! নাকি সারাটা জীবন ধরেই!

অনুপমা চোখ বুজে ফেলেছিলেন। গাইতে গাইতে মেয়েটি অন্তরা থেকে সঞ্চারিতে যাচ্ছে, সঞ্চারি থেকে অন্তরায়। অনুপমাও ফিরতে থাকলেন। সঞ্চারি থেকে অন্তরায়। শেষ

থেকে শুরুতে। যত নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন, বন্ধ চোখের পাতায় ফুটে উঠছে সে। বহু দূর থেকে যেন ডাকছে,—চিনতে পারছ অনু?

অনুপমা মনে মনে উত্তর দিলেন,—পারছি। তুমি কি আছ এখনও? কোথায় আছ?

সে বলল,—তোমার মনেই আছি। নিবিড় নিশীথ পূর্ণিমা নিশীথিনী সম···

গান শেষ হয়ে গেল। মেয়েটি আবার কাছে এল অনুপমাকে প্রণাম করতে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও অনুপমা মেয়েটির নাম কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। কি যেন? কি যেন? অনন্যা? না অপরূপা? মেয়েটির মাথায় হাত রেখে গাঢ় চোখে তাকিয়ে থাকলেন শুধু। আঃ, কি সুন্দর মনভোলানো গন্ধ যে সতেজ কিশোরীর গায়ে!

রমা কানের কাছে মুখ নিয়ে এল,—অনুপমাদি, এবার আপনি আমাদের কিছু বলুন।

অনুপমা ফিসফিস করে উঠলেন,—কি বলব?

—বারে, যাওয়ার আগে শেষ কথা বলবেন না আমাদের?

অনুপমা সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠেছেন। শেষ কথা কি বলা যায় কখনও? চাইলেও কি বলা হয়ে ওঠে?

কথাগুলো কি সেদিন সত্যি সত্যি সহকর্মীদের বলে ফেলেছিলেন অনুপমা? নাকি মনে মনেই উচ্চারণ করেছিলেন? মনে পড়ছে না। মাত্র কদিনেই স্মৃতি বড় ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। একচল্লিশ বছর আগের মুখ ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। ছিয়ানব্বই ঘণ্টা আগের কথা মনে নেই।

একচল্লিশ বছর আগের মুখ বলছে,—তোমাকে যে আমার একটা কথা বলার ছিল অনু।

একচল্লিশ বছর আগের অনুপমা কাঁপছেন থিরথির করে। সেদিনই তাঁকে আশীর্বাদ করে গেছেন সমীরণের বাড়ির লোকেরা। আগামী তেইশে শ্রাবণ তাঁর বিয়ে। তবু থর থর স্বরে প্রশ্ন করে ফেলেছেন,—কি কথা?

—থাক্। আর বোধহয় বলার সময় নেই।

অনুপমা আরেকবার তাকালেন সমীরণের ছবির দিকে। বৌমার পাঠানো খবর পেয়ে স্কুল থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন, তখন প্রায় সব শেষ। সমীরণের শরীর নিশ্চল হয়ে এসেছে, দৃষ্টি অস্বচ্ছ। ঠোঁটদুটো খালি কেঁপে চলেছে অবিরাম।

বৌমা ডুকরে উঠেছিল,—বাজার থেকে ফিরে বাবা হঠাৎ ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। প্রচণ্ড ঘামছিলেন। নিশ্বাস নিচ্ছিলেন জোরে জোরে। আমি দৌড়ে আসতে কোনরকমে শুধু বলতে পারলেন মাকে ডেকে আনো। ব্যস্, তারপরেই আর কিছু বলতে পারলেন না।

অনুপমা স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন,—কি কষ্ট হচ্ছে বলো।

সমীরণ অস্ফুট স্বরে কি যে বলতে চাইছিল। অনুপমা বুঝতে পারলেন না। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার পর আরও একটা দিন বেঁচে ছিলেন সমীরণ। সারাক্ষণ ধরে ঠোঁটদুটো তাঁর শুধু কেঁপেই গেছে। শেষ কথাটা কিছুতেই বলতে পারেননি।

অনুপমা কপাল টিপে ধরলেন। সমীরণের ওই শেষ কথা বলতে না পারা, ষাট বছর বয়সে পৌঁছে অনুপমার এই ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়, জীবন থেকে বাতিল হওয়ার মুহূর্তে ওভাবে একচল্লিশ বছর আগের একটা মুখ মনে পড়ে যাওয়া, যাকে এত দিন ধরে তেমন ভাবে মনে পড়েনি কখনই, এই সব কিছুর সঙ্গে কোথাও একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে কি? কোন শেষ কথা শোনার তাড়না? হয়ত ভুলে গেছে কথাটাকে। ভুলতেই পারে। একচল্লিশ বছর যে বড় দীর্ঘ সময়। তবু অনুপমা যাবেন একবার শেষ বারের মত তার সামনে গিয়ে

দাঁড়াবেন। প্রশ্ন করবেন,—কি বলতে চেয়েছিলে সেদিন আজ বলো।

ভীষণ অবাক হয়ে যাবে সে,—তুমি এতদিন পর জানতে এলে! এই বুড়ো বয়সে!

অনুপমা কি উত্তর দেবেন?

বাথরুমে স্নান করতে ঢুকে অনুপমা ঠিক ঠাক গুছিয়ে নিতে চাইছিলেন নিজেকে। দেখা হবে তো শেষ পর্যন্ত? দাদা মারা যাওয়ার পর ভাইপোরা যখন বাড়ি বিক্রি করে চলে এল, তখনও তো সে ওখানেই ছিল। খোকনের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে শেষ বার যখন গিয়েছিলেন ওখানে, তখনও দেখা হয়েছে। ছেলের বিয়ের কার্ড তার হাতে দিয়ে অনুপমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আসবে তো?

ক্লিষ্ট হাসি হেসেছিল সে,—যেতে তো খুবই ইচ্ছে করে। শরীর দেয় না। কোমরের যন্ত্রণাটায় বড় কাবু হয়ে পড়েছি।

—রিটায়ার করে গেছ?

—নাহ্। আর বছর তিনেক বাকি আছে। অফিসটা যাই কোন রকমে।

সমীরণ বলেছিলেন,—যদি আসতে পারেন খুব ভাল লাগবে।

আসেনি। অনুপমারও একবারের জন্য মনে হয়নি তার কথা। মনে হওয়ার তো কারণও ছিল না কোন। স্বামী সংসার নিয়ে যাঁর ভরাট সংসার তার তো পুরনো কোন মুখ, যা শুধু তাঁর কাছে একটা মুখই ছিল মাত্র, তা মনে পড়ার কথাও নয়। সমীরণ মারা যাওয়ার পরও মনে পড়েনি কোনদিন। তবু কেন যে সেদিন… !

স্নানটান সেরে অনুপমা যখন তৈরি হয়েছেন বেরোনোর জন্য, শেষ বসন্তের সকাল তখন বেশ ঘন হয়ে গেছে। নাতি নাতনি দুজন তৈরি হচ্ছে স্কুলে বেরোনোর জন্য। বৌমা ব্যস্ত তার নিজের সংসার নিয়ে। খোকন খবরের কাগজ পড়ছে তার বাবার ইজিচেয়ারে বসে। ইদানিং খোকনের হাবভাব কেমন যেন সমীরণের মত হয়ে যাচ্ছে। চেয়ারে ওই বসে থাকার ভঙ্গিটাও। সমীরণের গলাতেই খোকন অনুপমাকে প্রশ্ন করল,—ফিরছ কখন?

অনুপমা সিঁড়ির ধাপিতে একটু দাঁড়ালেন,—দেখি।

—কোথায় যাচ্ছ তাও তো বলে গেলে না।

অনুপমার বলতে ইচ্ছে করল, যাচ্ছি নারে, ফিরছি।

কিছুই বললেন না। সমীরণের থেকেও বেশি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত খোকনের দিকে তাকিয়ে আলগা হাসলেন মাত্র।

দুই

শেষ এসেছিলেন এগারো বছর আগে। বাপের বাড়ির পাট এখান থেকে উঠে যাওয়ার পর এদিকে আর আসা হয়নি। বাস থেকে নেমে তাই বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন অনুপমা। মাত্র এগারো বছরের অদর্শনেই কত বদলে গেছে জায়গাটা! বাসস্ট্যান্ডে আগে একটা বিরাট মিষ্টির দোকান ছিল, পাশে সেই কবে থেকে দেখা সেলুন, সাইকেল সারানোর ঘর। কিছু নেই। তার জায়গায় উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রাক্ষুসে বহুতল অট্টালিকা। সরু গলিটাও কত চওড়া হয়ে গেছে। সাইকেল রিক্সায় বসে সব কিছুই কেমন অচেনা লাগছিল অনুপমার। ফুটবল খেলার মাঠটা কোথায় গেল! ঘোষেদের পুকুর! এত সব ফ্ল্যাট বাড়িই বা উঠল কবে! এতটা পথ চলে এলেন ; একটাও চেনা মানুষ নজরে পড়ল না। অনুপমা ক্রমে শঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন। চৈত্রের দামাল বাতাসে রিক্সার গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে, রোদ ঝমঝম রাস্তায় ধাতব চাকা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে প্রশ্ন করছে কোথায় এলে? যাচ্ছ কোথায়? ক্ষণিকের

জন্য অনুপমার মনে হল রিক্সাওলাকে বলেন ফিরে যেতে, পরক্ষণেই এক তীব্র ঝাঁকুনি। বাঁকের মুখে গাড্ডায় পড়ে রিক্সা লাফিয়ে উঠেছে। অনুপমারও হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। চাপা উত্তেজনায় রিক্সার হাতল খামচে ধরেছেন। ওই তো তাঁর পরিচিত বটতলা, মোড়ের মাথায় শৈশবের শিরিষ গাছ। ওই তো দেখা যাচ্ছে তাঁদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িটা। রঙ বদলে গেলেও বাড়িটা আছে। অনুপমা বড় করে শ্বাস টানলেন। এখনও সব হারায়নি তাহলে! অনুপমা লক্ষ করলেন তাঁদের বাড়ির পিছন দিকের বাড়িটাকেও দেখা যাচ্ছে এবার। বিসদৃশ ভাবে প্রাচীন বাড়ির গা ঘেঁসে নতুন এক ইমারত। রিক্সা পুরো একটা চক্কর মেরে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

রিক্সা থেকে নেমে পুরনো আমলের লোহার দরজাটার সামনে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার পাশে কাঠের লেটার বক্সে পর পর নামের সারি। তার সব ভাইপোদের নাম। তার নাম কোথায় গেল। অনুপমার বুক ধড়ফড় করে উঠল। হঠাৎই বেশ জোরে কড়া নেড়ে ফেলেছেন।

ভিতর থেকে বৃদ্ধা কণ্ঠ শোনা গেল,—কে এএএ?

কে তিনি! কি জবাব দেবেন অনুপমা!

অনুপমার জবাবের আগেই অবশ্য দরজা খুলে গেছে।

—কাকে চাই? বলতে গিয়েও চিনেছেন ভদ্রমহিলা। মুখের প্রশ্ন মুখেই রয়ে গেল। অবাক দৃষ্টি স্তব্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য।

অনুপমা মৃদু হাসলেন,—চিনতে পারছ না বৌদি?

স্তব্ধ চোখে সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটেছে,—ওমা, চিনব না কেন! এসো ভেতরে এসো।

বৌদি হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছেন অনুপমাকে। বাড়িটা এখনও সেই একই রকম আছে। তবে সাবেকী আমলের বাড়ি-ভেঙে গেছে আরও। দেওয়াল দরজার অবস্থা জীর্ণতর।

—এদিকে তো আর আসোই না তোমরা!

অনুপমা উত্তর দিলেন না। উৎসুক চোখ এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে বারংবার। সে কি তবে নেই। বাড়িটা অসম্ভব ফাঁকা ফাঁকা। এত ফাঁকা যে দালান, উঠোন সব কিছুকেই বড় বেশি দীর্ঘ মনে হচ্ছে। বৌদির ঘরে ঢোকার আগে অনুপমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল,—বাড়িতে কেউ নেই বৌদি?

—না ভাই। এখন আর কে থাকবে বলো। ছেলেরা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। বাচ্চারা স্কুলে। আর বৌমারা তো দোতলা থেকে নামেই না বড় একটা।

—তুমি একাই নিচে থাকো!

—হ্যাঁ ভাই, তোমার দাদা মারা যাওয়ার পরে এই নিচেই আমার স্থান হয়েছে। বুড়ো হলে মানুষের তো এই দশাই হয়। চৌকিতে পাতা জীর্ণ এক বিছানায় বসে অনর্গল বকবক করে চলেছেন বৌদি,—ছেলেরা দোতলায় যে যার মত ভিন্ন হয়েছে এখন। আমি আছি আমার মত। বলতে বলতে চোখ মুছলেন,—দুঃখের কথা আর কত শুনবে বলো। বাদ দাও। তুমি কেমন আছ বলো? এখনও ইস্কুলে পড়াচ্ছ?

—না। রিটায়ার করেছি। চার দিন।

—ও। বৌদি আবারও চোখ মুছলেন,—ঠাকুরজামাই মারা যাওয়ার খবর কার মুখ থেকে যেন শুনেছিলাম। আহা, বড় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

অনুপমা মাথা নামালেন। ভার জমেছে বুকে।

—ছেলে বৌ সব ভাল আছে তো? নাতি নাতনি কটি তোমার?

—দুটি। অনুপমা দায়সারা উত্তর দিলেন। কথা বলতেও ভাল লাগছে না। বৌদি এত কথা বলছে, কেন একবারও তার কথা বলল না?

—তোমার ন্যাওটা হয়েছে তারা? কাছে আসে? আমার ছোট নাতনি তো ঠাম্মা বলতে অস্থির। কিন্তু মেজ বৌ কিছুতেই তাকে আমার কাছে আসতে দেয় না। বলে বুড়িদের সঙ্গে মিশলে নাকি বাচ্চাদের অভ্যেস খারাপ হয়ে যায়। কেন রে, আমাদের সময়ে কি ঠাকুমা দিদিমা ছিল না? আমরা তো···

কথাগুলো অনুপমার আর কানে যাচ্ছে না। নীরবে একটা ভাঙা বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আর্তনাদ শুনছেন শুধু। কি দাপট ছিল বৌদির একসময়। কী মুখ। কারণে অকারণে তাঁদেরকেও কত সময় মুখঝামটা দিয়েছেন। সাত বাড়ি ঘুরে নিজের রান্নার সুখ্যাতি নিজেই শোনাতে শোনাতে পাগল করে দিয়েছেন সকলকে।

অনুপমা কথা বললেন এতক্ষণে,—তা রান্নাবান্না কি এখনও তোমার ঘাড়ে?

পলকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৌদির মুখ, পর মুহূর্তেই মলিন,—ছেলেদের আর সে কপাল কি আছে যে আমার রান্না খাবে! এখন সব চাউমিন, রোল এসবের যুগ। ওসব কি আর আমরা পারি। তোমার দাদার পেনশানের টাকা কটা আছে, আর এক ন্যালাক্ষ্যাপা দেওর। আমরা দুজনে নিচতলায়···যে লোকটা ওদের জন্য বিয়ে পর্যন্ত করল না, ভাইপো ভাইঝি বলে সারা জীবন অস্থির, তাকেও পৃথক অন্ন করে দিল!

কে জানে কেন বুকের ভিতর একটা সূঁচ বিঁধছে অনুপমার। ভাইপো ভাইঝিদের জন্যই কি বিয়ে করেনি লোকটা! নাকি অন্য কারণ ছিল! হয়ত বা অনুপমার জন্যই···! সূঁচ বেঁধার যন্ত্রণা ধীরে ধীরে গোপন অহংকারে ভরে যাচ্ছে। হাসিও পেয়ে গেল। তার জন্য সে বিয়ে করেনি এই চিন্তাটা কি বেশি বাড়াবাড়ি নয়। যে রকম খেলাপাগল, মাঠপাগল ছিল সে। হয়ত বা সেজন্যই বিয়ের কথা ভাবেনি কখনও। পাড়ার ফুটবল টিম নিয়ে সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই, হুঁশ তালহীন আধপাগল থাকত একসময়। খেলা নিয়ে একবার অফিসেও কি একটা গণ্ডগোল হয়েছিল না! যখন তখন কাউকে না বলে অফিস থেকে পালিয়ে আসা···। সে প্রায় চাকরি যায় যায়! দাদার মুখে অনুপমা শুনেছিলেন একবার।

অনুপমা জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার দেওর আজকাল আর মাঠে যায় না! ওকে ছাড়া এখন পাড়ার ফুটবল ক্লাব চলে?

—সব চলে রে ভাই। সব চলে। ওই কোমরের ব্যথাটা এত বেড়ে উঠল যে মাঠের নাম পর্যন্ত ভুলতে বাধ্য হল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্কও নেই আর। তারা ক্লাবে ঘেঁসতেও দেয় না। বুড়ো থাকলে বিড়ি সিগারেট খেতে অসুবিধে হয় তাই বোধহয়।

অনুপমা হেসে ফেললেন,—তোমাকে ছেলেরা বলেছে বুঝি?

—ছেলেরা কেন বলবে? ঠাকুরপোই গজগজ করে। ছুতোনাতায় ক্লাবের পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ঝগড়া করে ছেলেগুলোর সঙ্গে।

এবার একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন অনুপমা। পাড়ার ছেলেরা উদ্দাম চিৎকার করছে··হা হা আনন্দধ্বনিতে গোটা অঞ্চল দুলে দুলে উঠছে··নীল হলুদ জার্সিপরা একজনকে কাঁধে নিয়ে ঘুরছে একদল বুটপরা জার্সি গায়ে যুবক। কাঁধের মানুষটার হাতে এক বিশাল সোনালি রঙের ট্রফি। পাড়ার সমস্ত জানলা দরজায় অসংখ্য চোখের ভিড়। সকলে একজনকেই

দেখছে।

কত দিন হবে? পঁয়তাল্লিশ বছর? তেতাল্লিশ বছর? সদ্য তখন শাড়ি ধরেছেন অনুপমা। জোড়া বিনুনি ময়াল সাপের মত পিঠ ছাপিয়ে কোমরের কাছাকাছি। অন্যমনস্কভাবে মাথায় হাত চলে গেল অনুপমার। ময়াল সাপ দুটো এখন একটা টিকটিকির লেজ।

ভাবতে ভাবতেই বাইরে থেকে একটা কাশির শব্দ ভেসে এসেছে। ঘড়ঘড়ে, শ্লেষ্মা জড়ানো। অনুপমা টান টান হলেন।

বৌদি বললেন,—ওই ঠাকুরপো এল বোধহয়। বাজার সেরে ব্যাংকে যাবে বলেছিল।

লোকটা ঘরে ঢুকতে অনুপমা চমকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এগারো বছর আগেও এরকম চেহারা তো ছিল না! পোশাক আশাকেরও না। গাল দুটো তোবড়ানো বাটির মত ঢুকে গেছে, মাথায় একটাও চুলের চিহ্ন নেই, ভুরু জোড়া সাদা, খাড়া খাড়া, চোখের মণিও নিষ্প্রভ। লুঙ্গিটা ময়লা। জামাটাও।

ঘরে ঢুকে বেশ খানিকক্ষণ পরে সে চিনতে পেরেছে অনুপমাকে। হাতের থলি বৌদির হাতে দিতে দিতে বলছে,—অনু যে! কতক্ষণ! এদিকে হঠাৎ!

অনুপমা ঢোঁক গিললেন,—এমনিই এসেছিলাম। তোমাদের সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। তোমার জন্যই তো কতক্ষণ ধরে বসে আছি।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সে হাসল আলতো,—আর বোলো না, কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার, কবে একটা সাত পারসেন্ট ডিএ বেড়েছে, এখনও ব্যাংকে তার খবর আসেনি। সেই নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে···বলতে বলতে থমকেছে একটু,—তারপর তোমার আর কদ্দিন?

জিজ্ঞাসার ভঙ্গি দেখে অনুপমা হেসে ফেললেন ফিক করে। কিশোরীর মত। হাত উল্টে বললেন,—নেই। রিটায়ার করে গেছি।

অনাবিল হাসিতে তোবড়ানো গাল আরও বীভৎস হয়ে গেল,—এবার বুঝবে ঠেলাটা। আমাদের তাও গরমেন্ট সার্ভিস ছিল, দু আড়াই বছরের মধ্যে জোটানো গেছিল টাকা পয়সা। প্রভিডেন্ট্ ফান্ড থেকে আগে নন্‌রিফান্ডেবল্ লোন নিয়ে নিয়েছ তো?

অনুপমা ঘাড় নাড়লেন,—না, তোলা হয়নি।

—তবে গেছে। এবার প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে কটা জুতোর সুকতলা যায় দ্যাখো। তোমাদের তো আবার স্কুল। সার্ভিস বুক টুক ঠিকঠাক আছে তো?

—আছে বোধহয়। অত খেয়াল করিনি।

—খেয়াল করোনি! উত্তেজনার দমকে আবার কাশতে শুরু করল সে। কাশি সামলে বলল,—পেনশান গ্র্যাচুয়িটি পেপার তৈরি হতে হতেই তো তোমার জীবন কাবার হয়ে যাবে।

খাড়া খাড়া ভুরু চাপা ধূর্ততায় কাঁপছে টিপটিপ,—আমি তো রিটায়ারমেন্টের এক বছর আগে থেকে সব কাগজপত্র তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। ওই তো বারীন, যে তোমাদের পাশের বাড়িতে থাকত, কত হাসত আমাকে নিয়ে, ও তো পেনশান হাতে আসার আগে মরেই গেল।

বারীনের মুখটা অনুপমার চোখের সামনে এসেই মিলিয়ে গেছে। নীল সাদা জার্সির মুখে এখন এই সব কথা একদম ভাল লাগছিল না তাঁর। চাকরি, পেনশন, রিটায়ারমেন্ট, প্রভিডেন্ড ফান্ড, এর বাইরে কি আর কোন পৃথিবী নেই তার। অনুপমা কথা ঘোরাতে চাইলেন,—বৌদি বলছিল তোমার কোমরের ব্যথাটা আরও বেড়েছে? ডাক্তার দেখাচ্ছ?

—ওই একজন শখের হোমিওপ্যাথকে দেখাই আর কি। আমাদের পার্কের আড্ডায় আসে। রিটায়ারমেন্টের পর থেকে বই পড়ে পড়ে ডাক্তারি শিখে ফেলেছে। ব্যথা কমে না তবে ভিজিটের পয়সাটা বেঁচে যায়।

বৌদি অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠলেন,—ওই তো এখন করতে হবে। যা কিছু পয়সা হাতে এসেছিল, বললাম রেখে দাও, তা না করে দোতলাব ঘরগুলোর পেছনে একগাদা পয়সা ঢেলে বসল…

—বাজে বোকো না তো। হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠেছে সে। অনুপমা স্পষ্ট দেখতে পেলেন তার এক রাশ নোংরা দাঁতের মাঝে চারটে দাঁত চকচক করছে। বাঁধানো। কী বেমানান!—যাও না, একটু চা করে নিয়ে এসো না। বাঁধানো দাঁত বুজে গেল।

অনুপমা বলতে গেলেন, আমি চা খাব না, তার আগেই বৌদি উঠে গেছেন ঘর থেকে।

—তোমাদের কাগজপত্র তো সব ডি পি আই অফিসে তৈরি হয়, তাই না?

সমীরণ বেঁচে থাকলেও কি এই সব কথাই বলতেন এসময়? হয়ত বলতেন। হয়ত বলতেন না। রিটায়ারমেন্ট নিয়ে মানুষটার মধ্যে কোনো ভাবনা চিন্তার ছায়াও অনুপমা দেখতে পাননি কোনদিন। কে জানে সেজন্যেই হয়ত অত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সমীরণ। অনুপমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপলেন। নিঃশব্দ হয়ে গেলেন আচমকা।

হঠাৎই যেন ঘরের ভিতর সব কথা ফুরিয়ে গিয়ে থমথমে চতুর্দিক। চৈত্রের উত্তাপ বাইরে থেকে মৃদু ভাবে ঢুকে পড়েছে ঘরে। সেই তাপে মনটাকে সেঁকতে চাইছিলেন অনুপমা। কথা খুঁজছেন,—মনে পড়ে কি পাগলের মত ফুটবল খেলতে তোমরা ওপাশের মাঠটায়? চোখের মণিতে কোন ভাবান্তর ঘটল না লোকটার,—হুঁ। ও মাঠে তো এখন গাঁজার ঠেক হয়েছে।

আবার গোটা ঘর নিস্তব্ধ। আরও থমথমে। সেই গাঢ় থমথমে ভাব চেপে বসেছে অনুপমার বুকে। নীরবতাটা যেন আষ্টেপৃষ্টে ফাঁসের মত তাঁকে জড়িয়ে ধরছে। সেটা কাটাতেই বুঝি ফের বলে উঠলেন,—সারাটা দিন তোমার কাটে কি করে?

আনমনে জামার পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করল সে,—কি জানি! কেটে তো যায়। বৌদির সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করি। কচিৎ কখনও দোতলায় গিয়ে একটু কথাবার্তা বলি। নয়ত…নয়ত…টিভি…টিবি… রেডিও…

অনুপমার মনে হল লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুতেই দিনগুলোকে মনে রাখতে পারছে না। ভাগ্যিস অনুপমার ছেলে ছেলের বৌ নাতি নাতনিরা এখনও তাঁকে অসহ্য ভাবতে শুরু করেনি!

বৌদি চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন,—তোমাকে একটু চিনি কম দিয়েছি, দ্যাখো ঠিক হয়েছে কিনা।

অনুপমা কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালেন,—ঠিক আছে। আমি চিনি কমই খাই। তুমি বরং তোমার দেওরকে দ্যাখো। একসময় মোড়ের দোকানে বাজি রেখে রসগোল্লা খেত।

শীর্ণ গালে হাসি ফুটল কি একটু? অনুপমা বুঝতে পারল না।

—বৌদি বললেন,—সেই জন্যই তো ওর হাইসুগার।

লোকটা কথা ঘোরাল। অনুপমার দিকেই তাকিয়েছে,—তোমার নাতি নাতনি সব কত বড় হল?

অনুপমা বললেন,—নাতি ক্লাস থ্রি। নাতনি ওয়ান।

বৌদি বলে উঠল,—ছেলের বৌ যত্ন আত্তি করছে?

অনুপমার বুকটা চিনচিন করে উঠেছে। খোকনের বউ এত শান্ত ভদ্র অথচ কী নিরুত্তাপ। কোন কোন সময়ে মনে হয় নিষ্প্রাণ অনুভূতিহীন একটা দমদেওয়া কলের পুতুল মাত্র। অসম্মান করে, না যত্ন আত্তি করে নিজেই এখনও বুঝে উঠতে পারলেন না। মুখে বললেন,—ভাল। ভালই তো।

লোকটা খাটের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজের পাতা নিজের মনে উল্টোচ্ছে এবার। যেন খবরের কাগজ নয়, কোন এক অজানা শিলালিপির দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ নিপুণভাবে কাগজটাকে ভাঁজ করে সরিয়ে দিল।

বৌদি খালি চায়ের কাপ নিয়ে নিলেন অনুপমার হাত থেকে,—তোমরা কথা বলো। আমি এক্ষুনি আসছি।

কি কথা বলবেন অনুপমা? বলবেন, চারদিন আগে ফেয়ারওয়েলে এক ছাত্রীর গলার গান শুনতে শুনতে মনটা হঠাৎ উল্টোদিকে দৌড়েছিল। বলবে সেই মুহূর্তে স্বামী নয়, ছেলে নয়, নাতিনাতনি নয়, এই লোকটার কথাই ভাঙা রেকর্ডের মত করকর করে বাজছিল বুকের ভিতর। অথবা কোন ছোট বড় সুখ দুঃখের স্মৃতির কথা তুলবেন? অথবা সেই একমাত্র কথা, যেটা শুনতে আসা এই একচল্লিশ বছর পরে? তাঁর স্বামী কি যেন তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন, পারেননি। হয়ত তেমন কোন কথাই ছিল না। সবটাই অনুপমার মনের ভুল।

একসময় অনুপমা উঠে দাঁড়ালেন,—চলি বেশি দেরি করলে বাড়িতে ভাববে আমি বোধহয় চাকরি ছাড়ার পর বিবাগী হয়ে যাচ্ছি।

লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখের হাবভাব একটু যেন শিথিল,—বোসো বোসো। কেউ কিছু ভাববে না। সবে তো এখন সাড়ে এগারোটা।

—দেড়ঘণ্টা লেগে যাবে ফিরতে। নিজের কথাটা নিজের বুকেই ধাক্কা মারল অনুপমার। মাত্র দেড়ঘণ্টায় একচল্লিশ বছর আগে থেকে কি বর্তমানে ফিরতে পারে কেউ?— বৌদিকে বলে দিও আবার সময় পেলে আসব।

এখন তো তোমার সময়ই সময়, অঢেল সময়। ইচ্ছে করলেই চলে আসতে পারো।

—তাই বইকি। সংসার নেই, নাত্তি নাতনি নেই, হুটহাট করে ঘুরে বেড়ালেই হল?

অত সংসারে জড়িয়ে পড়ো না অনু। লোকটার ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বরে এই প্রথম এক মায়াবী বিষণ্নতার ছোঁয়া এসেছে। ঝপ করে বলে বসল,—তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। বলব?

অনুপমা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। এক দৃষ্টে লোকটার চোখের কোণের শীর্ণ শিরাটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

—কিছু মনে করো না অনু, একটা প্রশ্ন করছি সমীরণবাবু নিশ্চয়ই কিছু টাকাপয়সা রেখে গেছেন তোমার জন্য?

অনুপমা থতমত মুখে বলে উঠলেন,—তেমন কিছু না।

—তাহলে বলি, টাকাপয়সা যা পাবে, সাবধানে রাখবে। নিজের নামে। আবেগের মাথায় ছেলের হাতে তুলে দিও না। দিলেই পস্তাতে হবে আমৃত্যু আমার মত।

অনুপমা কিছু বলতে পারলেন না। না বলা কথা একচল্লিশ বছর পরে দুমড়ে মুচড়ে তবে কি এরকমই একটা কথা হয়ে যায়! নাকি যে কথা থেকে যায়, সে কথা নিজে নিজেই মরে যায় একদিন!

অনুপমা বাইরে এসে ছাতা খুললেন। রোদ্দুরটা বড় চড়া। অনেকটা পথ যেতে হবে আবার।

দ্রৌপদী

জয়া মিত্র

আজ রবিদা ফিরে এলেন।

বাড়িতে আজ দুপুর থেকে সবার চেহারায় স্বস্তি। মুখে হাসি। মা রান্নাঘরে দারুণ ব্যস্ত হয়ে আছে। শীলা রবিদার প্রায় পিঠের ওপর চড়ে গল্প শুনছে দু'মাস কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, কি কি দেখেছেন। পাঁচবছর আগে আমিও ঠিক ওরকম করতাম। ট্যুর থেকে ফিরলেই 'বলো বলো' শুরু করতাম। আজ রবিদা নিজে একটু গম্ভীর হয়ে আছেন কি? মা একবার চা করে পাঠিয়েছে। আর একবার করে নিয়ে বোধহয় নিজেই আসবে। মানালি সকালে স্কুল থেকে ফিরে বাবাকে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছিল। ও তো ছ'বছরের বাচ্চা হিসেবে এমনিই খুব শান্ত, শুধু চোখদুটো যেন একেবারে আলোয় ভরে গেল বাবাকে দেখে। কুকু যেমন গায়ে মাথায় ওঠে, বক্‌বক্ করে অস্থির করে দেবে মানালি ঠিক তার উল্টো। আস্তে আস্তে জুতোমোজা খুলল, ঘরে ঢুকে স্কুলের জামা ছাড়ল, চোখটা কিন্তু বাবার দিকেই সেঁটে আছে। রবিদা ডাকতে কাছে গেল। এখন কুকুর পাশাপাশি কোলে উঠে দুজনে বাবার বুকের মধ্যে ঢুকে বসেছে। আহা, ওরা তো বুঝিয়ে বলতে পারে না ; এই যে এতদিন বাবা ছিল না তাতে ছোটছোট বুকগুলোর মধ্যে কতো কষ্ট হয়েছে। আমার কাছেও ওরা ওরকমই নিশ্চিন্তে থাকে কিন্তু ওদের যে কোথায় কষ্ট হয় আমরা বড়োরা কি সবসময়ে বুঝি। কেই বা বুঝতে পারে অন্যের মনের অবস্থা। সবাই নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই ভালোমন্দ সুবিধা অসুবিধা বিচার করে।

ঠিকই ভেবেছিলাম, ট্রেতে চায়ের কাপ বসিয়ে দিয়ে মা নিজেই এই ঘরের দিকে আসছে। দুপুরে রবিদা খেয়ে উঠে মানালি আর কুকুকে নিয়ে ঘুমিয়েছেন। রোগা হয়ে গেছেন খানিকটা। মা সারাদিনে সাধারণ কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর প্রায় কোন কথা বলে নি রবিদার সঙ্গে। এখন হয়তো বসে কিছু কথা বলবে। শীলাকে বলল শুকনো জামাকাপড় ভাঁজ করে আলনা গোছাতে। শীলা কি বুঝল কে জানে, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা রবিদার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে ভিজে ভিজে গলায় বলল,

কি চেহারা করেছিস! আমায় এত শাস্তি তোরা দিচ্ছিস কেন!

মা রবিদাকে সত্যিই খুব ভালোবাসে। সব সময়েই তো মাকে বলতে শুনছি, সবাই শুনেছে, রবি তো আমার পেটের ছেলের মতো।

ছেলের মত! সত্যিই কি মা কখনো ভেবেছে সেরকম ভাবে? ছেলের মত'টা কেবল একটা কথার কথা। 'ছেলের মত' আর সত্যিকারের ছেলেতে কতো তফাৎ—কেউ ভাবে কখনো? আমরা, আমি আর শীলা ছোটবেলা থেকে তো এটাই শিখেছি, জেনেছি রবিদা আমাদের নিজেদের দাদার মত। কিন্তু সত্যি তো নিজের দাদা নয়।

রবিদা আমাদের জামাইবাবু।

আমাদের বাবা আর দাদা যখন গাড়ি এ্যাক্সিডেন্টে মারা যান তখন আমার বয়স ছিল নয়, আর শীলার পাঁচ। দিদি আমার চেয়ে বারোবছরের বড়। ঠিক তার এক বছর আগে দিদির বিয়ে হয়েছে। মেজদি, আমি আর শীলা—মাকে মনে হয়েছিল বাঁচবেই না আর। আমরাও

তো ছোট তখন। মরা বললে কীই বা বুঝি। বাবা ব্যবসার কোন কাজে নাকি কোডারমা যাচ্ছিলেন, শরীর ভালো ছিল না বলে মা জোর করে দাদাকে সঙ্গে দিয়েছিল। বাবা আর দাদা কোথাও নেই—এই ব্যাপারটা আমাদের মাথায় ঢুকছিলই না। কষ্টের চেয়ে বেশি করে ভয় করছিল। নয় বছরের বোঝা না-বোঝা মিলিয়ে কেমন মনে হচ্ছিল আমরা যেন খোলা একটা কোথায় পড়ে আছি, ঘর বাড়ি কিছু যেন নেই। মা তো কেবলই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে আর জ্ঞান ফিরলেই চিৎকার করে উঠছে। আমার মনে হচ্ছিল মাও মরে যাবে। মেজদি একবার মায়ের মুখে চোখে জল দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরছিল, একবার শীলাকে । আর সারাক্ষণ কাঁদছিল। লোকেরা বলাবলি করছিল বাবা আর দাদাকে হাসপাতালে এনে রাখা হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র, কিন্তু সেই ভয়, কষ্ট, অসহায়তা কোনদিন ভুলব না। এখন মনে হয়, তখনই কেন মরে যাইনি কিংবা সেদিন যদি ওই বিপদের মধ্যেই থাকতাম, কোনরকমে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে খুব কষ্ট করে বড় হতাম যদি, তাই হয়ত ভালো ছিল। অতোবড়ো বিপদের পরও এতো যত্নে এতো আনন্দে এতটা বড়ো হয়ে কি হল? কিন্তু সত্যিই কি আমরা আর উঠে দাঁড়াতে পারতাম, মা পারত আমাদের তিনবোনকে একা একা বড়ো করতে যদি দিদি আর রবিদা না এসে পড়ত। কি করে কিসের ব্যবস্থা হয়েছিল জানি না, তারপর থেকে আর বলতে গেলে আমরা রবিদাকে ছাড়া থাকিই নি। মাসখানেকের মধ্যেই বোধহয় সব ব্যবস্থা করে আমাদের হাজারিবাগ থেকে নিয়ে চলে এলেন, স্কুলে ভর্তি করালেন—এমন হৈ চৈ করে মজা করে আমরা থাকতাম যেন বরাবর এরকমই আছি। মা খুব চুপচাপ হয়ে গেছিল কিন্তু রবিদা আর দিদি সবসময়ে মায়ের কাছাকাছি থেকে মাকে অন্যমনস্ক রাখত। আস্তে আস্তে মা আমাদের পড়াতে, পড়া ধরতে শুরু করল। তারপর একটু একটু করে দেখলাম মা আর গাছের দিকে কি আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে না। সন্ধ্যেবেলা রবিদা অফিস থেকে ফিরলে যখন সবাই একসঙ্গে টিফিন খাওয়া হয়, মাও আমাদের কাছে বসে, গান শোনে দু-একটা কথাও বলে কখনও কখনও। আস্তে আস্তে কখন যেন রবিদা আমাদের দাদা আর বাবা দুটো জায়গাই নিয়ে নিল। মেজদির পরের বছরই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা ছিল। পাশ করে হায়ার সেকেন্ডারির জন্য ভালো কলেজে এ্যাডমিশন পেয়ে গেল। ও হোস্টেলে চলে গেল। আমার খুব হোস্টেলে ভয়। একবার কথা হয়েছিল আমাকেও মেজদির সঙ্গে কলকাতার স্কুলের হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়ার। ভয়ে আমি রাতে ঘুমোতে পারতাম না। মাকে, দিদিকে ছেড়ে থাকব ভাবলে মনে হত মরে যাব। সেই বাবাদের খবর আসবার পর যেমন মনে হয়েছিল বাড়িতে থেকেও কোথায় যেন খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছি, হোস্টেলে যাবার কথা ভাবলে ঠিক সেরকম মনে হত। অথচ ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারতাম না, পাছে বড়রা রাগ করে। স্কুলে ইয়ার্লি পরীক্ষা দেবার আগে শেষপর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিলাম। কোন কিছুই প্রায় মনে পড়ত না হল-এ বসে। মনে করার চেষ্টা করলে মাথার মধ্যে কিরকম অস্থির কষ্ট হত। বুঝতে পারছিলাম—খারাপ হচ্ছে পরীক্ষা। তাতে আরও ভয় করত, রেজাল্ট খারাপ হলে রাগ করে মায়েরা যদি হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয় আমাকে। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াত ব্যাপারটা জানি না কিন্তু তার আগে অদ্ভুতভাবে বাঁচলাম। রবিদাই বাঁচিয়েছিল। পরীক্ষার পরও জ্বর লেগেই ছিল। কিছু খেতে পারিনা বলে মা বকছিল। এমন কিছুই বলে নি মা কিন্তু আমার খুব কান্না পেয়ে গেল। আমাকে কাঁদতে দেখে মা চুপ করে গিয়েছে, শেষে কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে চুপ করাতে গিয়েছে আর মাথায় হাত রাখায় আমি আর নিজেকে সামলাতে

পারছি না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলাম প্রায় শব্দ করে। মা হয়ত খানিকটা অপ্রস্তুত কেন না এতো কিছু বকেনি অতো কাঁদবার মতো। রবিদা ওয়ার্কসে বেরোবার মুখে মাকে বলতে আমাদের শোবার ঘরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। আমি ততক্ষণে খুব চেষ্টা করছি সামলে নেবার। রবিদা আমাকে কিছু বললেন না। রোজকার মতই 'মা আসি' বলে বেরিয়ে গেলেন। আমিও মায়ের কাছে একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু কি করব?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা শীলা মায়ের কাছে বসে পড়ছে, আমি আর মেজদি আমাদের ঘরে। মেজদির তো তখন আর কিছু পড়ার নেই, গল্পের বই পড়ছিল। রবিদা ঘরে এলেন, মেজদিকে বললেন,

বেলা, তুই অন্য কোথাও গিয়ে বই পড়, আমি ঝুমলার সঙ্গে কথা বলব।

আমার বুকের মধ্যে এমন দুরদুর করছে মনে হচ্ছে বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সারাদিনই মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি ছিল, সকালে ওরকম কিছু না বলে চলে গেলেন রবিদা, কিন্তু খেয়াল করেন নি বা ভুলে যাবেন এমন হতেই পারে না। ঠিকই ভেবেছিলাম। খুব রেগে আছেন নিশ্চয়ই। আমরা সবাই জানি স্পষ্ট কথা না বলা, অকারণে কাঁদাকাটা করা বা কোনরকম ভাবে মাকে বিব্রত করা—এসব রবিদা একদম পছন্দ করেন না। আমরা তো করিও না সেসব। মেজদির তো কথাই নেই, অতো ছোট শীলাটা পর্যন্ত ইস্কুলের প্রত্যেকটি কথা এসে ওর কাছে গল্প করবে। আমিও বলি অবশ্য কিন্তু সব কথা বলি না। অতো কথা বলতে ভালো লাগে না আমার। তাছাড়া সবাই আমাকে 'ভীতু' বলে রাগায়, তাও ভালো লাগে না। ভীতু-তো ভীতু! সবাই কি একরকম হয়! এই যে এখন রবিদা ঘরে ঢোকায় আমার অসম্ভব ভয় করছে, এক্ষুনি গম্ভীর ভাবে বলবেন,

সকালে কাঁদছিলি কেন?

তখন কি বলব? অথচ জবাব তো দিতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত সেদিন বকেন নি কিন্তু রবিদা। উল্টে আমিই বিচ্ছিরি কাজ করলাম। আমার চেয়ারের কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর আছে কি না তারপর খাটের ওপর বসে খুব আদর করে বললেন,

তোর শরীরটা কেন এত খারাপ হচ্ছে বলত?

আমি বলবার চেষ্টা করলাম,

না শরীর তো—রবিদা কথাটা না শুনেই বললেন,

তোর কি ভালো লাগছেনা আমাকে বল দেখি। পড়তে ভালো লাগছে না?

ভালো লাগছে। আমি বুঝতে পারছি আমার ভিতর থেকে আবার সেই প্রচণ্ড ভয়টা উঠে আসছে। আমাকে কিছু একটা করে ফেলতে হবে। এক্ষুনি, আর তখনই রবিদা ঠিক সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করেছেন,

তাহলে? এখানে থাকতে ভালো লাগছে না? কদিন অন্য কোথাও যাবি?

আমি নিজেকে একটুও আর সামলাতে পারলাম না, টেবিলের কিনারে মাথা দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছি। রবিদা প্রথমে নিশ্চয়ই খানিকটা অবাক হয়েছেন, তারপর মাথায় হাত রেখেছেন।

এই দ্যাখো, কি হয়েছে এই ঝুমলা— কি হয়েছে বল আমাকে। কারো কোন কথায় দুঃখ হয়েছে? খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে 'না' বলছি।

তাহলে কি হয়েছে—বলতো দেখি কে বকেছে।

আমি কোথাও যাবো না—মাকে দিদিকে ছেড়ে আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দিও না—

কোথায় পাঠিয়ে দেব? কে তোকে কোথায় পাঠাচ্ছে—আরে এই মেয়েটা!

আস্তে আস্তে একটুও না বকে রবিদা সেদিন আমার সবকথা জেনে নিয়েছিলেন, ভয়ের কথা, অসুখের কথা, পরীক্ষা খারাপ হবার কথা। হাসেনও নি। বলেছিলেন কেবল,

এত ভয় পাচ্ছিলি, কষ্ট পাচ্ছিলি বোকা মেয়ে, মাকে বলিসনি কেন? মাকে সব কথা বলতে হয়। দ্যাখ তো তাহলে আর এত কষ্ট পেতিস না। তারপর বালিশ ঢাকা তোয়ালে তুলে আমার চোখমুখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,

আর কক্ষণো এসব নিয়ে ভাবিস না। তোর নিজের ইচ্ছে না করলে কোনদিন মা আর দিদিকে ছেড়ে তোর কোথাও যেতে হবে না।

অথচ কই হোল তা? রবিদাই কি আটকাতে পারলেন যখন দিদি চলে গেল আমাদের সবাইকে ছেড়ে? কখন যে কি হয়েছিল দিদির কিছু তো বোঝাই গেল না। বিকেলে মানালির স্কুলের ফাংশান দেখে ফিরল দুজনে। মানালি নাচের পোশাক পরা তখনও। সন্ধ্যের চা খেতে বসে দিদি একবার বলেছিল কেবল,

আমার না ঢোঁক গিলতে কিরকম অসুবিধা হচ্ছে। সন্ধ্যের মুখে বাড়ি ফিরতে মাথায় হিম লেগেছে বলল সবাই। মাথা গলা জড়িয়ে রাখল স্কার্ফ দিয়ে। মা দু-একবার বলছিল গার্গল করার কথা, দিদি গা করল না। কুকু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, মানালিকে খাইয়ে নিয়ে গিয়ে দিদি নিজেও শুয়ে পড়ল। মা একটু গরম দুধ দিয়েছিল, রবিদাও দু একবার বললেন। দিদি কিছু খেল না, বলল,

আমার জ্বরজ্বর লাগছে। তারপর একবার কেবল বলেছিল আমার না হাঁ করতে কি একটা অসুবিধা হচ্ছে। তখনও আমরা কেউ খেয়াল করি নি। কিছু বুঝতে পারি নি। অনেক রাত্রে কাজের টেবিল থেকে উঠে রবিদা যখন শুতে যান তখনই চিৎকার করে মাকে ডেকে উঠেছিলেন। স্কুটার নিয়ে ছুটে চলে গেলেন ডাক্তার ডাকতে। প্রায় এক ঘন্টা পর ফিরলেন পেছনে একজন পায়জামা পাঞ্জাবী পরা লোককে বসিয়ে নিয়ে। দিদিকে দেখে আমরা কিছু বুঝতে পারছিলাম না কি হয়েছে। দিদির দাঁত শক্ত করে বন্ধ, হাতগুলো লোহার শিকের মত। কেউই চেঁচামিচি করিনি কিন্তু মানালিকে তুলে নেবার চেষ্টা করতেই মানালি জেগে গেছে। মা ওপাশ থেকে ঘুমন্ত কুকুকে তুলে শীলার পাশে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। মানালি আমার কোলে কিন্তু আর ঘুমোল না। বারবার আমাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কবছে,

মা-র কি হয়েছে? বাবা কই?

ও কি করে যে বুঝতে পারছিল ওর মা স্বাভাবিক ভাবে ঘুমোচ্ছে না।

সেই পাঞ্জাবি পায়জামা পরা ভদ্রলোক কম্পাউন্ডার। কোন ডাক্তার রাত্রিবেলা বাইরের ভিজিট-এ আসেন নি। ভদ্রলোক দিদিকে একটুখানি দেখে নিয়ে বারে বারে জিজ্ঞেস করছেন,

কোথায় কেটে গিয়েছে? রবিদা আর মা দুজনেই বারে বারে বলছেন কোথাও কাটে নি দিদির। শেষ পর্যন্ত সে ভদ্রলোক সটান বললেন, শুনুন, টিটেনাস হয়েছে ওর স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

রাত্রেই শেষ হয়ে গেল দিদি। কুকু সবে-একবছরের। মেজদি হোস্টেলে। মানালির দিকে তাকিয়ে আমরা কেউ একবারের জন্য জোরে কাঁদতেও পারি না। রবিদা সকালে বেরিয়ে যান, সন্ধ্যেয় ফেরেন। বরাবরের মতই সংসারের দোকান, বাজার, কার কি লাগবে সবকিছু করেন কিন্তু রবিদাকে দেখে মনে হত যেন পুড়ে গিয়েছেন। তখন তো আমিও বেশ খানিকটা বড় হয়েছি, কলেজে যাচ্ছি, মানুষের সম্পর্কের কথা অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

কিন্তু তখন আর সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে আমি কেবল মানালি আর কুকুকে আঁকড়ে ধরেছি। কুকুটা এতো ছোট যে কিছুই বোঝে না। তবু মনে হয় মাঝে মাঝে যেন কি বুঝতে চায়—খাট থেকে মাঝে মাঝে দিদির বালিশটা টেনে নিয়ে আসে, কোনখান থেকে দিদির একটা ব্লাউস, কিছু বলে না কিন্তু এমনভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মনে হয় জানতে চাইছে সেই দেখতে-না-পাওয়া লোকটার কথা। আর মানালি? তখন পর্যন্ত অসম্ভব চঞ্চল। দুষ্টু মানালি প্রথম কদিন খুব কান্নাকাটি করছিল 'মাগোর কাছে যাবো' 'কখন মাগো আসবে' বলে। তারপর আস্তে আস্তে কিরকম চুপ হয়ে গিয়েছে। ও কি বুঝতে পেরেছে যে ওর কান্নার কোন সান্ত্বনা, প্রতিকার আমাদের কারো হাতে নেই? চুপ করে স্কুলে যায়, আসে, হয়ত সেখানে কেউ কিছু বলেছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে খুব স্থিরভাবে আমাকে জিগ্যেস করল, আমার মাগো কি মরে গিয়েছে? আর কোনদিনও আসবে না?

রাত্রে কুকু রবিদার কাছে শোয় কিন্তু মানালি আমার কাছে। কখনো অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে কাঁদে ফুঁপিয়ে। আমিও কাঁদি তখন। কোনদিন আসবে না দিদি? কি করে হলো এইসব? মানালি শান্ত চুপচাপ হয়ে গেছে। ওর সামনে মাকে আদর করি না কিংবা 'মা' বলে ডাকিনা আমি।

তবু তো দিন যায় মানুষের। কিছুই বসে থাকে না। মেজদির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুরঞ্জনদার। একসঙ্গে পড়ত ওরা। রবিদাই সব কিছু করলেন, গয়নাগাঁটি পরা মেজদিকে কি সুন্দর হাসিখুশি ঝলমলে দেখাচ্ছিল। এখানকার লোকজন বন্ধুবান্ধব, সবার সুন্দর সাজপোষাক, হাসি গল্প, খাওয়া—বাড়িটাও যেন একেবারে ঝলমল করে উঠেছিল। তারপর মেজদি চলে গেল কলকাতায়।

এ বাড়ির পেছনের বাগানে দিদির লাগানো বকফুলের গাছ, বেলগাছ কতো বড়ো হয়ে গেছে। বিশাল ছাতার মতো হয়ে উঠেছে গেটের সামনে দিদির শখের কৃষ্ণচূড়া। দু'বছরে কতো বড় হয়ে যায় গাছরা। মানুষ ভাগ্যিস অতো তাড়াতাড়ি বাড়ে না। আস্তে আস্তে বাড়ে সত্যি কিন্তু বদলে বদলে যায়। মানালি দু'বছরের কেজি শেষ করে এ বছর ক্লাস ওয়ানে উঠেছে। কুকুটা একটা গুণ্ডা তৈরি হয়েছে। এবছর ভর্তি হয়েছে কেজিতে।

সবই সামলে একরকম চলছিল আবার। কেবল এক একদিন সকালে রবিদার মুখ দেখে কষ্ট হয়। বোঝা যায় ঘুমোন নি রাত্রে। কিন্তু একবারও ভাবি নি যে মাথার ওপরে একটা ভয়ংকর সম্ভাবনা আমারই জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। মাস তিনেক আগে, বি. এস. সি পরীক্ষার পর, মেজদিও এসেছে আমার পরীক্ষার ক'দিন আগেই, মা দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে কাছে এসে বসল। কুকু ঘুমোচ্ছে। মানালি ফিরবে তিনটেয়। মা আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল, খুব আরামে আমি মায়ের কোলের কাছে ঘেঁষে শুলাম। মা আস্তে আস্তে বলল,

তুমি তো বড় হয়েছ, সংসারের সমস্যা নিয়ে তোমার সঙ্গে ছাড়া কার সঙ্গে কথা বলব আর—

আমি কি একটা আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম, সংসারে তো সবাই আছি একরকম, আবার একটা আলাদা সমস্যা কি হয়েছে? শীলাকে নিয়ে কিছু—? কিন্তু সে সবে তো রবিদাই আছেন। মা বলল,

রবিকে নিয়েই তো ভাবনা! ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছিস কখনো? সবারটা করে যাচ্ছে একভাবে, আমি মা বসে বসে দেখি—ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটার—

সত্যিই তো সেভাবে আলাদা করে ভাবি নি কখনো। দিদির জন্য আমাদের সবারই কষ্ট হয়। মায়ের কষ্টই তো সবচেয়ে বেশি। বাবা আর দাদার কথা আমার প্রায় মনেই পড়েনা আজকাল, কিন্তু মা! মায়ের কাছে এই আঘাতগুলো কি রকম! দিদি মায়ের প্রথম সন্তান ছিল। তবু মা বলে রবিদার কথাই,

এই বয়সের একটা পুরুষমানুষ এরকমভাবে থাকতে পারে কখনো? তারপর ওই বাচ্চাদুটো? ওদের কথা ভাব—তোরা যার যার সংসারে চলে যাবি, একদিন আমিও চোখ বুজব। আমিই বা কতো সহ্য করব! তারপর কি হবে ওদের? আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করে ওঠে কুকু মানালির জন্য। তাড়াতাড়ি মাকে জড়িয়ে ধরি—

ওদের জন্য তুমি কিছু ভেবো না মা। ওদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। একদিনও আমি থাকতেই পারব না ওদের ছেড়ে—মা আমার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, সেই কথাই তোকে বলছি ঝুমা, কোথা থেকে বাইরের মেয়ে আসবে, সে কি কখনো ওদের তোর মত ভালোবাসবে? আর তার সংসারে তুই কি পরিচয়ে থাকবি? আমিই বা থাকব কোন পরিচয়ে?

মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে যেতে থাকে আমার। রবিদার কাছে থাকবার জন্য আমাদের একটা আলাদা পরিচয় লাগবে! মানালি কুকুকে কাছে পাবো না? কি করে থাকবে মানালি আমাকে ছাড়া? রবিদা কি করে থাকবেন আমাদের সকলকে ছেড়ে? ওঁর সঙ্গে জামাইবাবুর সম্পর্ক তো কবেই মিটে গেছে। রবিদা তো আমাদের নিজেদের বাড়ির লোক। আমার কি রকম অস্থির-অস্থির লাগতে থাকে।

কি দরকার মা রবিদার বিয়ে দেওয়ার? আমরা তো সবাই আছি।

তা হয় না বাবা। ওইভাবে একা কেউ থাকতে পারে না। মেয়েরা থাকে, তাদের থাকতে হয়। ছেলেরা পারে না—মানুষের দিনের শেষে নিজের কথা বলারও তো একটা আপনজন চাই তাহলে? সেরকম হলে আমরা যদি মানালি আর কুকুকে নিয়ে আলাদা থাকি?

ভাবতে গিয়েই আমার কান্না পেয়ে যায়। তা কি হয়। এই আমাদের একসঙ্গে থাকা ভেঙে দিয়ে—

মা বলেন,

সেই কথাই বলছি বাবা, তুমি যদি রাজি হও সবদিক রক্ষা হয়, কোন কিছু ভাঙতেও হয় না। সবাই খুশি থাকে, শান্তিতে থাকে—

আমি রাজি হলে? কিসে? অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি।

মানালি কুকুর সত্যিকারের মা হয়েই থাকো তুমি মাগো—রবিকে বিয়ে কর তুমি।

সেই শুরু।

তিনমাস আগে। কথাটা শুনে মনে হয়েছিল হঠাৎ হাতুড়ি দিয়ে খুব জোরে মারল কেউ। আর সেই আঘাতের পর প্রথমেই মনে হয়েছিল, রবিদা কি জানেন এসব কথা? কালও তো, আজ সকালেও তো কথা বলেছি ওঁর সঙ্গে, তখন কি রবিদা এসব কথা জানতেন? পরে বুঝলাম রবিদা জানতেন না কিন্তু মেজদি জানত। বুদ্ধিটা মাকে কি মেজদি দিয়েছিল? জানিনা। কিন্তু মেজদির সঙ্গে মায়ের অনেক কথা হয়েছিল সেটা স্পষ্ট। মেজদি আর মা বারে বারে ঘুরে ঘুরে ওই একই কথায় এসে পড়ত—মানালি কুকুর মা হওয়া, সবাই বরাবর শান্তিতে একসঙ্গে থাকা, যেন এতদিন আমরা খুব অশান্তিতে ছিলাম। দিদির যাওয়া তো দু'বছর হয়ে গেছে, হঠাৎ এখনই কেন—! এর আগে নাকি রবিদা কোন কথা শুনতেই রাজি হত না,

তাই। তো রবিদা কি এখনই রাজি হয়ে গেছেন!

হন যে নি সেটা বোঝা গেল এক-দু দিন পর সন্ধ্যাবেলা। চা খাবার পর যখন মা, মেজদি, রবিদা বসে কথা বলছিল। আমি উঠে এসেছিলাম। পারতপক্ষে আজকাল রবিদার সামনে যাইনা। কি হল, কি যে হতে যাচ্ছে কিছুই যেন আমি বুঝে উঠতে পারছি না। রবিদাকে বিয়ে করা! অসম্ভব, একেবারে একেবারেই অসম্ভব। ঠিক সে সময়েই চাপা কিন্তু উত্তেজিত গলা শুনলাম,

কি বলছ কি? তোমাদের মাথা খাঁরাপ হয়েছে? মা আস্তে আস্তে কী যে বলছে বোঝা যাচ্ছে না। আমি অন্য কোথাও চলে যেতে পারছি না, যেন এই দরজাটা থেকে লতার আঁকশি বেরিয়ে আমাকে এখানে বেঁধে রেখেছে। রবিদা বলছেন,

ঝুমলাকে কোন বাচ্চা বয়স থেকে দেখছি আমি! ও আমাকে কি চোখে দেখে জান না তোমরা? ঝুমলার মাথাতেও কি ঢুকিয়েছ এগুলো?

এবারও মা বা মেজদির কথা শোনা যায় না। কিন্তু জোরে চেয়ার টেনে দেবার শব্দে বোঝা যায় রবিদার উঠে যাওয়া। মিনিট কয়েক পরে দরজা খুলে বেরোনো।

সমস্তক্ষণ কান্না আসছে। এতদিন আমার সব কান্না পাওয়া, সব ভয়, সমস্যা রবিদা ভালো করে দিতেন কিন্তু এখন কে বাঁচাবে? কার কাছে যাবো? আত্মহত্যা করব? মরে গেলে তো মানুষের নিজের আর কোন সমস্যা থাকে না, চিন্তা থাকে না। তাহলে তাই ভালো। কিন্তু মানালি?

কেন জন্মালাম মেয়ে হয়ে? আমার চিন্তা আমার বড়ো হবার ধরন আমার অনুভূতি কোন কিছুরই কোন মানে নেই? কেন এত জটিল হয়ে ওঠে সব কিছু? মেয়েদের সঙ্গের লোকটা যদি মরে যায়, যতো কষ্ট হোক যতো অসুবিধা হোক তার তো বিয়ের কথা ওঠেনা আর?

এখন কিনা মেজদি বলছে,

তুই ওরকমভাবে ভাবছিস কেন? এরকম ক্ষেত্রে শালীর সঙ্গে বিয়ে তো হয়ই। হ্যাঁ, আমরা রবিদার সঙ্গে ঠিক সেভাবে বড় হইনি ; কিন্তু পরিস্থিতিতে পড়লে তো কতো কিছুই করতে হয় মানুষকে। রবিদা অবশ্য বয়েসে খানিকটা বড় তোর চেয়ে—

মেজদি চুপ কর।

শালী নাকি আমরা রবিদার? তো আগে কেন কেউ খেয়াল করায় নি সে কথা? আর 'শালী' যদি একটা সম্পর্কের নাম হয় তাতে কি খুশিমত মানুষের চিন্তা ভাবনাকে পাল্টে ফেলা যায় নাকি?

অন্য একটা দিক থেকে মুক্তি এল।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে রবিদা বললেন কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে তাঁকে। কবে ফিরবেন বলা যাচ্ছে না এখন। দেরি হতে পারে। অন্যান্য ব্রাঞ্চ ইনস্‌পেকশানে যেতে হবে। দরকার হলে কোনও জায়গায় থাকতেও হবে কিছুদিন। যাবার সময় সকলকে বলে গেলেন সাবধানে থাকতে, শীলাকে বললেন ঠিকমত তৈরি হতে পরীক্ষার জন্য। আমি না এসেও পারি নি সামনে আসতেও পারছিলাম না। অর্ধেকটা পর্দার পিছনে ঢুকে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার দিকে সোজাসুজি না তাকিয়েও বললেন,

ভালো হয়ে থাকবি, সকলকে দেখে রাখবি।

সেই যাওয়ার দু মাস পর এই ফেরা। মধ্যে এক-দুবার দু লাইন করে নিজের কুশল

সংবাদ দিয়েছেন মাকে। মেজদিও চিঠি দেয়। শীলা আর আমি বিকেলে একসঙ্গে থাকি, সন্ধ্যেবেলা একই ঘরে ও চেয়ারে বসে পড়ে আর আমি মানালিকে পড়াই খাটের ওপরে। কুকু পিঠের ওপর ঝুলতে থাকে । মাঝে মাঝে মানালির ক্লাসের কবিতাগুলো এক-দু লাইন নিজের ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বলে, না হলে আমার হাতের আঙুল ধরে আস্তে আস্তে চিবোয়। এই অদ্ভুত অভ্যেসটা যে ওর কি করে হয়েছে! হয় কাপড়ের একটা খুঁট না হলে একটা আঙুল আস্তে আস্তে চিবোবে আর চিবোতে চিবোতে ঘুমিয়ে যাবে। ওদের নিয়ে এই বিছানায় ঘুমোই আমি, মা আর শীলা পাশের ঘরে শোয়। আজকাল যেন দিদির ঘর গোছাতে যেতেও কিরকম ভয় করে আমার। যাই না। ও সব শীলা করে।

কিন্তু আজ তো রবিদা ফিরেছেন। এরপরও কি আবার সেই কথাটা উঠবে? নিশ্চয়ই উঠবে না। আবার যদি চলে যান রবিদা—মায়ের নিশ্চয়ই একটু ভয় হয়েছে মনে। যদি আর একেবারেই না ওঠে, সবাই চেষ্টা করে ধীরে ধীরে ভুলে যায় ব্যাপারটা কি ভালো হয়। কিন্তু আমি কি ভুলতে পারব? আগেকার মত সহজ হতে পারব আবার? রবিদাই হয়ত সব সহজ করে দেবেন আবার। আচ্ছা বলো, একটা মেয়ে কি একটা দড়ি নাকি যে তাকে দিয়ে সংসার বেঁধে রাখতে হবে?

ভেবেছিলাম আজ বোধহয় ওরা পড়তে বসতে চাইবে না। কিন্তু রবিদা কোথায় একটা বেরিয়েছেন। স্কুটার নিয়ে নয়, হেঁটেই। হয়ত আশেপাশে কোথাও। কাজেই রোজকার মতই কুকু মানালি আমার কাছে পড়তে বসেছে। কুকু ওর ক্লাসের ছড়া শোনাবে, 'ওপারেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল থং থং' আমি হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, দেখি কুকু আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে 'বাজল পং পং—লং লং বং বং' এই! এত শয়তান এই মেয়েটা। মানালি এতক্ষণ চুপ করে বোনকে দেখছিল। এখন কচিদিদি সুলভ গম্ভীর হয়ে বলল,

চুপ করে বোস। ছবি দ্যাখ, এবার আমি পড়া বলব।

মানালি যখন বইয়ের রঙিন ছবির দিকে তাকিয়ে জন্তুগুলোর ইংরিজি নাম এক এক করে বলে যাচ্ছে, রবিদা এসে ঘরে ঢুকলেন। কুকু তক্ষুনি আমার পিঠ থেকে নেমে বাবার কাছে গিয়ে হাজির হল। রবিদা খাটের একপাশে বসলেন। মানালি মুখ তুলে একবার বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। রবিদা ওর মাথায় হাত দিলেন। আবার মাথা নিচু করে বইয়ের দিকে তাকাল ।

রবিদা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি খুব সহজ থাকার চেষ্টা করছি। রবিদা খুব আস্তে ডাকলেন,

ঝুমলা—

চুপ করে অপেক্ষা করছি অনেকদিন পর যেন ওর গলা শুনছি।

এই দু' মাস অনেক ভেবেছি আমি। নিজের মনকে বুঝবার অনেক চেষ্টা করেছি সব দিক থেকে। ওদের মা হয়ে থাকতে কি সত্যি খুব আপত্তি করবে তুমি?

সোজা হয়ে বসে তাকিয়ে আছি।

আমার ঠিক পেছনেই সাদা দেওয়াল। আমি জানি।

জাত-কুটুম

জয়া গোয়ালা

পাহাড়ী পথের শেষ বাঁক। সামনে আঁকাবাঁকা রাস্তা।

পিচঢালা। তখি রায় পিছু ফিরে তাকায়। নির্ণিমেষে হৃদয় চুঁয়ানো এক রাশ করুণ আর্তি পল্লবিত হয়।

দূরে সুউচ্চ পাহাড। চুড়ো ছুঁই ছুঁই আলতো ভাসমান মেঘের ভেলা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা চঞ্চলা নির্ঝরিণী। উত্তাল হিল্লোলে বয়ে চলেছে নীচে, বহু নীচে। নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে নুড়ি পাথর ক্ষইয়ে, অবণ্যবাসীর তৃষিত হৃদয় তৃপ্ত করে। ঝর্ণার একপাশে নিথর অরণ্যানিব ছায়া ছায়া অন্ধকার। অন্যদিকে বিস্তীর্ণ তৃণ প্রান্তব। সবুজ গালিচা বিছানো উপত্যকা।

পাহাড়ের পাদদেশে ছোট গাঁ। দূরে দূরে ছড়ানো ছিটানো টংঘর। সব শুদ্ধ দশবারোখানি। সঙ্গে দোচালা, চারচালা ছনের ঘর। শান্ত, সুন্দর নিরালা। পাখির ছোট্ট নীড়ের মতো।

শ্যামল বনানীর অন্তরালে পাহাড়ী গাঁ। গাঁয়ের সৌন্দর্য তখির সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবার সোহাগ, মায়ের স্নেহাঞ্চল ছিন্ন করার কথা কখনও ভাবেনি সে। মা-মাটির মমতা-মাখানো পরশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কল্পনাও তার মনে আসেনি কোনোদিন। তবু তাকে চলে যেতে হচ্ছে। দূরে, অনেক দূরে ইট-কাঠ-পাথরের শহরে। যেখানে জল-কাদা-মাখা মাটি-মানুষের ছোঁয়া বিরল। ছলা, কলা, অবিশ্বাসের গ্লানিতে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা জীবন-ধারা। বয়ে চলে কর্দমাক্ত নর্দমাব সংকীর্ণ পরিসবে। লোকমুখে শোনা এমনি ধারা অদ্ভুত নাকি ঐ শহর। তখি রায় জানে না সেখানে আদৌ থাকতে পারবে কিনা। বয়ঃসন্ধিক্ষণের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরের মত ভাঙ্গা মন নিয়ে তাকেও কি আবার ফিরে আসতে হবে ছায়া সুনিবিড় পাহাড়ের কোলে? নিরন্ন, নিরুপায়, নগ্নপ্রায় পরিজনদের মাঝে?

অজস্র চিন্তার ভিড়ে ঠাসা কিশোর-এর অপরিণত মস্তিষ্ক খেই হারিয়ে ফেলে। হুস্ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় একটা কমান্ডার। ত্বরিৎ গতিতে। শহরাভিমুখে। দুপুর অবধি বসে থাকতে হয় তখিকে। শুনশান সড়ক। মাঝে মাঝেই ছুটে আসে দু'একটি যান। যতবারই গাড়ি ধরতে যায় প্রশ্ন আসে-ভাড়ার ট্যাহা আসে? নির্বাক তখির সামনে ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ উড়তে থাকে।

সূর্যকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। তখির মাথার উপর নির্মেঘ নীলাম্বরী ছাতা। দানাহীন পেট চোঁ চোঁ। তেষ্টায় গলা সাহারার মরুপ্রান্তর। জিবের আঠালো শরীরে থুতু জমিয়ে গলায় পাঠায়। কিছু সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত। তখি একবার ভাবে ঘরে ফিরে যায়। দৃশ্যপট ভেসে ওঠে মনের আয়নায়। রোরুদ্যমান উপোসি ভাইবোন, বেকার বাপের উদাসী চেহারা, মায়ের নীরব অশ্রুপাত, ফসলহীন জুমের রিক্ততা, শুয়োর-এর শূন্য খোঁয়াড়ের আধভাঙ্গা খোলা দরজা। এর ওপর নিষ্কর্মা আর একটি পোষ্য সে। সর্বহারা বাপের উপর জলজ্যান্ত এক বোঝা।

তখি রায় মনকে শক্ত করে। তখন-ই মায়ামন্ত্র বলে যেন সব্জিভর্তি একটা জিপ ছোটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর সামনের সর্পিল রাস্তাটার উপরে। অচল, অনড়। বিকল যন্ত্রযানের সেবা-শুশ্রূষার অধিকার পেয়ে যায় তখি বরাত জোরে।

জোর বরাত তাতে চেপেই পা রাখে রাজধানীর হুল্লোড়ময় রাজপথে। রিক্সা, অটো, বাস, লরি আর চলমান জনসমুদ্রে ভেসে যায়। আনাড়ি তখির চোখে বিস্ময়ের ঘোর। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। তাজ্জব বনে যায়। এই প্রথম সে শহরে এল। অজ পাহাড়ি গাঁ তার, ঝিলিমিলি রঙবাহারী শহর দেখে আশ মেটে না। চোখ ধাঁধানো রোশনাই। মন-মাতানো খুশবাই। রঙ-বঙিলা সম্ভারে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত বিপণি। থরে থরে সাজানো মিঠাই। সবকিছুই আনকোরা। মনোমুগ্ধকর। লুব্ধকর। লালা ঝরানো। তখি রায়ের কিশোর হৃদয় গোগ্রাসে গেলে। বৈচিত্র্যময় শহরকে কখন যেন ভালও বেসে ফেলে। একান্তে একটু একটু ক'রে।

নাম না জানা অলি গলি ঘুরতে ঘুরতে তখির হাঁপ ধরে যায়। বিকেল থেকে একটানা হেঁটে চলেছে। তখির শুকনো মুখ দেখে সেই কখন জিপের ড্রাইভার কলা-রুটি খেতে দিয়েছিল। এত হাঁটাহাঁটির পর এখন পেট খালি। ইঁদুর দৌড়চ্ছে, নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। কাঁচের ঘরে রাখা ঐ অনাস্বাদিত বিচিত্র জিনিষগুলো পেটের ভেতরকার দানবটাকে আরও হিংস্র করে তুলেছে। রাস্তার পাশে ঐ খাওয়ার বস্তুগুলি কি অন্যখানে রাখা যেত না—তখি ভাবে।

ঠিকরে পড়া আলোর বন্যা। জনকলরোল। তখি রায় বুঝে উঠতে পারে নি কখন সাঁঝ নেমেছে। রাত্রির কালো আঁচল প্রসারিত হয়েছে।

চরণদ্বয়ে চলার শক্তি নিঃশেষ। ভুখা পেট দেহের ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ। মা-বাবার অভয়হস্ত কিংবা পাখির বাসার মত সুন্দর নীড়টি অনেক অনেক দূরে। তখির মনে হয় যেন সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে। এই বিভুঁই-এ ওর মতো অজ্ঞাতকুলশীল কিশোর কোথা পাবে আশ্রয়। এমনি হাজারো ভাবনার বোঝায় ভারাক্রান্ত তখি মোটরস্ট্যান্ডের কোণে সারি সারি দোকানের একটির সামনে বসে পড়ে। ওদের পাহাড়ের বড়ো বড়ো পাথরের চাট্টান-এর মত মসৃণ ঠান্ডা মেঝে। হাত পা ছড়িয়ে দেয় তখি। পায়ের জ্বলুনি কমতে থাকে।

তখি চারপাশে তাকায়।

আলোকোজ্জ্বল শহরের চেহারা পাল্টাচ্ছে, দু'একটা দোকান বন্ধ। কোন দোকানি ঝাঁপ বন্ধ করার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। সামনের হোটেলটায় খানা-পিনা চলছে। নৈশবিহারী লোকের আনাগোনা চলছে সমানে। রাস্তায় পথিকের ভীড়—ভাড়াক্কা নেই। এত এত মানুষ কর্পূরের মত মিলিয়ে গেছে। আসাম আগরতলা রোডটাকে মনে হচ্ছে কত প্রশস্ত। খানিক আগেই রাস্তাটাকে কতই না সংকীর্ণ, ঘিঞ্জি মনে হচ্ছিল তখির।

একটি নেড়ি কুত্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছানাপোনাসহ তখির সামনের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। বোবা দৃষ্টি। অপলক। তখির নির্লিপ্ততায় আশ্বস্ত হয়। এলিয়ে পড়ে নির্দ্বিধায়। ছানারাও মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। দিনগত হুজ্জুতির ক্লান্তিতে।

ক্ষুধার্ত, অবসন্ন তখি ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব ঘিরে পতঙ্গের চক্রাকার ঘূর্ণন দেখতে দেখতে চোখের পাতা মুদে ফেলে। নিদ্রার অতল গভীরে তলিয়ে যায়। ঐ বেওয়ারিশ প্রতিবেশীদের মতো। তফাৎ শুধু পেটে। হোটেলের উচ্ছিষ্টে ওদের ফুলো পেটে ভাতের নেশা। তখির পেটে-পিঠে একাকার।

উষার আগমনী জানান দিয়ে যায় শহরে কাকের তীক্ষ্ণ বাজখাঁই 'কা' 'কা' রব। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তখি। তন্দ্রাজড়ানো আঁখিপাতা জুড়ে বিচিত্র দৃশ্যপট। সম্পূর্ণ অদেখা, অজানা। পাহাড়ের চিরপরিচিত আবির ছড়ানো ভোরের সঙ্গে আকাশ-জমিন ফারাক।

এখানে ওখানে বাস জিপ দাঁড়ানো। অ্যাসিসটেন্ট ছোকরারা গাড়ি মুছছে কেউ। কারো হাতে বালতি। ঘুম ঘুম চোখ—কেউ গাড়ি থেকে নামছে। ঠেলা চায়ের কেটলি থেকে ধোঁয়া

উঠছে। দু'একজন প্যাসেঞ্জার টিকিট কাউন্টারের সামনে হাতে ব্যাগ ব্যাগেজ। খবরের বান্ডিল নিয়ে দৌড়চ্ছে একটি ছেলে। কি সব আবোল তাবোল বকে যাচ্ছে।

পথে পথচারীর সংখ্যা বাড়ছে। সামনের হোটেলটা থেকে কত রকমের আওয়াজ ভেসে আসছে। ঝনঝন্ ঠনঠন্ টুংটাং।

তখি বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে চলমান দৃশ্যাবলী। চোখের খিদে মেটে। পেটের খিদে মাথা চাড়া দেয়। বিদ্রোহ করে। পকেটে মালকড়ি ভোঃ। শুধু মাত্র বাবার আশীর্ব্বচন-ই পাথেয়।

দুই

শহরে কাজের অভাব নেই। পেটে-ভাতে থাকা ব্যাপারই নয়— কত কথা শুনেছে তখি। মনস্থির করতেও দেরি লাগেনি। বাবার অনুমতি নিয়ে স্বজনহীন সুদূরে চলে আসা। এখন কার কাছে কাজ পাবে, কে দেবে মাথা গোঁজার ঠাঁই, একমুঠো ভাতের সংস্থান। তখির ভেতরটা হাঁকু পাঁকু করে। চিন্তাস্রোত গ্রাস করে ওকে। বেসামাল করে দেয়। জমাটবাঁধা কান্না দলা পাকিয়ে পুঞ্জিভূত হতে থাকে। বুকের কাছটিতে।

—এই তুই কেডা রে? কইত্তে আইসস্? ইখান-ত বইয়া করস কিতা, হ্যা?—পানের কষে কালচে ঠোঁট। হাতে চাবির রিং। গোলগাল, বেঁটেখাটো লোকটি তখির সামনে দাঁড়িয়ে জেরা শুরু করে। চোখেমুখে তাচ্ছিল্য, অবিশ্বাস আর সন্দেহের ঘন প্রলেপ।

ভ্যাবাচেকা তখি ঢোক গেলে। 'আমি তখি রায়। আমার বাড়ী মুদিবাড়ী'। লোকটির তিন নম্বর প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না তখি। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। থরথর কাঁপে ওর বুক। হৃদপিণ্ডের গতি আচমকাই বেড়ে যায়।

—ইখান-অ করস কি শুনি? সর, সর, অইন্যাখ্যানে যা। দোকান খুলুম। যত সব রাস্তার কুত্তা···। বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠা ভ্রু। তখির দিকে বিদ্বেষ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে তালা খুলে ভিতরে যায় দোকানমালিক।

লোকটির কথাগুলি বিশেষ করে মুখ খারাপ করা গালাগালটা তখিকে আঘাত করল প্রচণ্ডভাবে। ছুরির তীক্ষ্ণধার ফলার মতো বিঁধল ওর বুকে। খামোকাই তাকে হেনস্থা করল দোকানি। সে তো কিছুই করে নি। কেবল রাতটাই কাটিয়েছে ওর দোকানের সামনে।

ক্ষোভে অপমানে তখির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ছিটকে সরে এল সেখান থেকে। দুটো বাসের মাঝখানে জনপ্রাণহীন অপরিসর জায়গা। তখি দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগল।

পেছনে পদশব্দ। ফিরে তাকাতেই নজরে এল ওরই বয়সী ছেলে। ফিক ফিক করে হাসছে। যেন খুব মজা পেয়েছে। তখি অবাক।

তখির চোখে চোখ রেখে সে বলে ওঠে, 'অই কিতা রে ভুন্দা। হাঁ কইর‍্যা চাস্ কেরে? কি তা করসিলি ঐ দোকান-অ। বেডা তরে এত বকল কেরে, ক সাই? চুরি করিত গেস্লি, না কিতা?'

ভারাক্রান্ত মন, ক্ষুধার্ত দেহ। তার ওপর চুরির অপবাদ। তখির শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে হঠাৎই ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটিও তেরিয়া। জাপ্টা-জাপ্টি করে দুজনে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তাগদে ছেলেটির সঙ্গে পেরে ওঠে না তখি। দুর্বল শরীর। দু'একটা টিসুম টিসুম। তখি কুপোকাত। কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা।

উদ্ধত ভঙ্গিতে তখিকে ছেড়ে দেয় ছেলেটি—'ফাইট করতে আইসস্, না? আমি কি তর গায় হাত তুলচি। তাইনে শরীলের জোর দেখায়। বেডাগিরি। পারলি নি? ফট্ কইরা মাইন্সের লগে লাগন ঠিক না বুজজস্।'

তখি বিকৃত স্বরে বলে—'চুরি করনের কথা কইসস্ কেরে তুই? আমি কি চুরি করতে গেসি ঐ দোকান-অ। আমার থাকনের জাগা নাই। কাইল রাইতে দোকানের সামনে ঘুমাইসে। এর লইগ্যা কি বকন লাগে? আমার কেউ না ইখান-অ। কাম খুজনের লাইগ্যা আই সে। কাইল থেইক্যা উপাস। এখন তুই কস আমি চুর। মাথাটা কেমন ঠিক রাখব। আমরা না খাইয়া মরতে পারুম কিন্তু চুর হইত না। ইখানের মানুষ এমন জানলে পাহাড় ছাইড়া কোনুদিন আইতাম না।'

তখির বেদনা ভরা কণ্ঠের কাতরোক্তি ছেলেটির মনটাকে ভিজিয়ে দেয়। প্রচ্ছন্ন অনুতাপ বোধ ওর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে শিকড় গাড়তে থাকে।

—কাম করনের লাইগ্যা নি আইসস্? কাম পাইলেও অবইশ্য পাইতে পারস। আইচ্ছা, ঠিক আসে। তুই ব, ঐ ড্রেইনের পাক্কার উপরে। আমি আই-ই।

ছেলেটি দৌড়ে রাস্তা পার হয়। কি মনে করে আবার ফিরে আসে। একটু আগের সেই ফিক্ ফিক্ হাসির ঝিলিক।—আমার নাম রাসমোহন নমঃ। হগ্গলে ডাকে রাসু কইরা। তর নামডা কিতা রে?

তিরস্কার অপমান আর হাতাহাতি লড়াই-এর পর মিষ্টি মধুর বুলি। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাঝখানে যেন শান্তির ঝান্ডা। তখি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওর মাথা ঠিক মত কাজ করছিল না। সওয়াল জবাবের মত পরিস্থিতিও ওর ছিল না। বিমূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকিয়ে ছিল রাসুর দিকে। 'আরে তর নাম জিগাইতাসি কসনা কেরে?' সামান্য ঠেলা দিয়ে রাসু বলে।

এবার মুখ খোলে তখি। রাসুর দুষ্টু হাসির মিষ্টি ছোঁয়া তখিরও প্রাণে দোলা দিয়ে যায়।

—তুই ইখান-ই থাকিস তখি রায়। আমি কদ্দুর পরেই আইমু।—রাসু যান-বাহনের মাঝখানে পথ ক'রে ক'রে রাস্তার ওধারে চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসু আসে। হাতে সকালের টিফিন, দুজনারই। তখির সংকোচ হয়। কিন্তু রাসুর আন্তরিকতার প্রবল তোড়ে ভেসে যায় সংকোচের বেড়াজাল। খেতে খেতে দুজনেই খুলতে শুরু করে জীবন খাতার পাতা। একে অন্যের সামনে, অকপটে। অল্পক্ষণেই উভয়ের কাছেই নিজেদের জীবনের ধারাপাত মুখস্থ হয়ে যায়। একযুগের একটু বেশি সে ধারাপাত কুসুমাস্তীর্ণ তো নয়ই বরং বেদনাময়। চোখে জ্বালা ধরানো। দুই কিশোরই অনেক ব্যবধান ছাড়িয়ে এক হয়ে যায়। স্থান, কাল কিংবা আরও কত কি …।

হোটেলের কিশোর শ্রমিক রাসুর সরল আন্তরিকতায় মুগ্ধ তখি। এক অলৌকিক মায়াবন্ধনে বাঁধা পড়ে যায় রাসুও। তার অনেক কাজ। ফিরে যেতে হবে হোটেলে। তখির মুখ শুকিয়ে যায়।

রাসু হাসে—অন্য রকম হাসি। 'আরে হাবা মুশকিলে ফেলাইলি দেহি। দুই তিনটা ঢিসুম ঢাসুম দিসলাম। যাইতাম গা যদি ভাল হইত। তা না জানপহেচান বাড়াইতে গেলাম। পড়লাম নি ফাঁড়া বাঁশে। আমি মালিকের লগে কথা কমু। মনে হয় হইব। তুই ধারে কাছেই থাকিস। আমি দুপুরবেলা এই জাগাত্ আমু, কেমন।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে রাসু চলে যায়। তখির চেয়ে খানিকটা লম্বাই হবে। বয়েসেও হয়ত

বা। শ্যামলা মুখে চিকনাই আছে। ঠোঁটের উপরে নীলচে রোঁয়া। চোখ দুটি ভাসা ভাসা। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তখি অনুভব করে রাসুর সুন্দর চেহারাব ভেতবে আরও সুন্দর একটা মনও রয়েছে।

তিন

দুরু দুরু বুক। আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান। রাসুর সঙ্গে হোটেল মালিকের রুমে ঢোকে তখি। মালিক ওর সঙ্গে কথা বলবে। মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে ভুঁড়িওয়ালা লোকটি ওকেই দেখছে কিনা মালুম হয় না তখির। রাসু কনুই দিয়ে গুঁতো মারে। তখি ইশারা বোঝে। মালিকের পা ছোঁয়। 'তোরই নাম তখি রায়?' ঘাড় নেড়ে সায় দেয় তখি। বাসন মাজতে পারস? শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছে রাসু। শুধু ঘাড় নাড়তে হবে। তখি তাই করে চলে। অবশেষে···।

হোটেলে কাজে বহাল হয়ে যায় তখি রায়। মালিকের সামনে থেকে পিছু ফেরে। অমনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠের বজ্রনিনাদ—'ভাল হইয়া চলতে হইবে কিন্তু। হাবিজাবি কাম করলে পিঠের ছাল তুইল্যা লামু। মনে রাখিস কথাডা।'

খাওয়া-থাকা-মাস মাইনে। সারাদিন বাসন মাজা-টেবিল মোছা, টুকি টাকি কাজ। গভীর রাত্তিরে ভ্যাপসা গরমে চাটাই পেতে শুয়ে পড়া। মশারির বালাই নেই। তখি রাসুর মত আরও দুজন। বাপ-তাড়ানো-মায় ঠেঙানো হা ঘরে। সমস্ত দিনের কর্মসহচর। নিঝ্‌ঝুম রাতের শয্যা-সঙ্গী। ঘেমে-নেয়ে একাকার চারটি মাংস পিন্ড। একাত্মা। ঝুলকালি মাখা একটিমাত্র তেল্‌চিটে বাল্বের স্বল্পালোকিত ঘর। চার দেয়ালের গা ঘেঁষে সারি সারি ডেকচি-কড়া-বাসনের বিশাল বিশাল বপু। লম্বা বেঞ্চের উপর টুকরি কুলো বস্তার ঘন সমাবেশ। বড়বড় উনুনের নিভন্ত আগুনের উত্তাপে সব কিছুই ঘাম ঝরাচ্ছে।

কানের কাছে মশার গুনগুন। দেহের আনাচ কানাচ ঘিরে চক্রাকার ভ্রমণ। দংশনের তীব্রতা। তারই মাঝে চারটি ছেলের গুঞ্জন-আলাপন। সারাটি দিনের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা বিনিময়। তারপর কর্মক্লান্ত শরীর জুড়ে নেমে আসে নিদ্রার সুশীতল স্বপ্নালু আবেশ। নামকাওয়াস্তে টিফিন। তারপরই শুরু হয় কর্মযজ্ঞ। এগারটা থেকে কাস্টমারদের ভুরিভোজনের পালা। এক সেকেন্ডও ফুরসৎ নেই। ড্রাইভার, রিক্সাচালক, ফিরিওয়ালা মায় পয়সাওয়ালা লোকটি পর্যন্ত— কে না আসে এই হোটেলে। তখি কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনোযোগী হয়ে দেখে। কত রকমের লোক। কত রকম ভাষা। চালচলন। কারো কথা শুনলে-শুনতেই ইচ্ছে হয়। কিন্তু দু'দণ্ড বেশি থাকে না ওরা। কারো খিস্তি-খেউড় খই ফোটে। তখির বিচ্ছিরি লাগে। শুধু তখির কেন, ওদের সবারই।

রাতের কাস্টমাররা আরও বিচিত্র। সঙ্গে দিদিমণিরাও থাকে। কিন্তু ওরা বড্ড এলোমেলো। লাজশরমের বালাই কম। মালিকের কড়া হুকুম-বাবুদের কাছে তখন ওরা যেন না যায়। মাঝবয়সী ঝুনুদা তদারকি করে।

রান্নাঘরের লাগোয়া টিউবওয়েলে বাসন মেজে তখি সাথীদের সঙ্গে জোটে। বারান্দার কোণে জটলা বাঁধে। থেকে থেকে কানে বাজে গ্লাসের ঠোকাঠুকির টুং টাং। জড়তা মেশানো কণ্ঠের আবোল তাবোল প্রলাপ। রিনরিনে হাসির ঝংকার।

চার

ছোট ছোট দুখ-সুখের দোলায় চেপে তখির দিনগুলি কেটে যায়। অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ

হতে থাকে। নিষ্প্রাণ কংক্রিটের শহর প্রাণস্পন্দনে ভরপুর লাগে।

সাথীদের কাছে তখি এখন ককবরকের টিচার। কানের কাছে ভুল উচ্চারণে ছাত্ররা কিচির মিচির করে। মওকা পেয়ে তখিও মাষ্টারি ফলায়।

মাঝে মাঝে মালিকের নির্দয় ব্যবহারের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় মনটা। নিছকই লঘুপাপে গুরুদণ্ড। সামান্য কারণেই বিপর্যয়। জঞ্জাল ভর্তি গামলার মধ্যে দু'একটা চামচ হয়ত ছিল। ফেলতে গিয়ে নর্দমায় পড়ে গেল। সে কি হাঁকডাক তর্জন-গর্জন। সঙ্গে বিরাশিসিক্কার দু'তিনটে চপেটাঘাত। বেতন থেকে চামচের দাম কেটে নেওয়া হবে বলে শাসানি।

প্রথম প্রথম তখির মনে হত বাঙালি নয় বলেই মালিক এরকম করছে। ভীষণ মুষড়ে পড়ত তখি। সব ছেড়েছুঁড়ে বাড়ি চলে যেতে চাইত মনটা।

সঙ্গীরা সান্ত্বনা দিত। রাসু বোঝাতে বসত 'মালিক এমন-ই, বুজজস্‌নি। ভুলচুক কার না হয়। বেডা বুঝে না। মানুষ কইরা গইন্যও করে না। একটু দোষ পাইলেই আমরারে হগ্গলরে মারব ধরব। যেমন আমরার রক্তমাংসের শরীল না, পাথরের। ঠিক না বিষ্ণু, সজইল্যা?'

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ওরা। ওদের বিষাদে ভরা করুণ মুখগুলিও তখির বিশ্বাসের ভিত শক্ত করতে পারে না। টানা-পোড়েন চলতে থাকে।

এমনি একদিন। রঙিন পানীয়ের ছোট ছোট বাহারী গ্লাস ট্রেতে করে কলতলায় নিয়ে আসছিল বিষ্ণু। শ্যাওলাধরা গোলাকার কলতলা। সবজে, পিচ্ছিল। হঠাৎই পা পিছলে স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল সে। ট্রেটা উলটে পড়ল। ঝনঝন্ করে ভেঙ্গে গেলো তিনটে গ্লাস। বাকিগুলি মাটিতে পড়ল। তাই রক্ষে।

ফ্যাকাশে মুখ বিষ্ণুর। কলতলার সামনে ছোটখাটো জমায়েত। দোতলা থেকে নেমেই উপর্যুপরি পেটাতে শুরু করল মালিক বিষ্ণুকে। বেদম মার। হাতের বেতটা ভেঙ্গে গেল তবেই ক্ষান্ত দিল। ততক্ষণে বিষ্ণু রক্তাক্ত, বেহুঁশ। তখিরা সবাই থ। যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মালিকের কথায় সাড় ফিরে এল।—আইজ সারাদিন হের খা-অন বন্ধ। কেউ দয়া দেখাইলে জুতাইয়া লাল কইরা লামু।

তখি সেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিল বাঙালি ট্রাইবেল কোন জাত ওদের মধ্যে নেই। তখিদের মধ্যে একটাই জাত। তা বোধহয় খেটেখাওয়া মজুর। তা না হলে বিষ্ণুকে অমন নির্মম প্রহারের শিকার হতে হতো না।

সেদিন থেকে নিরুদ্বেগে, নির্ভাবনায় তখি আরও ভালবাসতে শুরু করল ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে সঙ্গীদের। ওর মনে হল ওরাই ওর বন্ধু। এই পরবাসে একান্ত আপনার জন।

পাঁচ

সন্ধ্যে সাতটা বেজে···। ওয়ালক্লকে চোখ রাখে তখি। রাসু তাকে সময় দেখতে শিখিয়েছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে তখি মিনিটের ঘর গুনতে থাকে। পাঁচ, দশ, পনের···। অমনি কোণের টেবিল থেকে গমগমে আওয়াজ ভেসে আসে—'টাকারজলা বাজার থেকে ফেরার পথে কজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর উপর কতিপয় দুর্বৃত্তের আক্রমণ-লুটপাট, ঘটনাস্থলেই নিহত তিন জন। সারা ত্রিপুরা জুড়ে আতঙ্কের বাতাবরণ।' রেডিও থেমে যায়। অফ করে কেউ।

টেবিল ঘিরে তিন যুবক। মুখের গ্রাস ফেলে পরস্পরের দিকে তাকায়। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। একজন বলে—'আইজ কত তারিখ রে?'

—কত আবার। জুনের ২৫—অন্যজনের জবাব।

— অ জুন। কাম কাজ আইতাসে মনে হয়। দাদা'র গদীতে একবার যাওন দরকার। কত বাঙালী শেষ কইর্‌য়া দিল হিসাব আসে?

তৃতীয় জন বলে—আমার ম'নয় দাঙ্গা লাগব এমন ভাবই লাগে, না রে?

জ্বলন্ত চোখে প্রথম যুবক গ্রাস তোলে,'ইবার লাগলে হালার তিপরাহগলরে কচুকাটা করুম। টাউনের একটা তিপরাও জিয়াতা রাখতাম না।'

রহস্যময় কণ্ঠে দ্বিতীয় জন বলে ওঠে—'ইখান থেইক্যাই শুরু করতে পারবি।'

—মানে? মানে?—সমস্বরে অন্য যুবকদ্বয় প্রশ্ন করে। রহস্যময় চোখ ঠেরে ইশারা দেয়। স্বর নীচু।

—মানে ওই হোটেলেই একটা তিফরা পোলা কাম করে। হেরে দিয়াই উদ্বোধন—। হো হো করে পৈশাচিক হাসি হেসে ওঠে তিন জনে।

বিদ্যুৎ শক্ খাওয়া মানুষের মতই ছিটকে সরে আসে তখি। পর্দার আড়াল থেকে ষন্ডামার্কা ছেলেগুলির সব কথাই কানে এসেছে তার। এ যে তাকে কেন্দ্র করেই, বুঝতে ভুল হয়নি মোটেও। আতংকে দম বন্ধ হয়ে আসে তখির। রক্তহীন সাদাটে মুখ। উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। রাঁধুনির তীক্ষ্ণ নজরের সামনে লুকোনো থাকে না।

— কি রে নাকচেপ্টা, কি হইসে? ক্ষিদা পাইসে? রাঁধুনির কথার জবাব দেয় না তখি। এই বুড়ো লোকটি খুব স্নেহ করে ওদের। লুকিয়ে এটা-সেটা খাওয়ায়। আদর করে তখিকে 'নাকচেপ্টা' বলে ডাকে হামেশাই। কিন্তু এই মুহূর্তে এই শব্দটিই শুনে তখির অন্তরাত্মা জ্বলে গেল। ওর অন্তর্দাহের কথা তো বেচারা রাঁধুনি জানেনা।

ছয়

ক'দিন ধরেই জোর গুজব। দাঙ্গা লাগবে। দাঙ্গা লাগছেই। ১লা জুলাই থেকেই। চার পাঁচ দিন তখির ভাবান্তর লক্ষ্য করছে সাথীরা। সদুত্তর পাচ্ছেনা প্রশ্ন করেও।

তখির অবস্থাও পীড়াদায়ক। না কইতে পারে, না সইতে পারে—এমনি ধারা। চোখমুখ কোটরগত। আনমনা ভাব। একটুখানি শব্দেই চমকে উঠছে। এই বুঝি কেউ এল।

এমনি করেই জুলাই এর তিনটি দিন কেটে গেল, রাত এল। তখি আর সইতে পারছে না। এবার সে মুখ খুলবেই। অন্ততঃ রাসু'র কাছে। নইলে এমনি-ই হয়ত সে মরে যাবে। কোন ভূমিকা নয়। সরাসরি তখি বলে ফেলল নয়দিন আগের ঘটনাটা, রাসুকে। সবিস্তারে। ফুঁসে উঠল রাসু—হ, এত এত মানুষ থাকতে তরে মাইরা লাইব, কইলেই হইল আর কি। মগের মুল্লুক নি?

—আমারে কাটলে কেউ আইত না রে রাসু। আমি জানি। এর চে আমি পাহাড়েই ফিরা যাই গা। কি করুম আর। পাহাড়ে উগ্রপন্থী, শহরে তরা। তরা ত ভাবস্ আমরার হগল তিপরা উগ্রপন্থী। জানস নি আমরারে কত যন্ত্রণা দেয় হেরা। চান্দা চায়। না দিলে গুল্লি করব কয়। মুরগি, শুয়র ঘর থ্যেইকা লইয়া যায়। জানের ডরে টু শব্দ করে না কেউ। আমরার একটা শুয়র আছিল। এখন খোঁয়াড় খালি। বাবা মা'র কাম নাই। জুমের ধান বেইচ্যা চান্দা দিসে। ক' আমরা কেমনে বাচুম, কোনখানে থাকুম।

কান্নাঝরা প্রতিটি কথা রাসুর অন্তর বিদীর্ণ করে। অবিশ্বাসের ছিঁটেফোঁটাও রাসুকে স্পর্শ করতে পারে না। তখি ওদের ছেড়ে আরও দুঃখময় পাহাড়ি জীবনে ফিরে যাবে এটাও মেনে নিতে পারে না সে।

—নারে, তখি। তুই ইখান-ই থাক্। আর বোঝা বাড়াইস না তর বাপের। ট্যাহা পয়সা জমাইয়া বাড়ীতে যাইস পরে। আমরা থাতে তর কিচ্ছু হইত না দেখিস।

তখি কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বুকের ধুক্‌পুকুনি একটু কমে। তাছাড়া তিনটে দিনেরও কোন দুঃসংবাদ নেই। একটু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তখি। নিউজ শুনতে ভুল করে না।

রাত পোহালেই জুলাই-এর দশ। যথারীতি নিউজ শুনেছে তখিরা। স্থানীয় সংবাদ। সামান্যতম উত্তাপেরও কোন খবর নেই।

নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাবনার সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত প্রায়। পরম নির্ভরতায় রাসুর বুকে আলতো রাখা তখির ডানহাতখানা। আচমকাই হৈ হৈ, রৈ রৈ । হোটেলের দরজায় করাঘাত। এলোপাথাড়ি লাথির শব্দ।

তখিরা যন্ত্রবৎ চকিতে উঠে বসে সবাই। সবার চোখে ত্রাস, শঙ্কা। উৎকণ্ঠিত বক্ষের দুরুদুরু কাঁপুনি। ভয়চকিত দৃষ্টিগুলি উত্তরের খোঁজে অলিগলি হাতড়ায়।

'— অই কেডা আছ্স। দরজা খুল। নাইলে ভাইঙ্গা লামু।' দমাদ্দম লাথি পড়তে থাকে দরজায়। মধ্য রাত্রির নৈঃশব্দ্য খান খান হয়ে যেতে থাকে। আকাশফাটানো চিৎকারের রেশ ঘুমন্ত মালিকের কর্ণকুহরে আঘাত করে কিনা কে জানে। দরজা খুলতে কেউ এগোয় না।

'—এই শেষবার কই। দরজা খুইল্যা তিপরা পোলাডারে বাইর কইরা দে। নাইলে খারাপ হইব। হুয়র-এর পুতাইত্‌রে নিব্বংশ কইর‍্যা ছাড়ুম। দরজা খুল।' অশ্লীল ভাষার ফুলঝুরি ফোটে। বক্তব্য পরিষ্কার।

তখি-রাসুরা বুঝতে পারে কারা এসেছে। তখির শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরিয়ে নেবে আসে একটা হিমেল স্রোত। ঘামের ঢল নামে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে তিন কিশোর। রাসুর মুখমন্ডলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নীরব ঘোষণা। তখিকে ঐ খুনেদের কাছে তুলে দেবে না কিছুতেই।

'—দ্যাখ্ বিশ্বা, সজইল্যা। ঐ মদতি গুন্ডাহগল আমরার তখিরে মারণের লাইগ্যা আইসে। হে আমরার বন্ধু। আমরা যা, হে ও তা। হাত দিয়া খাইট্যা খঅইন্যা কামলা। হেরে এখন বাঁচাইতে হইব। তরা কইবি তখি পাহাড়-অ গেসে গিয়া, বুজজস্। শত কইলেও আর কিচ্ছু কইবি না। মালিকের কি, আমরার রক্ত চুষণ ছাড়া। চুপ কইরা রইসে দেখস না।'

'—তরা তখিরে টুকরি-বস্তা-টস্তা দিয়া ঐ বেঞ্চের তলাত লুকায়া রাখ। ডেগ-কড়ায় চাপা দে। আমি দরজা খুলি। তাড়াতাড়ি কর।'

ওরা ফটাফট ডেগ-বস্তা-টুকরির ঘেরাটোপে তখিকে লুকিয়ে ফেলে। তখির দম আটকে আসে। গা গোলাতে থাকে। অপর্যাপ্ত বাতাস। চুল্লির অসহ্য তাপ। তখির সর্বশরীর দুঃসহ যাতনায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। গা হিম করা আতঙ্ক মগজকে ঢিলে করে দেয়। এলোমেলো চিন্তা মনে বাসা বাঁধে-রাসুরাও বাঙালি। ওরা কি তখিকে বাঁচাবে? যদি বলে দেয় তখি কোথায়, তখি ভাবতে পারে না। গুলিয়ে যায় সব কিছু।

সাত.

দরজা খোলামাত্র হুড়মুড়িয়ে ঢোকে চার পাঁচ জন টলোমলো পা। বিকট দুর্গন্ধে ভরে যায় জায়গাটা। একজনের হাতের দিকে তাকানোমাত্র আঁতকে ওঠে রাসু। পেল্লায় সাইজের রামদা। চক্‌চকে । পশুর হিংস্র চাউনি ওদের। অনুসন্ধানী চোখ। রাসুর অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

'—এই হারামজাদা, হে কই? তরার লগে কাম করে যে তিপরাটা?' লম্বু ছেলেটা দা উচিয়ে বলে। ওর মুখের পচা গন্ধের ঝাপটা রাসুর নাকে মুখে লাগে।

'— হে তো বাড়ীতে গেসে গা দাদা'। সবিনয়ে বলে রাসু।

'মিছা কথা কইস না পুত্। হে কি তর জাত-কুটুম নি। অ্যাঁ? দেশের খবর রাখস নি, বাঙাল শেষ হইয়া যাইতাসে হেরার লাইগ্যা। মিছা কথা কয়। ক'জলদি, নইলে—' আধপোড়া সিগারেটের টুকরোটা চেপে ধরে রাসুর ঘাড়ে। অট্টহাসির দমকে ঘরটা ভরে যায়। '—উঃ মাগো!' যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে রাসু। দুচোখে জল আসে।

'—ক' শালার পুত, ক'। আবার ছ্যাঁকা দিতে হাতটা এগিয়ে আনতেই পেছনে সরে আসে রাসু। একজন এগোয় সজল বিষ্ণুর দিকে।

ছ্যাঁকা লাগা জায়গাটার তীব্র জ্বলুনি রাসুকে দোমনা করে দেয়। সত্যিই তো, জাত-কুটুম কিছুই তো নয় তখি। কোন্ টিলা জঙ্গলের ভূত! ওর জন্য কেন মিথ্যে বলা? যন্ত্রণাসওয়া? বলে দেবে নাকি তখি কোথায়। পরক্ষণেই তখির সরল মুখখানা ভেসে ওঠে মানসচক্ষে। ওর দুঃখী বাবার কথা মনে পড়ে যায়। না জানি কত আশা করে পথ চেয়ে আছে! কেমন হবে দেখতে তখির বাবা? রাসু অনুমানের চেষ্টা করে। তার নিজের দাদু'র মত? তার গল্পবলা দাদু। কল্পনায় দাদু'র মায়ামাখা মুখের ওপর তখির মুখের আদলটা বসিয়ে নেয় রাসু। তখির বাবা! বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে রাসুর, ঠিক যেখানটায় কিছুক্ষণ আগেও পরম নিশ্চিন্তে হাত রেখে ঘুমিয়েছিল তখি। সেখানটায়। নান্-না-না! তখি-তখি-রে। মনে মনে আওড়ায় রাসু। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। মেরে ফেলবে? ফেলুক। তখন আর মুখ থেকে কথা বেরুবে না। একটা কথাও না!

সজল বিষ্ণুকে জেরা করে করে ক্লান্ত ওরা। একতলাটা ঘুরে ঘুরে চিরুনি তল্লাস চালিয়েছে। পানীয়ের মদির নেশা রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আবেশে চোখ মুদে মুদে আসছে এখন। একজন, উপরে যেতে চাইল।

—'না-না উপারে গিয়া লাভ নাই। পোলাডা মনে হয় আসলে ইকানে নাই। কি করণ যায়। চল, যাইগা।' টেনে টেনে একজন বলে। বোধহয় দল নেতা। অন্যরা দ্বিরুক্তি না করে দোরের দিকে। আধ ভেজা দরজার ওধারে বলির পাঁঠার মতো তখি। সময় গুনছে মৃত্যুদুতের আগমনের।

'এই তখি চোখ খুল। আমরা এনা।—মইর‍্যা গেল নাকি?' ফিসফিসিয়ে বলে রাসু। তখির মুখের উপর ঝুঁকে আছে তিনটে মুখ। ভীত বিহ্বল চোখে এদিক ওদিক তাকায় তখি।

হাল্কা গলায় বলে ওঠে 'হেরা গেসেগারে। তর আর ডর নাই।' ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হয় তখির। রক্ত পিপাসু ছেলেগুলি ওকে কেন ছেড়ে দিল বুঝে উঠতে কষ্ট হয়। সজল, বিষ্ণু যুগপৎ বর্ণনা করে—শুরু থেকে শেষ ঘটনাবলি।

রাসুর ঘাড়ের উপরকার ফোস্কা পড়া গোলাকার জায়গাটিতে তখির কোমল দৃষ্টির স্নিগ্ধ পরশ পল্লবিত হতে থাকে।

তখি রায় নির্বাক। অবিশ্বাসী মনটাকে ধিক্কারে ছিন্নভিন্ন করে দিতে ইচ্ছে হয়। ওর হৃদয়ের পরতে পরতে ভালোবাসার কৃতজ্ঞতায় খুম্পুই গোলাপের সুরভি ছড়িয়ে পড়ে।

দুবাহু বাড়িয়ে সজল-রাসু-বিষ্ণুকে সবলে টেনে আনে কাছে। একদম বুকের কাছটিতে। যেখানে চারটি হৃদয় মিলেমিশে বলছে 'আঙ নন হাম জাগ!'

কেরেছ বুড়ি বিত্তান্ত

সুনন্দা ভট্টাচার্য

'পুকুরঘাটে চানে যেতে রাস্তায় এক নাদি গোবর দেখতে পেয়ে চোখ চকচক করে ওঠে হেমন্তবালার। নীচু হয়ে ডান হাতের তেলোয় গোবরটুকু ওঠাতে গিয়ে বুঝতে পারেন পুরোটা এক হাতে ধরবে না। বাঁ হাতে রয়েছে পেতলের কলসী, গামছা, সেটাও হাতছাড়া করা যাবে না। ইতি উতি তাকান। কলাবতীফুলের গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে এনে গোবরগুলো তুলে নেন, আবার ফিরে গিয়ে পিছনের উঠোনে রেখে আসেন। গরুর গোবর মহা মূল্যবান জিনিষ, বিশ্বসংসার শুদ্ধ করে নিতে এর জুড়ি নেই।

চার বাড়ির উঠোন ডিঙ্গিয়ে তবে মহীতোষ চৌধুরিদের পুকুরঘাট, অনেকটা রাস্তা। চৈত্রমাস, এই সকাল দশটায়ই রোদ্দুর কেমন খটখটে হয়ে উঠেছে। গামছাটা ভাঁজ করে মাথায় দিয়ে দেন হেমন্তবালা। পোড়ার পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেয়। স্নান সেরে রান্না করে খেতে খেতে আরো ক'ঘণ্টা যাবে, ততক্ষণ খিদে সহ্য করতে হবে। আগে তো এ সময় কোনদিন খিদে পায়নি হেমন্তবালার, আজকাল কী যে হয়েছে, সময় নেই অসময় নেই খিদে পায়, পেটটা যেন জ্বালা করে, হাত পা অবশ ঠেকে।

একটুখানি ছাই-নিয়ে কলসীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাজেন হেমন্তবালা, জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে পরখ করেন মনমত চকচক করছে কিনা, সন্তুষ্ট হয়ে ঘাঠের পৈঠেতে কলসী রেখে জলে নামেন, টপ টপ কয়েকটা ডুব দেন। অনতিদূরে চৌধুরিদের নাতিপুতিরা সাঁতার কাটছে, নতুন সাঁতার শিখছে সবচেয়ে ছোট নাতনী ছ'বছরের পঞ্চমী, এলোপাতাড়ি পা ঝুপড়োচ্ছে জলে, ছিটে বাঁচিয়ে কোনমতে ডুব দিয়ে ওঠেন হেমন্তবালা। ঘাটে উঠে এসে কলসীটা টেনে নিয়ে আবার জলে নামেন, জল ভরার জন্য বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে হয়। এই চৈত্রমাসে জলে টান দেয়, কেমন ঘোলাটে কাদাগোলা হয়ে উঠেছে জল ; তাই ভরে নিয়ে উঠে আসছেন। সমীর এগিয়ে আসে—'অ দিদিমা তোমার কলসীটা যে ফুটো হয়ে গেছে, দেখ কেমন সুতোর মত পিচকিরি দিয়ে জল বেরুচ্ছে!'

নিচু হয়ে সমীরের কথার সত্যতা যাচাই করতে গেছেন—ওধার থেকে ডুবসাঁতার দিয়ে এগিয়ে আসে মিহির, হেমন্তবালার পায়ে আলতো এক ধাক্কা মারে, পা হড়কে পড়ে যান তিনি—তাই দেখে ছেলেরা হি-হি করে হাসে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় হেমন্তবালার—'পোড়ারমুখোর দল—আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, এই জলে দাঁড়িয়ে বলছি, ঝাড়ে-বংশে কলেরা হয়ে মরবি তোরা।'

রাগের মাথায় মুখ ফস্কে কথাটা বেরিয়ে যায়, মনে মনে প্রমাদ গোনেন হেমন্তবালা। মনে অস্বস্তি নিয়ে ভিজে কাপড়ে কলসী ভরে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি মানে দু গন্ডা জায়গা, সামনের দিকে একটু উঠোন রেখে ছনবাঁশের দু'চালা ঘর একখানি। পেছনদিকে একটি করে কাঁঠালগাছ, আমগাছ আর লেবুগাছ। একটি আতার চারাও বসিয়েছেন। আরেকটু ছাড়িয়ে গেলে বাঁশঝাড়, তার তলায় ছাঁচের বেড়া দেয়া খাটা পায়খানা।

ঝক ঝক করছে ঝাঁট দেওয়া উঠোন, শুকনো খটখটে লাল মাটিতে গোবর ছিটের কালো কালো দাগ শুকিয়ে আছে। সদ্য-লেপা দাওয়ার একধারে শুকনো পাতা ডাঁই করে রাখা। এই

দুটো মাস জ্বালানি কাঠের জোগাড় দেখতে হয় না, এ এক বাঁচোয়া, পাতা জ্বালিয়ে দিব্যি রান্না হয়ে যায়। একজনের একবেলার সামান্য রান্না, তাও দেখতে দেখতে পাতার পাহাড় শেষ হয়ে যায়।

ঘটি থেকে তুলসীগাছে জল দেন হেমন্তবালা। ঘরের পেছন দিকে গিয়ে ভিজে কাপড় ছাড়েন। তারপর উনোনে আঁচ দেন।

হেমন্তবালার ভয়টা অমূলক ছিল না। পুকুরঘাটের কথাটা ইতিমধ্যেই ডালপালা ছড়িয়েছে। গলা ছেড়ে গালাগাল দিতে দিতে বাড়ির উঠোন ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসে প্রিয়ংবদা, সমীর-মিহিরের পিসী।

'এতবড় সাহস তোমার, ছেলেপুলের মরণ কামনা কর, যার খাও তার সর্বনাশ চিন্তা কর, আঁটকুড়ি ধাড়ি, গ্রামছাড়া করব তোমায়। খবরদার বলে দিচ্ছি, আর যদি আমাদের পুকুরঘাটে আস···'

খানিকক্ষণ চুপ করে শোনেন হেমন্তবালা, তারপর কেমন রাগ হয়ে যায়, 'আঁটকুড়ি ধাড়ি ত তুইও···'

আর যায় কোথায় ! প্রিয়ংবদা ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। ক্যাচাল শুনে বেরিয়ে আসেন দুর্গাদাস ভট্টাচার্য—সব শুনে হেমন্তবালাকে তিরস্কার করেন—'ছেলে-পুলেরা একটু দুষ্টুমি-মস্করা তো করবেই, দিদিমা বলে ডাকে তোমাকে। একটু মুখ সামলে চলতে শেখ হেমন্ত-খুড়িমা'।

এরকম একচোখা বিচার খুব জানা আছে হেমন্তবালার। প্রিয়ংবদা কেমন বলে গেল—'যার খাও তার সর্বনাশ চিন্তা কর'। হেমন্তবালার অন্ন কেউ জোটায় না। আর তিনি আটকুঁড়ি কি না তার সঠিক প্রমাণ কোনদিন মিলবে না। এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন, কোরা থান রক্তে ভেসে যেতে দেখে ভয় পাবার ঘটনা তো তারও দুবছর পরের। তখন অবশ্য মা ছিলেন আগলে রাখার জন্য। এখন মার চেহারা ওই পেতলের কলসীতে লেখা শত সহস্রবার ছাই-এর ঘর্ষণে অস্পষ্ট হয়ে ওঠা 'স্বর্ণকুমারী' নামটাতে এসে ঠেকেছে। এমন আচ্ছা হরফ, পড়তে গেলে চোখ আপনি কুঁচকে আসে। হেমন্তবালার আগলে রাখার মত একমাত্র সম্পত্তি। তাইজন্যই তো গ্রামের ছেলেরা কলসী নিয়ে রাগ বাধায় তার সাথে। মা মারা গেলে শ্বশুরের ভিটেয় অবশ্য স্থান হয়েছিল হেমন্তবালার। বোঁচকায় ক'খানি থানকাপড় আর ঘটি-কলসী নিয়ে সাতগাঁওয়ে শ্বশুরবাড়ি যখন এসে পৌঁছেছিলেন, বেলা তখন দুপুর। শাশুড়ি বর্তমান, তৃতীয় পুত্রবধূর স্থান তাই হয়ে গেছিল অনায়াসেই। না, অবহেলা কেউ করেনি তাকে, আর তাদের পাবার আশাও তিনি করেন নি। সকালে উঠে উঠোন ঝাঁট দেয়া, গোয়াল সাফ করা, ঘর নিকোনো, এসব নিয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল।

হেমন্তবালা সুন্দরী নন। কালো গায়ের রং, শরীরের হাড়গুলো যেন একটু বেশি পুষ্ট, পায়ের পাতাগুলো বড় বড়, হাতের আঙ্গুল কেমন চৌকো, নাকের ডগা বেশ মোটা, খানিকটা আলগা মাংস যেন লেগে আছে তাতে, চোখে নেই কোন ঝিলিক।

তবু আজকাল যেন একটু আলগা শ্রী এসেছে তাতে। মনটাও কেমন নিজের বলে মনে হয় না হেমন্তবালার। শীতের শেষে উঠোন ভর্তি আমপাতা ঝরে পড়ে, সকালে তা ঝাঁট দিতে দিতে ফুরফুরে হাওয়া গায়ে লাগতেই কেমন এক শিরশিরানি লাগে শরীরে। কপালে রসকলি এঁকে শেফালি-বোষ্টমি এসে গান গায়— 'শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে আছ গো সই ঘুমাইয়া'। ভিক্ষে দিতে এসে হেমন্তবালার ইচ্ছে করে বোষ্টমিকে বসিয়ে আরো দু'খানা গান শোনেন। ভাসুরপো রামেন্দু সদ্য বিয়ে করেছে, বৌটি সকালে ঘুম থেকে উঠলেই সকলের অলক্ষ্যে তাকে নজর-আন্দাজ

করেন তিনি, কৌতূহল আর কল্পনা মিলে মিশে শরীরের স্বাদ সম্পর্কে এক আবছা ধারণা জন্মায়, সেই মুহূর্তে উঠোনের কোনায় ফুটে থাকা অতসী ফুলের দিকে তাকিয়ে চোখের পলক পড়ে না তার। ভাগ্যিস হেমন্তবালার অসুন্দর শরীর কারো নজর কাড়ে না। সাতগাঁওয়ের ভট্চায কুলীনের বিধবা তিনি, একটু পা ফসকালেই নীচে গহন খাদ।

দেশ ভাগ হয়ে গেল, শাশুড়ি গত হয়েছেন তার আগেই। ভাসুরপো দেওরপোরা ক'দিন ধরেই হিন্দুস্থান যাওয়ার তোড়জোড় করছে। নিজেদের সামলাতেই ওরা অতিষ্ঠপ্রাণ, হেমন্তবালাকে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হবে না।

রামেন্দু বলে—'খুড়িমা দেখতেই পাচ্ছেন কোথায় গিয়ে উঠব, দুবেলা খাওয়া জুটবে কি না তার ঠিক নেই, এই অবস্থায় আপনি আর না এলেন। আপনি বুড়ি মানুষ, এখানে দিব্যি থাকতে পারবেন, আপনার ক্ষতি কেউ করবে না।'

হেমন্তবালাকে প্রণাম করে গরুর গাড়ি বোঝাই মালপত্র নিয়ে ওরা রওয়ানা হয়। ভাসুরপোর বৌ শিবানী কাঁদে। ওরা চলে যেতেই সারাটা বাড়ি খাঁ খাঁ করে। আশে পাশের জ্ঞাতি গোষ্ঠিরা অনেকেই চলে গেছে, চারদিক কেমন সুনসান। ভয় করে হেমন্তবালার। ক'দিন পর শেফালি বোষ্টমি শেষবারের মত ভিক্ষে নিতে আসে, ওরাও আখড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কয়েক মাইল হাঁটলেই বর্ডার পেরিয়ে ধর্মনগর, ওরা সেখানে গিয়ে নূতন আখড়া গড়বে। ভট্চায বাড়ির সেজ ঠাউকরাইন্‌কে কাঁদতে দেখে মায়া হল শেফালি বোষ্টমির। তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হল ওরা। বোঁচকায় যৎসামান্য সম্পত্তি, পেতলের কলসী আর ঘটি নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন হেমন্তবালা। পনের বছর আগে এমনি বোঁচকা হাতে থানকাপড় পরে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। সেদিনের সাথে আজকের হেমন্তবালার তফাৎ খুব একটা নেই। শুধু শরীর, রোদে-বানে কাজ করে আরো পেটানো মজবুত হয়ে গেছে।

ধর্মনগরে এসে হেমন্তবালা দেখেন দেশ-গাঁয়ের অনেকেই এখানে এসেছে। জ্ঞাতি সম্পর্কের এক দেওরপো এখানে বেশ নাম করা উকিল। প্রবোধ উকিলকে এখানকার সবাই এক ডাকে চেনে। তার বাড়িতেই প্রথমে এসে ওঠেন হেমন্তবালা। সেই তখন থেকেই এবাড়ি ওবাড়ির ব্যাপার পার্বণে ডাক পড়ে হেমন্তবালার। এমন গায়ে খাটতে পারে না এ তল্লাটে আর কেউ। বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন সব কাজেই তিন দিন ধরে রান্নার কাজ একাই সামলে দিতে পারেন তিনি। শুধু মাছ-মাংসের দিকটা অন্য কাউকে দেখতে হয়। উৎসবশেষে হেমন্তবালা পান একখানা থান কাপড় আর গুটিকয়েক টাকা।

এইভাবে কয়েকবছর কাটে। তারপর সস্তায় এই দুই গন্ডা জমি কিনে ফেলেন তিনি। সস্তা হবেই না বা কেন, চারটে বাড়ির মাঝখানে একটুকরো খটখটে টিলাজমি, পাটলি ফুল আর ভাটগাছের জঙ্গল ভরা। বেরুনোর জন্য রাস্তা নেই, অন্যের বাড়ির ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। একশ পঁচিশ টাকায় অবশ্য এর চাইতে ভাল কিছু পাওয়াও যেত না। প্রবোধ দলিল তৈরি করিয়ে দেয়।

সেই জমির আগাছা সাফ নিজের হাতে করেছেন হেমন্তবালা, মাটি কেটে জমিকে সমান করেছেন। বাঁশঝাড়টা ছিল বলে ঘর করার জন্য শুধু ছন কিনতে হয়েছে। কয়েক রোজের কামলা-খরচে টান পড়েছিল, তা প্রবোধের দয়ার শরীর, বাকি টাকাটা সে দিয়ে দেয়।

বাঁশের বেড়ায় গোবর মাটির প্রলেপ দিয়ে, মেঝে লাল মাটি দিয়ে লেপে পুঁছে তকতকে করে নিতে সময় লাগে না হেমন্তবালার। নিজেকে ধন্য মনে হয়। দেওয়ানপাশা বেশ গাঁ। শহর থেকে প্রায় চার মাইল ভেতরে। এখানে দোকানপাট নেই কোনো। বাজার-পত্র করার জন্য

শহরে যেতে হয়, এখানকার লোকেরা বলে 'টাউন যাচ্ছি'। সপ্তাহে অবশ্য দু-বার বিহারী কেরোসিনওয়ালা মাথায় টিনে করে কেরোসিন নিয়ে আসে বিক্রির জন্য। সাদা কেরোসিন ন'আনা সের। লাল আট আনা। লণ্ঠন জ্বালতে সবাই সাদা কেরোসিন ব্যবহার করে। লাল কেরোসিনে লণ্ঠন জ্বাললে নিমেষে চিমনিতে কালি পড়ে সব আলো ঢেকে যায়। ছোট টিনের ডিবে দিয়ে বানানো 'কুপি' অবশ্য লাল কেরোসিনে বেশ জ্বলে। শুধু সলতের ওপর থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে।

কদিন ধরেই কথাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছেন হেমন্তবালা। একদিন দুর্গানাম করে বি.ও.সি.-তে গিয়ে এক টিন কেরোসিন কিনে ঘাড়ে করে নিয়ে এলেন। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে সবাই তার কাছেই কেরোসিন পাবে, বিহারীর আশায় বসে থাকতে হবে না। এমন অভিনব কথা আগে কেউ শোনেনি। সবাই বেশ মজা পায়—হাসাহাসি করে। আবার একজন দুজন করে কেরোসিন নেওয়া শুরু করে তার কাছ থেকে। লাল, সাদা—দুরকম কেরোসিনই রেখেছেন তিনি। বেশ সুবিধে হয়েছে সবার।

দুর্গাদাসের ছেলে মোহিত পোষ্টাপিসে চাকরি করে। তাকে ধরে একখানি পাসবুক খুলে নিয়েছেন হেমন্তবালা। কেরোসিন কিনতে যাওয়ার দিন তারই সাহায্যে উইথড্রয়াল ফর্মে টিপছাপ দিয়ে টাকা তুলে নেন তিনি।

এখনো এর ওর বাড়িতে রান্নার ডাক পড়লে অবশ্য যান ঠিকই। পার্বণের আগের রাতে দশজনের মাঝে বসে আনাজ কুটতে, অধিবাসের গীতে দোহার দিতে, গল্পগাছা হাসিঠাট্টা করতে বড়ো আনন্দ। সেরকম বাড়ি হলে তো অঘ্রাণেই ফুলকপি-মটরশুঁটি আসে। মরশুমের মুখে বাজারে নতুন ওঠা সব্জি স্বাদে সুগন্ধে ভরিয়ে তোলে। জীবনে এর চাইতে বেশি আনন্দ আর কিসে!

অবরে-সবরে কখনো দুর্গাদাসের বুড়ি মা তকলি দিয়ে পৈতের সুতো কাটতে কাটতে গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবনের গল্প বলেন। সেসব গল্পও শুনতে আনন্দ হয় তবে কি সেই আনন্দ যেন বাইরে থেকে দেখা সুন্দর কিছু, তার ভাগ পাওয়া যায় না। তার চাইতে এই ফুলকপি-মটরশুঁটির স্বাদ ঘ্রাণের আনন্দ অনেক বেশি।

এখানকার লোকেরা কেরোসিনকে বলে 'কেরেছ-তেল'। যবে থেকে তিনি কেরোসিন বিক্রি করা শুরু করেছেন, তার নাম হয়েছে 'কেরেছ-বুড়ি'। আগে সবাই আড়ালে আবডালে বলত ; আজকালকার ছেলে ছোকরারা তো প্রত্যক্ষে বলে 'ও কেরেছ-বুড়ি, আজকাল তোমার সাদা-কেরেছ কেমন যেন লাল লাল দেখায়'। হেমন্তবালাকে রেগে উঠতে দেখলে মজা পায় ওরা। কিন্তু আজ পুকুরঘাটে মহীতোষ চৌধুরির নাতিগুলো যে ব্যবহারটা করল, আগে কেউ করেনি। অথচ ছেলেগুলোকে কেউ শাসন পর্যন্ত করল না। হেমন্তবালা বোঝেন, বয়স বাড়ার সাথে সাথে উনি কেমন যেন হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছেন সবার কাছে।

আজ মনটা তাই মুষড়ে আছে হেমন্তবালার। শুনেছেন, রামেন্দুরা রামকৃষ্ণনগরে বাড়িঘর করে বেশ আছে। বিধবা খুড়িমাকে একবার খোঁজও করল না। এই প্রথম যেন চোখ ফেটে জল আসে তার।

পারতপক্ষে বাজার করেন না হেমন্তবালা। শাকপাতা এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করে নেন, কখনো-সখনো একটু ডাল রেঁধে নেন। পরশু দুপয়সা দিয়ে রাজুর মার থেকে এক আঁটি মুলো কিনেছিলেন। এ সময় মুলো নাকি গরুতেও খায় না। সেই মুলোর ঝুঁটিগুলো পড়ে আছে, তাই কুচি কুচি করে কেটে যৎসামান্য তেলমশলা দিয়ে একগাদা হড়হড়ে তরকারি রাঁধেন হেমন্তবালা। খিদের পেটে তাই অমৃত লাগে, এক থালা ভর্তি ভাত খেয়ে ওঠেন তিনি।

তারপরই কেমন চোখ জড়িয়ে আসে। আজ কেরোসিন আনতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটু ঘুমিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন হেমন্তবালা। সন্ধের আগে নাথপাড়া থেকে সুবোধ কেরোসিন নিতে এসে ডাকাডাকি করে, সাড়া না পেয়ে চলে যায়।

সকাল প্রায় ন'টা পর্যন্ত হেমন্তবালার দুয়ার বন্ধ থাকে। প্রথমে খেয়াল হল দুর্গাদাসের বৌ কমলার। এসে ডাকাডাকি করে, সাড়া পায় না। হাঁকডাকে লোক জড়ো হয়ে যায়। পেছনের বাঁশের ঝাঁপ খুলে ঢুকতে গিয়ে ভক করে নাকে দুর্গন্ধ লাগে। খেয়াল করতে নজরে পড়ে, দরজার মুখ থেকে শুরু করে বাঁশঝাড় অব্দি বমি পায়খানায় একাকার হয়ে আছে। নাকে গামছা বেঁধে দুর্গাদাস-কমলা ঘরে ঢোকেন, হেমন্তবালার সারা শরীর শুয়ে চটচট করছে তখন, গলা দিয়ে চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে। বালতিতে করে জল এনে কমলা আস্তে আস্তে হেমন্তবালার শরীর পরিষ্কার করেন, চাদর, বালিশের ওয়াড় সব সরিয়ে বিছানায় একখানা থানকাপড় ভাঁজ করে বিছিয়ে দেন। ঘরদোর পরিষ্কার করেন।

কেউ একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু অন্তিম অবস্থা তখন। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা থাকে—'ডেথ ডিউ টু এ্যাকিউট ডিহাইড্রেশান'।

বিছানায় শিয়রের দিকে রাখা ছোট্ট টিনের তোরঙ মেঝেতে নামিয়ে আনেন মহীতোষ চৌধুরি, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, গ্রামের আরো মাতব্বরেরা। ছোট্ট টিপতালা একটানে খুলে যায়। ভেতরে আছে পোষ্টাপিসের পাসবুক, কয়েকটা উইথড্রয়াল ফর্ম, একটা রুদ্রাক্ষের মালা আর একটা কাঠের গোল কৌটো, লাল-সবুজ রং-এর নক্সা আবছা হয়ে আছে, কৌটোর মুখে লেখা 'বৌমা' শব্দটা পড়াই যায় না প্রায়। কৌটোর ভেতরে পাতলা কাগজে মোড়া একটি সোনার চেন।

গ্রামের লোকেরা এগিয়ে এসে মৃতদেহের সৎকার করে। তার আগেই অবশ্য মৃতা হেমন্তবালার বুড়ো আঙুলে কালি মাখিয়ে উইথড্রয়াল স্লিপে টিপসই করিয়ে নেয়া হয়েছে। ঠিক হয়, পাসবই-এর টাকাটা তুলে শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা হবে।

হিসেব করে দেখা গেল, প্রবোধের সাথে হেমন্তবালার তিনদিনের অশৌচের সম্পর্ক, শ্রাদ্ধাধিকারি সে হতে পারে। একাদশ দিবসে হেমন্তবালার পুরো উঠোন নিকিয়ে শ্রাদ্ধবাসর তৈরি হয়। পাড়ার মেয়ে-বৌরা সকাল থেকে ভুজ্যি সাজায়, রান্নার যোগাড় দেখে। পেতলের ঘটি আর কলস ব্রাহ্মণকে দান করে দেয়া স্থির হয়। ইতিমধ্যে সোনার চেনটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে কেউ বুঝতে পারে না।

প্রবোধের ডানহাতের অনামিকাতে কুশের আঙটি পরিয়ে দেন পুরুত, কলাগাছের খোল কেটে বানানো ভেরুতে সাজানো আলো চাল, দুধ, পুরুতের কথামত ডানহাত দিয়ে ভেরু স্পর্শ করে প্রবোধ, তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডানহাতের কনুই ছোঁয় ; মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করে—'প্রেতাঃ হেমন্তবালা…'

গাঁয়ের বুড়ো-জোয়ান অনেকেই একধারে বসে শ্রাদ্ধকার্য নিরীক্ষণ করে ; এত মনোযোগ হেমন্তবালা জীবদ্দশায় পেলে বর্তে যেতেন !

শ্রাদ্ধান্তে উঠোনে সারি সারি পাত পড়ে। পাসবুকের দুশো টাকার পুরোটাই খরচ হচ্ছে। ভট্টাচার্য-চৌধুরিরা মিলে খুব ভাল আয়োজন করেছে, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল-সঙ্গে বেগুনভাজা, মুগডালের সাথে আলুভাজা, আরো দু-পদ তরকারি, চাটনি-দই। কে একজন বলে ওঠে—'অনেক পুণ্য করেছিলেন কেরেছু-বুড়ি, তাইত এমন সহজেই মুক্তি পেলেন, বিছানায় পড়ে থাকতে হলে কে দেখত।'

কথাটা সমর্থন করে অনেক মাথা নড়ে।

সুধাময়ীর পরিচয়পত্র

আলপনা ঘোষ

দুপুরবেলা গায়ের ছায়া পায়ের কাছে গুটিশুটি এই অ্যাতোটুকু, টুকুশ টুকুশ হাঁটেন সুধাময়ী। শরীরটা এখনো চলে, ছেলেরা খেদিয়ে দিলেও চলে, মেয়ে খেদিয়ে দিলেও চলে। চুল ছিল একদা, দাঁড়ালে, খুলে এলো করে দিলে, কোমর ছাপিয়ে হাঁটুর পেছনে দুলত, তিন ছেলেমেয়ে কোলেকাঁখে নিয়ে প্রিয় গোস্বামীর বাড়ি রাঁধতে এসেছিলেন সেই কবে, নাকি নদে জেলা থেকে, তখনো হাত ঘুরিয়ে অমনি এলো খোঁপা করলে লোকে তাকিয়ে দেখত। নদে জেলা শ্বশুরঘর, বাপের বাড়ি নাকি ঢাকা, পুর্ববঙ্গ, অধুনা প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল 'বাংলাদেশ'। সুধাময়ীর ঢাকা জিলা মনে পড়ে কি পড়ে না, বাপ-মায়ের সঙ্গে রাতের আঁধারে নদী পার হওয়া আবছা মনে পড়ে, এপারে ক্যাম্প মনে পড়ে, তার বরাত ভালো তেমন ক্যাম্পের গল্প জমাট বাঁধার আগেই মামার বাড়ি মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জে চলে এলেন তাঁরা। রিফিউজি বলে, ভিটেমাটি ছাড়া বলে তাঁরা এখানে একটা করুণ গল্প হয়ে উঠতে পারতেন তো সুধার বাপের বিচক্ষণতায় আর তাঁর মায়ের তো একটাই ভাই, তা তিনিও গল্পের মামার মতো তেমন স্বার্থপর বা কঠিন হৃদয় ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি ছিলেন না বলে জামাইবাবুর পাঠানো টাকাপয়সা ঠিকঠাক ফেরৎ দেওয়াতে সুধাময়ীর বিয়ে পর্যন্ত চলে যায়—গল্পটা দানা বাঁধে না।

কখন যে গল্প শুরু হয় কে জানে।

পনেরো বছরে বিয়ে দিয়ে বাবা স্বর্গে গেলেন তো দুই নাতির পরে টুকটুকে নাতনী দেখে মার গল্পও ফুরল, তবু সুধাময়ীর কোনো গল্পই নেই। তাঁর সোনার খাটে গা তো রুপোর খাটে পা। নিজের বাড়ি, জমিজমা, শ্বশুরের টাকায় সুধাময়ীর বরের কাপড়ের দোকান, মাথার উপরে শ্বশুর তখনো বেঁচে, দুই ভাসুর আর জায়েরা, তাঁদের পাঁচটি একজনের অন্যজনের ছয়, এই এগারোটি ছেলেপুলে তখনই যখন সুধাময়ী, পনেরো বছরের ক্লাস ফোর পাশ খুকি বিয়ে হয়ে আসেন। এতগুলি লোকের রান্নার কাজ বউরাই করে—কুটনো বাটনা জোগাড় দেবার লোক থাকলেও বউদের হাতে রান্না ছাড়া খাবে না কেউ। সুধাময়ী মায়ের কাছে শেখা বাঙালে ঝালের তেজ কমিয়ে একটু মিঠে করে দিলেন তরকারির স্বাদ, সরষে ইলিশ আর তেল কইয়ের মাখো মাখো মশলায় তেল গড়ানো অল্প ঝোলে গরম ভাত মাখতেই স্বাদ পাওয়া যায় ঘ্রাণ আর দর্শনে, জিভে ঠেকানোর আগেই। তাঁর হাতের পিঠে পায়েস আর সিঙাড়া কচুরির খ্যাতি সুধাময়ীকে রান্নাঘরের দেবী বানিয়ে তুলেছিল। তাঁর অবশ্য ভালো লাগত—রাঁধতে, খাওয়াতে। অন্য কোনো শখও তো ছিল না—না সাজপোশাক, না সিনেমা থিয়েটার, না সেলাই বা বইপড়া। ঠাকুমা জেঠিমাদের কাছে ছেলেরা থাকলেও কোলের মেয়ে তারা ছিল মা-ন্যাওটা। সারাদিন যেমন তেমন, এ-কোল সে-কোল, এঘর-ওঘর, এ বারান্দা ও উঠোন, দাদাদের দলে বা দিদিদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ওঠাবসা, খেলাধুলা হলেও রাত্তিরে তারাময়ীর মায়ের গন্ধটি, মায়ের কোলটি চাই। তো সেই তারাময়ীই কিনা মাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল। আঙুল তুলে বলল, 'যে দরজা দিয়ে বেরোলে, ফের কোনোদিন সে দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে না। লোকের কথা ভেবে এতদিন সহ্য

করেছি, আর নয়, কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে, তোমারও হয়েছে তাই। সারা জীবনে তো অনেক খেলে, তবু হয়নি?' কী এত সহ্য করেছে তারামণী আর কীই-বা এত অসহ্য হয়ে উঠল তার যে নিজের মাকেই বাড়ি থেকে বের করে দিল সে? অতশত সুধাময়ী ভাবতে পারেন না, কেমন থতমতো বিহ্বল, পোঁটলা এক কাঁখে, বগলে শতরঞ্চি জড়ানো কাঁথা চাদরের বিছানা আর হাতে ছোট বালতিতে দু-চারখানা থালাবাটি বাসনকোসন, অবিকল ইন্দির ঠাকরুনটি হয়ে গাছতলায় বসলে পাড়ার কেউ এসে ডেকে নিয়ে যায়।

অথচ তারার বিয়ের জন্যই, সুধীর তারাকে বিয়ে করল বলেই তিনি প্রিয় গোস্বামীর বাড়ি ছাড়তে চেয়েছিলেন। প্রিয় ছাড়েননি তাঁকে। প্রিয় গোস্বামীর মায়ের সঙ্গে তাঁর শাশুড়ীর বাল্য বন্ধুত্ব ছিল। তা তিনিই, শ্বশুরবাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা সুধাময়ীর দুরবস্থা দেখে, আবার তাঁরও একটি বিশ্বাসী লোকের দরকার থাকাতে কেননা ছেলে বিপত্নীক, একটাই নাতি, ঘরদোর জমিজমা, এসব দেখাশোনা করার জন্য, তিনি একা পেরে উঠছিলেন না আর ; সুধাময়ীকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন সুধাময়ীর শ্বশুর মারা গেছেন, ভাসুররা আলাদা হয়েছেন, টেনিস বলের মতো এ সংসার ও সংসার করছেন, কাগজে দলিলে আঁকাবাঁকা হরফে নিজের নামটুকু লিখে ক্লাস ফোর পাশ সুধাময়ী স্বামীর দোকানের মালিকানা বদলে দিয়েছেন, সম্পত্তির অংশের দাবিও তুলে দিয়েছেন না জেনেই। তাঁর রান্নাঘরের সাম্রাজ্য তিন টুকরো হয়ে পূর্বগৌরব হারিয়েছে। এখন যার যার হেঁসেলের ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য। ফলে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুধাময়ীর এই নিরুপায় প্রস্থান বিচ্ছেদদৃশ্য হয়ে ওঠে শুধু তাঁরই কাছে—নতুন করে উদ্বাস্তু হলেন যেন তিনি।

টুকুশ টুকুশ হাঁটেন সুধাময়ী। কোমরের ব্যথায় সোজা হতে পারেন না চট করে, ডানপায়ের পাতা সামনে ফেললে গোটা শরীরটাই ডানদিকে ঝোঁকে তো বাঁ-হাত কোমরে দিয়ে ভারসাম্য রাখেন, আর তাতে তাঁর চলায় এক দোলা আসে, ডান পা ফেলা, কোমরে হাত, ডাইনে ঝোঁকা, বাঁ পা টানা। এ নাকি 'সায়াটিকা'—নলিন ডাক্তার বললেন, 'মাসিমা, ছেলের বাড়ি গিয়ে থাকেন। না হয় ছোটছেলের ওখানেই যান। একেবারে শুয়ে পড়লে কে দেখবে আপনাকে?' তা ছোটছেলের বাড়িও কি যাননি সুধাময়ী? বড়ছেলে দুলাল যেমন হিশেবি, ছোটছেলে মঙ্গল হল একেবারে উলটো। বড়ছেলের জল, পাউডার মিল্ক মিশিয়ে দুধবেচা ব্যবসা। লাল টালির ছাদ, পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির দেয়ালের দু-কামরার বাড়ি, উঠোনে লাউমাচা, তুলসী মঞ্চ এসব পরিপাটি সাজানো সংসারে তার বউ ও দুটি বাচ্চা ছাড়া তিনটি মইষানী আর একটি জার্সি গাই—তো সে সংসারে বুড়ো বয়সে সুধাময়ীর একটু দুধ জোটে না। প্রিয়র মা বেঁচে থাকতে বা প্রিয়র বাড়িতে থাকতে তাঁকে কাপড়চোপড়ের ভাবনা ভাবতে হয়নি, টাকাপয়সাও হাতে থাকত মাইনে বাবদ। খরচের তো উপলক্ষ ছিল না তেমন, ছেলেদের পড়ার খরচও প্রিয় দিতেন তা তারা লেখাপড়া না করলে কি আর করা যাবে। দুলাল ক্লাস টেন-এ আর মঙ্গল এইট-এ উঠে পড়া ছেড়ে দিল। দুলালকে গরু আর একটা মোষ কিনে দিয়েছিল প্রিয়ই। মঙ্গল মা-র সঙ্গে ঝগড়া করত। তখনই। লোকে প্রিয় আর সুধাময়ীকে নিয়ে নানা কথা বলত। প্রিয়র মা ততদিনে মারা গেছেন আর প্রিয়র ছেলে সুধীর কলকাতার কলেজে পড়ছে, ছুটিতে বাড়ি এলে তারাই তার দেখভাল করে, বকুনি খায়, আবার সুধীরের কাছে পড়েও। তারা মায়ের মতো অত সুন্দরী না হলেও তার হালকা ছিপছিপে শরীরের গড়নে রূপলাবণ্য ছিল। সুধাময়ী যখন প্রিয়কে তারার বিয়ের কথা বলেছেন আর প্রিয়ও

ছেলে খুঁজছেন তখন সুধীর বি এস-সি পাশ করে এক নার্শারি বানিয়ে ফেলেছে চাকরির পরোয়া না করেই। সে-ই তারাকে বিয়ে করে আলাদা হয়। প্রিয় মারা গেলে সুধীর ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে আসে। দুলাল সুধাময়ীকে নিয়ে যায়। তখন সুধাময়ীর হাতে টাকা ছিল, গয়নাও ছিল কিছু। ক-বছর ভালোই ছিলেন। একাদশীর ফল দুধ মিষ্টি। পূর্ণিমা অমাবস্যায় লুচি মোহনভোগ যেমনটি অভ্যাস হয়েছিল প্রিয়র বাড়িতে বা যেমনটি আবাল্য দেখে এসেছে দুলাল, প্রিয়র মা-ই তো এসব ব্যবস্থা করেছিলেন—'আহা অল্প বয়সের বিধবা, কোনো সাধ আহ্লাদই নেই তো একটু ঘি দুধ ছানাই খাক। এত বড় বাড়ি সামলানো, নিজের ছেলেপুলে মুনিষ-কামিন-এর খাওয়া জলপান দেওয়া, গরু-বাছুর সামলানো। গায়ে জোর না হলে পারবে? তো তখন থেকেই সুধাময়ী জানলেন একটু ঘি না হলে তাঁর আতপান্ন রোচে না, রাত্তিরে একবাটি দুধ হলে খই বা রুটি কেমন আরামে খাওয়া যায়, হালকা রঙের শাড়িতে তাঁকে দেখায় ভালো এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাধারণ ব্যাপারই, তো দুলাল তেমনটিই করতে বলে তার বউকে। তখন সুধাময়ী পুজোয়-পার্বণে নাতিদের জামা, মিষ্টি এটা সেটা দিতেন। হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে ছেলেকে বলেছিলেন গামছা আনতে, ছেলে টাকা চাইলে বলেন, 'তুই দিয়ে দে, আমার কাছে টাকা নেই।' দুলাল একটা গামছা এনে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এরপর সুধাময়ীর ঘি দুধে টান পড়ল। সেখান থেকে ছোটছেলের বাড়ি না বলে আস্তানায় বলাই ভালো। মঙ্গল বিয়ে-থা করেনি তখনো, একটু উলুক-সুলুক স্বভাব তার বয়ঃসন্ধি থেকেই। কোনো মেয়েতেই তার মন থিতু হয় না। তো সুধাময়ী ছেলের এক চিলতে ঘর বারান্দা জুড়ে সংসার পাতেন। নিজেই এক-দুখানা গয়না বেচলে ছেলে সে খবর পায় নির্ঘাৎ। 'করেছ কি মা? আমাকে দাও আমি বেচে দেব। ও শালা যদু স্যাকরা তোমায় ঠকিয়েছে।' দেননি সুধাময়ী কারণ গয়নাগুলো যদু স্যাকরাই বানিয়েছিল তার তরুণ বয়সে। মঙ্গল দিন দুয়েক বাজার করল না তো সুধাময়ী অস্থির, শেষে একখানা কানপাশা দিয়ে বলেন, 'এ দিয়ে কদিন হবে? কিছু কর? একখানা কানপাশা বিক্রি করে মঙ্গল তো আরেকখানা খোয়া যায়। দুদিন পরে পোঁটলা নিয়ে সুধাময়ী ফের বড়ছেলের বাড়িতে। কানপাশার সঙ্গে শেষ দু-চারখানা কুচো সোনাও গেছে কথাটা তিনি অনেকদিন বলেননি। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও অনেক গোপন কথা, গোপন রাখার ইচ্ছে থাকলেও মানুষ বলে ফেলে তেমনি রেশনের আতপ চালের ভাত আলু কুমড়োর তরকারি দিয়ে খেতে খেতে সুধাময়ী বলে ফেলেন, তাঁর গয়না চুরির কথাটা। শোকপ্রকাশের মতো কেঁদে কেঁদে। আজকাল তাঁর খালি খিদে পায়, পেচ্ছাব পায় ঘন ঘন, বেশি পেলে ধরেও রাখতে পারেন না তা কাপড় ভিজে যায়। একটা কাপড়কাচা সাবান, ছেলের সংসারের না বলে নিলে যে চুরি করা হয় না এটা তার আজন্মের অন্য কোনো বিশ্বাস বা সংস্কারের মতো ধারণা, তবু নেবার সময় তিনি চোরের মতোই নেন, আর জিগ্যেস করলে চোরের মতোই মিথ্যে বলেন যে তাঁর কাছে পয়সা ছিল, তিনি কিনেছেন। ফলে সাবান চুরির সঙ্গে সঙ্গে পয়সা চুরির অপবাদও তাঁর জোটে।

গল্প যে কখন শুরু হয়ে যায়!

পনেরো বছরের লাজুক কিশোরী সুধাময়ী। পাঁচজনের সংসারে আলাদা করে ভালোমন্দ খাওয়াতে পারতেন না বলে স্বামী লুকিয়ে রাত্তিরে সরভাজা, সরপুরিয়া খাইয়েছিলেন। সেই একদিনই। কোনমতে জল খেয়ে বুক ধড়ফড় পেট আইঢাই ওমা কি লজ্জা। কি লজ্জা! 'আর কোনোদিন এনো না গো, বাড়িতে এত ছেলেপুলে, তো আমি ধুমসি বিয়েঅলা মেয়ে লুকিয়ে

মিষ্টি খাব?' তখন কি তিনি জানতেন, আরো চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পরে মেয়ের বাড়ির ফ্রিজ খুলে আম আর সন্দেশ সরিয়েছিলেন বলে মেয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে? অতবড় সংসারে উদয়াস্ত খেটে গেছেন, মাসে যে চারদিন রান্নাঘরে ঢুকতে পেতেন না তখন যে রান্না করতেন তার অন্য কাজ সামলাতেন তিনি, কাজের থেকে তার ছুটি মেলেনি প্রিয় মারা যাওয়া পর্যন্ত। প্রিয়র শেষ কাজে তাঁকে হাত দিতে দেয়নি প্রিয়র আত্মীয়স্বজন। প্রিয়ও বোধহয় ভাবেননি এমন আচমকা অপ্রস্তুতভাবে তাঁকে চলে যেতে হবে। নইলে তিনি বলেছিলেন কিছু জমি আর বাড়ির একটা অংশ তিনি সুধাময়ীর নামে লিখে দেবেন। লোকে যাই বলুক প্রিয়কে তিনি কোনো কষ্ট দেননি, অসুখেবিসুখে, কাজেকর্মে প্রিয়র তাঁকে ছাড়া চলত না। এ এক অন্য ধরণের নির্ভরতা, অন্য এক মানসিক অবলম্বন। সুধাময়ী লেখাপড়া তেমন না জানলেও বুঝতেন। ঘোমটা ছাড়া মুখ দেখেনি প্রিয় সুধাময়ীর, তবু মাসে তেল সাবান এক কৌটো পাউডার আর স্নো আনতে ভুলতেন না। অসুখেবিসুখে ছাড়া প্রিয়র গায়ে মাথায় হাত দেননি সুধাময়ী, কিন্তু চুল আঁচড়িয়ে বা বেঁধে মুখে আলতো স্নো মেখে, গায়ে পাউডার দিয়ে খেতে দিতে গেলে প্রিয়র তৃপ্তি টের পেতেন। বিশ্ব সংসার কি জানে তাঁদের কথা! মা বেঁচে থাকতে সুধাময়ীকে তেমন খেয়াল করেননি প্রিয়। কিন্তু ভালো ফসল উঠলে, ঠিকমতো দর পেলে বা জমিটা বেচবেন কিনা এসব কথা শুনবারও তো একটা লোক চাই। তো তাঁর নীরব সেবা আর মৃদু আনাগোনার মধ্যে দিয়ে সুধাময়ী হয়ে ওঠেন প্রিয়র প্রান্তবয়সের সেই সঙ্গিনী। সুধীরও পছন্দ করত না তার শাশুড়ীমাকে, ফলে বারকয়েক এ ছেলের কাছে ও ছেলের কাছে কাটিয়ে সুধাময়ী মেয়েজামাই-এর বাড়ি এলে সে তারাকে বলে দেয়, 'এসেছেন যখন থাকুন কিছুদিন, কিন্তু বরাবর নয়।' তারা তবু বছর খানেক রেখেছিল মাকে, পুজোয় শায়া ব্লাউজ শাড়ি গামছা, একবেলা দুধ, একাদশীর ফল মিষ্টি সবই জোগাচ্ছিল সে স্বামীর সঙ্গে একরকম ঝগড়া করেই, কিন্তু তারও খেয়াল হয়নি সুধাময়ীর হাতে পয়সা নেই। তিনি একটু গুড়াকু দেন দাঁতে, খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট, একজোড়া হাওয়াই চটি হলে ভালো, হয়তো পাড়ারই কে যেন দেয়, তারাকে ঠেশ দিয়ে দুকথা শুনিয়ে 'আহা বুড়ো মানুষ অমন খালি পায়ে বেড়ান তো কি করি, নতুনই ছিল দু-একবার পরেছি' বলে পুরোনো একজোড়া স্যান্ডেল, গুড়াকুও আসে একইভাবে। বকেঝকে সেটা বন্ধ হল তো মেয়ে বলে, 'মা আমার পেনসিল বক্সে দুটো টাকা ছিল দেখছি না' ছেলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে 'দিদা কেমন হজমোলা খাচ্ছে' বলে। শেষে ফ্রিজ থেকে আম আর সন্দেশ নিয়ে বাটিতে ঢেকে রেখেছিলেন, নাতিই সেটা আবিষ্কার করে পিঁপড়ের সারি দেখে।

গল্পটা তাহলে শুরু হয়ে গেছে!

টুকুশ টুকুশ হাঁটছেন সুধাময়ী, বিছানাটা কমল ভট্টাচার্যের বাড়ির সিঁড়ির নীচে, থালা আর ঘটি বাদে বাকি বাসন অ্যালুমিনিয়ামের বাটি কয়েকটা হাতা, চামচ। ঘটিটা আর থালাটা ফুল কাঁসার—বালতিটা আছে অবিশ্যি, আর একটা পুরোনো থানে গেরো দিয়ে ছোট ছোট পুঁটলিতে ছাতু, চিনি, মুড়ি, খই, চিঁড়ে, যা যখন যেমন। গরমে অসুবিধে নেই, কারো উঠোনে বা বারান্দায় ঘুমিয়ে রাত কেটে যায়, তখন দুপুরে কষ্ট। গাছগুলোও যেন হাঁপায়, গরম নিঃশ্বাসে শরীর পোড়ে যেন, এমন হাওয়া বয়। ধুলো ওড়ে। কে দেবে এই গ্রীষ্মের আগুনঝরা দুপুরে ঠাণ্ডা মেঝে শীতল পাটি, ডাবের জল, আমপোড়া সরবৎ কি বেলের পানা? এ ঠাকুমার কোলের কাছে 'গল্প বলো ঠাকুমা' বলে কোনো উত্তরপুরুষ নেই, এ ঠাকুমার

ঝুলিতে কোনো গল্পও নেই। এ ঠাকুমা শুধু নিজেই এক গল্প হয়ে ওঠে।

টুকুশ টুকুশ হাঁটেন সুধাময়ী—শীতের দুপুর তবু ভালো—রোদের তাতে গা ঘামে না, পায়ের তলায় মাটি তাতে না, গাছের ছায়া ঝিরিঝিরি। সুধাময়ী জলভরা ঘটি নামিয়ে দুহাতে কাপড় শায়া আলগা করে খানিকটা তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাটি ভেজান। একেবারে ব্যস্ত রাস্তার ধারে ডাক্তারের বাড়ির পাঁচিলের গোড়ায়, কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে। লোকে বলে লাজলজ্জা নেই। তাও কি হয় মা, বয়স হয়েচে বলে কি লজ্জা নেই? কদমফুলের মতো ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুলে ঢাকা মাথার কাপড় তো সরে না তাঁর। আর পেচ্ছাপ পেলে তা সামলে রাখতে পারেন না বেশিক্ষণ। তাঁকে তো মাঠেই যেতে হয়, তো মাঠ তো সব সময় কাছাকাছি থাকে না, এভাবে কাপড়চোপড় না সামলালে গোটাটাই ভিজত যে! বসে বসে পেচ্ছাপ করলেও উঠতে কষ্ট হয় তাঁর, কেউ যেন ধরলে ভালো হত, দাঁড়ালে সে সমস্যা নেই। এখনো তো লাঠি ছাড়াই হাঁটেন তিনি। সারাটা দিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতেন আগে। লোকে শুনতও তাঁর কথা। চা পাতি, চিনি, চাল-ডাল-আলু, একটু তেল-নুন-মশলা দিত এ ও সে। খেতেও দিত কেউ কেউ। 'আহা বামুনের বিধবা, ছেলেমেয়ে দেখে না' এই রকম করুণা মাখানো কয়েক গরাস ভাতই তো। তা দিনকাল বদলেছে, প্রায়ই চা চিনি দিত মাস্টারের বউটা। গ্যাট ম্যাট হেঁটে যায় ব্যাগ নিয়ে, তাঁর দিকে ফিরেও চায় না। 'ও দিদিমা আজ কিছু নেই গো, ডিউটির ভাত দিতে হবে, কথা বলার সময় নেই, তুমি এখন এসো।' তো সুধাময়ীকে হাঁটতেই হয় বেশি। আজকাল বাড়ির বাইরে রোয়াক থাকে না। এই এতটুকু এতটুকু জায়গা নিয়ে বাড়ি, তো সুধাময়ী জিরোবেন কোথায়? এই ছোট শহরের স্টেশনটা খুব পছন্দ হয় ওঁর। সিমেন্টের কাঠের বেঞ্চি আছে লম্বা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে গাছের নীচে নীচে, একটাই ওয়েটিং রুম ফার্স্ট ক্লাসের জন্য তালাবন্ধ থাকে 'কী উইথ দ্য স্টেশন মাস্টার' এই বিজ্ঞপ্তি দরজায় লাগিয়ে। তা বাদেও পাকা ছাদের নীচে তিন দিক ঘেরা লম্বা সিমেন্টের বেঞ্চি ও মেঝেতে একটা অস্থায়ী একক সংসার পেতে ফেলেন সুধাময়ী। একটা ছোট তোলা উনুনে মাঠ থেকে কুড়োনো গোবর, শুকনো ডালপালার ওপরে পোড়া কয়লা, কাছেই চায়ের দোকান থেকে পাওয়া যায়, ছোট বাটিতে খুব চিনি দেওয়া লাল চা, কাপড়ে ছেঁকে এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাশে, সঙ্গে দুটো লেড়ো বিস্কুট দিয়ে এক ঝমঝম বৃষ্টির সকালে খেতে খেতে স্বামীর কথা মনে পড়ে তাঁর। কতদূর, যেন জন্মান্তরের পার থেকে তাঁর হাসিভরা মুখখানা আবছা মনে পড়ে। পুজোর সময় তাঁকে গাঢ় রঙের শাড়ি দিতেন। হালখাতায় শাদা খোলের চওড়া পাড় শান্তিপুরী। বৃষ্টির মধ্যেই একটা মালগাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ভিজতে ভিজতে গেল। এই মালগাড়ি করে যাচ্ছে গরু মোষ, দড়িতে ঝুলছে তাদের দেখভাল করার লোকেদের বা মালিকদের গামছা, লুঙ্গি। বৃষ্টির জন্য এক একটা কামরার সামনে ত্রিপল ঝোলানো। দুপুরে এক অনবদ্য খিচুড়ি রান্না করেন সুধাময়ী। শিশিতে এক ফোঁটা তেল নেই, ফুটন্ত জলে প্রথমে ডাল পরে চাল ছাড়েন, আধসেদ্ধ হলে হলুদ নুন মিষ্টি দেন। কাঠ খোলায় শুকনো লঙ্কা জিরে তেজপাতা ভেজে গুঁড়িয়ে নেন ছোট হামানদিস্তায়। খিচুড়িতে আলু পটল ছিল একটি করে। ভাজা মশলাটুকু ছড়িয়ে দিলে গন্ধে ভিজে বাতাস ম-ম করে। তাঁর মনে পড়ে কত তরিবৎ করে তিনি খিচুড়ি রাঁধতেন। ঘি ছাড়া খিচুড়ি রাঁধছেন তিনি? তবু খেতে বসে তিনি নিজেই চমৎকৃত। তিনি অবশ্য জানেন না এমন আতেলা চালে ডালে সেদ্ধ তাও বিনামশলায় এই ভারতবর্ষে কত শহরের ফুটপাথে বা কত গাঁয়েগঞ্জের ঘরের এক পুরোনো বাধ্যতামূলকভাবে

বা প্রয়োজনে উদ্ভাবিত্ রেসিপি। এ রন্ধন প্রণালী কোনো বইতে বা ম্যাগাজিনের পাতায় লেখা থাকে না, সেখানে বাসি রুটি বাঁচাতে তা ডিম দিয়ে সূর্যমুখী তেলে ভাজার নির্দেশ থাকে!

প্রিয় তাঁর রান্না খেতে ভালোবাসতেন। পেটের গোলমালে ভুগতেন বলে, শুক্তো, পাতলা মাছের ঝোল, গাঁদাল পাতার বড়া, ঘরে পাতা দই খাওয়াতেন। প্রিয় তাঁকে মাছ খেতে বলতেন। তিনি বলতেন, ছি, বিধবার মাছ খেতে নেই। প্রিয় বলতেন তিনিও খাবেন না, তো সুধাময়ী মুনিষকে দিয়ে টাটকা মাছ আনিয়ে রাঁধতেন। সেই প্রিয় মারা গেলেন হাসপাতালে। তিনি দেখতেও পাননি। পাড়া প্রতিবেশী আর খবর পেয়ে আসা আত্মীয় বন্ধুরাই প্রিয়কে শেষবারের মতো সাজিয়েছিলেন। মৃত প্রিয়র মুখ তিনি দেখেননি তাই প্রিয়র শান্তশ্রীমুখ স্মরণে আসে। খিচুড়ির গরাসে টপটপ করে সেই নিরুপায় স্মরণ ঝরে পড়ে। আজ প্রিয় বেঁচে থাকলে দুলাল, কি মঙ্গল কি তারা-সুধীরের কাছে তিনি যেতেন?

তো সুধাময়ী হাঁটেন টুকুশ টুকুশ—বেশ ছিলেন মাথার ওপর পাকা ছাদ, পাকা মেঝে, বেঞ্চিতে শোয়া, ইলেকট্রিক আলোয়। স্টেশনের লোক এসে একদিন ধমকালো, 'এ বুড়ি, এত নোংরা করেছিস কেন?' কী করে কী খবর যায় সুধীরের শাশুড়ী স্টেশনে জ্বরে গোঙান, তো বাগানের লোক পাঠিয়ে রিকশা করে তুলে আনে সুধীর! তারাকে বলে, পেছনে বাগানের কাছের ঘরটা সাফসুতরো করে দাও। থাকুক। এ মরেও না, লোকের কাছে মুখ দেখাতেও পারি না। খানিকটা চিকিৎসায় আর যত্নে-অযত্নে সুধাময়ী সেরে উঠে হেসেকেঁদে একশা হন। ওমা এই তো তাঁর প্রিয়র বাড়ি। এটা মালির ঘর, প্রিয়ই বানিয়েছিল সুধীরের নার্শারির জন্য। এখন একটা লাঠি লাগে সুধাময়ীর, তো সেই লাঠি ঠুকঠুকিয়ে চলে আসেন রান্নাঘরে। 'আজ, একটু দুধ দিস তারা কতদিন খাই না। আর পোস্তবড়া।'

'তুমি কী গো?' 'মা' আর বলে না তারা, বোধহয় বলতে পারে না সে। বস্তুত পাশাপাশি হেঁটে গেলে মা-মেয়ে বলবে না কেউ, স্বাস্থ্যে প্রাচুর্যে অলংকারে তারার মধ্যযৌবন দীপ্তশ্রী, সুধাময়ী কোমর বেঁকিয়ে চলা কোনো এক হা-ঘরে কেউ, এমনটিই দেখায় তাঁকে। মাস কয়েক পরে সুধাময়ীই আর থাকতে পারেন না। গোটা কয়েক ফরসা কাপড়, শায়া ব্লাউজ আর মস্ত কালো এক গোলা সাবান তাকে জোগায় তারা কিন্তু খিদেতে সুধাময়ী ছটফট করেন। তাঁর নিজে রাঁধার কোনো ব্যবস্থা নেই, রান্নাঘর থেকে তার বরাদ্দ ভাত-ডাল-তরকারি যখন আসে তখন তাঁর সকালের চা রুটি হজম হয়ে নাড়িভুড়ি হজম হবার জোগাড়। অথচ একাদশীর হিশেবটা তারার ঠিক থাকে। 'সারাদিন অত খাই খাই না করে ঠাকুরের নাম করলে তো পারো।' গজগজ করে তারা। 'স্টেশনে কত অজাত কুজাত ভিখিরিরা থাকে, মাগো কী করে সেখানে ছিলে? রান্না করে খেলে? ছি!' সুধাময়ী বোঝেন এরা তাঁকে যেতে দেবে না, তাড়ানো তো দূরের কথা। এ ঘরটা সাবেক বাড়ি থেকে দূরে। রাত্তিরে তাঁর কিছু হলে কেউ টের পাবে না। অমনি মরে পড়ে থাকবেন ভেবে সুধাময়ীর বড় ভয় করে। ঠিক ছেলেবেলার মতো ভয় করে তার, অথচ ছেলেবেলা মনে পড়ে না। যদি মনে পড়ত তাহলে দেখতেন অন্ধকারে চোখ বুজে বুজে উঠোন পেরিয়ে আসছেন রান্নাঘর থেকে। ওঘর থেকে ঠাকুমা হেঁকে বলছেন, 'কারে বাত্তি দেহাও বউমা, ওকি কিসু দ্যাহে? চক্ষু দুইডা বেবাক বুজা!' ছেলেবেলা মনে পড়ে না, যৌবন আবছা, ছেলেবেলার ভয় কোথা থেকে ঢুকে পড়ে সুধাময়ীর মনে, শরীরে, গলা কাঠ, ডাকতে চান, 'ও তারা? অ সুধীর?' তো স্বর ফোটে না।

বাগানে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, কত রকম সড়সড়, খড়খড় আওয়াজ হয়, সুধাময়ী বিছানা ভিজিয়ে ফেলেন। সকালে বাগানে জল দেয়ার পাইপ দিয়ে গাছের বদলে কাঁথা চাদরে জল দেন ঘরের মেঝেতে ডাঁই করে রেখে। সন্ধেবেলা পোঁটলা আর বালতি নিয়ে ফের একজনের বাড়ির সিঁড়ির নীচে রাখেন।

তারা বলে, 'মা-র রাস্তায় ঘোরা হ্যাবিট হয়ে গেছে।' আবার সুধাময়ী হাঁটেন টুকুশ টুকুশ। এবারে তাঁর হাতে একটা লাঠি। চলতে ফিরতে সুবিধা, কুকুর, বেড়াল, কাক, শালিখ তাড়াতেও সুবিধা। ঘি দুধ ছাড়া দিব্যি একবেলা চলে তার, দোকানে চা খান মাঝে মাঝে পয়সা দিয়ে, দোকানি বাসি কচুরি, ভাঙা মিষ্টি থাকলে দিয়ে বলে, 'খাও দিদিমা।' তো একদিন অমনি হাঁটছেন, দুটি চা-পাতা আর চিনি দিয়েছে কে যেন, কাঁকালে এক বোঝা শুকনো কাঠ, ছানু মণ্ডল ধরল তাঁকে, 'ও দিদিমা কোথায় যাচ্ছ?'

ছানু পঞ্চায়েতের সদস্য, সুধাময়ী জানেন, কষ্ট হলেও দাঁড়ান, 'ওই সত্যদের বাড়ি।'

ছানুর কপালে ভাঁজ পড়ে, সত্যশঙ্কর দাশ হেরে যাওয়া পঞ্চায়েত সদস্য। ওরই সিটটা ছানু জিতেছে, আর ওদের কাছ থেকেই এবার পঞ্চায়েত কেড়ে নিয়েছে ছানুদের পার্টি। 'কেন, সত্যদের বাড়ি কেন? সুধীরদার সাথে ঝগড়া করেছ?'

'ঝগড়া কেন করব বাবা, ওখানে ভালো লাগছিল না।'

'সত্য তোমায় থাকতে দিচ্ছে?'

কাঠের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা কষ্টকর আর এতসব কথাই-বা ছানু জিগ্যেস করছে কেন সুধাময়ী বোঝেন না। সকাল থেকে চা খাননি, শরীরটা তাই ঝিম মেরে আছে, কতকটা দরকারে, কতকটা ছানুকে এড়াবার জন্য তিনি বলেন, 'এট্টা টাকা হবে বাবা? গুড়াকু কিনব।'

একটা নয় দুটো টাকাই দেয় ছানু। বলে, 'শোনো দিদিমা সামনের লক্ষ্মীবার তেরো তারিখ বিডিও অপিসে ভোটের ফটো তোলা, সকাল সকাল আসবে। তোমার কাছে কাগজ আছে তো? ম্ম্হুঁহ্ তোমার কাছে থাকার কথা নয়, সুধীরদার কাছেও নয়, দুলালদার কাছে পাওয়া যাবে। পঞ্চেতে ভোট দিয়েছিলে দিদ্‌মা?'

কে জানে কবে শেষ ভোট দিয়েছিলেন সুধাময়ী। এক একবার ভোট দিতে যান, ভোট দেওয়া হয়ে যায় কেউ ধরে নিয়ে গেলে। ইন্দিরা গান্ধী যেবার খুন হল সেবার ভোট দিয়েছিলেন 'হাত' ছাপে। দুলালের বউয়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভোটের লাইনে। রাজীব গান্ধী খুন হবার পরের ভোটে দুলাল কিছু বলেনি বলে সকালে যাননি। দুপুরে তিনি কাকে যেন জিগ্যেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, আজ কি ভোট?' তো সে জবাব দেয়, 'যাও ঠাকুমা নইলে ছাপ্পা হয়ে যাবে।' তখনো বেশ লম্বা লাইন। তো ভোটের আপিসে গিয়ে জানেন তাঁর ভোট হয়ে গেছে। আর সেটা জেনে তাঁর খারাপ লাগে না। একজনের ভোট অন্যজন দিয়ে দিলে বরং খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম বাঁচে, এই যে রোদের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, এক গ্লাশ জল পর্যন্ত দেয় না কেউ, বুড়ো মানুষ বলে জায়গা ছেড়ে দেয় না, মেয়েরা কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে গল্পটল্প করে ছাতা মাথায় দিয়ে, তাঁকে কেউ জিগ্যেস পর্যন্ত করে না তিনি কেমন আছেন। কোমরে ব্যথা নিয়ে দাঁড়াতে তাঁর খুব কষ্ট হয়। ভোটের ছেলেরা অবশ্য তার আগে কদিন খুব আসে 'দিদ্‌মা, দিদ্‌মা' করে। দুলালের বাড়ি থাকলে ভোট দিতে হয় 'হাত' ছাপে আর তরার ওখানে থাকলে 'কাস্তে হাতুড়ি'তে। মঙ্গলের ওখানে ভোটের সময় থাকেননি কোনোবার তো জানেন না ওখানে থাকলে কিসে ভোট দিতে হবে। প্রিয় বেঁচে থাকতে তাঁকে

নিয়ে যেতেন রিকশা করে। প্রিয় অবশ্য নিজে যেতেন সাইকেলে। অতশত এখন মনেও পড়ে না। তা ভালোই হল, কেউ একজন তাঁর ভোটটা দিয়ে দিয়েছিল। একটা অসুবিধে অবশ্য আছে যে তিনি কোন চিহ্নে ছাপ দেবেন সেটা সে জানবে কি করে? হয়তো সে দাঁড়িপাল্লায় দিল বা তীরধনুকে দিল বা পদ্মফুলে দিল—কিন্তু তাতেই-বা কী? কোন চিহ্নে ভোট দিলে কী হয় তাই তো তিনি জেনে উঠতে পারেননি এই তিনকুড়ি পার করে দেওয়া বয়সেও। 'কাস্তে হাতুড়ি' চিহ্নে ভোট দিলেও তার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, 'হাত' চিহ্নে ভোট দিলেও তাঁকে রাস্তায় হাঁটতে হয় টুকুশ টুকুশ। পঞ্চেৎ ভোটের সময় খুনোখুনি হয়েছিল, তাতে মিলিটারি পুলিশ এসে ভরে গিয়েছিল জায়গাটা। সন্ধে রাতে দু-দুটো ছেলেকে নাকি কুপিয়ে মেরেছে একদল। একজন নাকি ভোটে জিতেছিল। তা ভোটে জিতেও যদি কেউ নিজেকে বাঁচাতে না পারে তেমন ভোটের দরকার কী? তেমন লোককে ভোট দিয়েও-বা কী হবে? যে নিজেকে বাঁচাতে পারে না সে অন্যকে বাঁচাবে কী করে? তিনি নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন বলে তার ছেলেমেয়েরা বেঁচেছে। একমাত্র তাঁর ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে করলে তাঁকে বাঁচাতে পারে। একটা স্থায়ী ঠিকানা দিতে পারে। ভোটের কাগজে অবশ্য তাঁর একটা ঠিকানা আছে। দুলালের ঠিকানা। তো সেই ঠিকানাটা একসময় সত্যি ছিল, এখন মিথ্যে হয়ে গেছে। সে বাড়িতে গেলে দুলাল, দুলালের বউ তাঁকে ঢুকতে দেবে না। তারা-সুধীর বের করে দিয়েও তাঁকে তুলে এনেছিল। আটকে রেখেছিল, সেখানেও তাঁর কোনো ঠিকানা ছিল না। সেখানে তিনি যদি মরে যেতেন কোনো এক রাতে, এক ফোঁটা জল পেতেন না। হয়তো ঘটা করে তাঁর শ্রাদ্ধ হত। যেমনটি হয়েছিল প্রিয়র। কিন্তু তাঁর চাইতে আর কে বেশি জানত প্রিয়র ভালোলাগা মন্দলাগা, প্রিয়র অসুখ-বিসুখ, সুখ-দুঃখের কথা? প্রিয়র বউকে তিনি দেখেননি, ফটো দেখেননি। প্রিয় তাঁর বউকে ভালোবাসতেন, নইলে ছেলে মানুষ করার ছুতোয় আর একটা বিয়ে করতে পারতেন। প্রিয়র মাও নাকি অনেক বলেছিলেন। একদিনে নয়, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে দুটো চারটে শব্দ কি বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রিয়র বউকেও তাঁর একরকম করে জানা হয়ে গিয়েছিল। চেনা হয়ে গিয়েছিল। হয়তো সেই চেনা বা জানাটা প্রিয়র চোখ দিয়ে, প্রিয়র মন দিয়ে, তবু সেই মৃতের সাথে জানাশোনায় জীবিতের সঙ্গেও চেনাজানা হয়, বউদিদির স্মরণের ভেতর দিয়ে তিনি আর প্রিয় কাছাকাছি হয়েছেন। তবে প্রিয়কে তিনি তাঁর স্বামীর কথা বলেননি। প্রিয়ও জানতে চাননি। পাঁচজনের সংসারে স্বামীকে খুব একটা বেশি আলাদা করে পাননি, সংসার ভাগাভাগি হল তো তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর। তাঁর স্বামী লোকজন ভালোবাসতেন। খাওয়াতে ভালোবাসতেন। সুধাময়ীরও আলাদা কোনো ভালোলাগা ছিল না। ছেলেপুলে রান্না খাওয়ানো এসব নিয়ে ভালোই ছিলেন। সেভাবেই তাঁর সংসারে থাকার কথা। সেভাবেই তাঁর সংসার থেকে যাবার কথা।

কিন্তু তাহলে তো কোনো গল্পই হত না।

ভোটের ফটোর ব্যাপারটা সত্য তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে। 'বুঝলে ঠাকুমা, এই হল তোমার আইডেনটিটি কার্ড, মানে পরিচয়পত্র। এই-ই হল তোমার রেশন কার্ড—' সত্য কথা শেষ করার আগেই সুধাময়ী বলে ওঠেন, 'দুলালের কাছে যে রেশন কার্ড আছে সেটি থাকবে না?' 'না, এটাই আসল।' 'নে এবার তোল, আমার নামে চাল তোল, চিনি তোল, গম তোল, কেরোসিন তোল, রেপসিড তেল তোল, সাবান তোল!' খুব আনন্দ হয় ওঁর। যেন এবারে তিনিই এসব কিনে আনবেন রেশন দোকান থেকে। আহা ভোটের ছবি থাকলে যদি পয়সা

দিত কেউ। 'আর একটা কথা, আর সেটাই হল আসল কথা তোমার ভোট তুমি ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না।' 'সে তো একশোবার।' তাহলে এই একটি জিনিশ তাঁর? শুধু তাঁর? এবারে সত্য একটু রসিকতা করে 'বুঝলে ঠাকুমা এ কার্ডের মানে হল তুমি ভারতবর্ষের নাগরিক মানে সিটিজেন মানে…' সত্য ঠিক বোঝাতে পারে না।

'মানে কী বাবা? কী বলছ বুজতে পাচ্ছি না।' সুধাময়ী বলেন।

'মানে তুমি যে এই দেশের লোক, আমাদের ঠাকুমা এটা তার প্রমাণ, কেউ তোমাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।'

তাই? তাই! আহ্ তাই! তাহলে তো সুধাময়ী ভোটের ছবি তুলতে যাবেন। কদিন উত্তেজনায় ঘুম হয় না তাঁর। বারে বারে বাইরে যান। ছবিটা তোলা হয়ে যাক। সেই কাড় নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে যাবেন। থাকবেন। দুলালের বউকে ঠেলে ঢুকে যাবেন ভেতরে, সেখানে তাঁর বেশিদিন ভালো লাগবে না জানেন। মঙ্গলের ওখানেও যাবেন। শত হোক পেটের ছেলে। বাপের বড় আদরের ছিল। তাঁর ছেলেমেয়েদের সকলেরই চেহারা ভালো; তার মধ্যে মঙ্গলই সবচেয়ে সুন্দর। নেশা করে বোধহয়, ভালো করে খায় না, শরীরটা শুকিয়ে গেছে ছেলেটার। তিনি মরে গেলে পরিচয়ের কাড়টা ওকেই দিয়ে যাবেন। তিনি দিয়ে গেলে মঙ্গল নিশ্চয় ওটা দেখিয়ে রেশন তুলতে পারবে। ছোট থেকেই বড়ডো জেদি আর একবগ্‌গা ছেলেটা। পড়াশুনায় ও-ই সবচাইতে ভালো ছিল। কী যে সব শুনেছিল কার কাছে, বলে কিনা, ওই এতটুকু বয়সেই বলে কিনা, 'প্রিয়কাকুর টাকায় পড়ব না। প্রিয়কাকুর ঘরে থাকব না। তুমিও থাকবে না।' চলেই গেল শেষ পর্যন্ত গ্যারেজের কাজে। এখন মনে হয় তিনিও চলে গেলে পারতেন। ছেলেটা তাহলে তাঁর গয়না চুরি করার মতো নষ্টদুষ্টু হয়ে যেত না।

সত্যশঙ্করের বাড়িতে একটা ঘর আছে। উঠোনের একপাশে। ছোট একটা ঘর। বোধহয় চাকরদের থাকার ঘর। তো সুধাময়ী সেখানেই আছেন। একটা দড়ির চার পাই-এর ওপর কাঁথা চাদরের বিছানা। একটা লোহার ভাঙা কড়াইতে নিজেই উনুন পেতে নিয়েছেন। সত্যর বউ তাঁকে চেনে। কত নাড়ু মোয়া খেয়েছে ছেলেবেলায় সেসব গল্প করে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে। তো তাঁর একবেলার চাল ডাল আনাজপাতি সে-ই দেয়। সুধাময়ীর ইচ্ছে করে যে বলেন, 'ও নমি, রোজ রোজ না দিয়ে একদিন দুটি বেশি করে দে মা, আমি কি বোস্টুমি না ভিকিরি?' তো ভয়ে বলেন না, কে জানে যদি বলে, 'বসতে পেলে শুতে চায়। যাও ঠাকুমা আর দেব না।' তাছাড়া অনেকখানি দিলে তিনি রাখবেন কীসে? তাঁর রান্নাঘর আর ভাঁড়ার সাজানোর প্রশংসা করত সবাই। স্বামী বলতেন 'অন্নপূন্না', প্রিয় বলতেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।' হায় এখনো যে তাঁর ইচ্ছে করে তেমন সারি সারি ঝকঝকে বয়ামে তেল মশলা, ডাল, বড়ি, নাড়ু, মোয়া, আচার রাখেন। বড় বড় টিনে চাল, গম, আটা, ছোট টিনে বাসমতী, গোবিন্দভোগ। পরিচয় কাড় পেলে তিনি কৌটো চেয়ে নেবেন সত্যর বউয়ের কাছে। চাল, গম, তেল, চিনি রাখবেন তাতে। সত্যর বাড়িতে থাকেন তাই ওর কাছে পয়সা চাইতে লজ্জা করে তো সত্য এসে একদিন বলে, 'ঠাকুমা তুমি ছানুর কাছে পয়সা চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ বাবা, গুড়াকু ছিল না।' সুধাময়ী ভয় পান।

'আমাকে বললে না কেন?'

'না তুই কত কচ্চিস বাবা, তো সেও তো দিদ্‌মা বলে।'

'ও হল সব ভোটের নাতি। না না, আমাকেই বোলো।'

গল্প কেমন স্বাধীনভাবে চলে!

আজ সেই তেরোই এপ্রিল। আগে কয়েকদিন ধরে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে কোথায় কোথায় কটা থেকে কটা পর্যন্ত ছবি তোলা হবে। সুধাময়ীকে যেতে হবে বিডিও অফিসে। সত্য বলে গেছে, 'সকাল সকাল যেও ঠাকুমা, তাহলে রোদ লাগবে না। একদিনে করেছে সব, আমার মরবারও সময় নেই ; বলে সে হিরো হন্ডা হাঁকিয়ে বউ নিয়ে বেরিয়ে যায়। আধঘণ্টা বাদে তার বউ ফেরে অন্য কার একটা স্কুটারে চেপে। হলুদ সিল্কের শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে ভেতর থেকেই বলে, 'ওমা ঠাকুমা এখনো যাওনি? কী করছ এতক্ষণ।'

কালকে মনে ছিল না—আজ সকালে উঠেই কম ছেঁড়া ধুতিটা কেচে মেলে দিয়েছেন সুধাময়ী। চান করে কাঠকুটো জ্বেলে চা বানিয়ে খাচ্ছিলেন শুকনো চিঁড়ে দিয়ে। সত্যদের বাগানটা মাঝারি, তাঁর ঘরটা একপাশে হলেও হাঁক পাড়া দূরত্বে। ঘরের ওপরে কৃষ্ণচূড়ার ছায়া দোলে। এখনো ফুল ফোটেনি তবু পাতাগুলি নবীন।

ছানু সুধাময়ীকে দেখে দৌড়ে আসে, 'এসো দিদিমা, দেখি তোমার কাগজটা? এদিকে এই লাইনে দাঁড়াও।' বলতে বলতে পেছন থেকে সত্যশঙ্কর উঁকি মারে, 'এত দেরি করলে ঠাকুমা? এদিকে এসো, ছায়ায় দাঁড়াও, বুড়ো মানুষ, অ্যাই নীলা তোর পেছনে ঠাকুমা রইল ডেকে নিস। ঠাকুমা, নীলা তোমায় ডেকে নেবে।' বলে সত্য আবার গেটের দিকে যায়।

সাতজন সাতজন করে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরে, যেখানে ফটো তোলা হচ্ছে, ঢোকে। পুরোনো বাড়ি বলে ভিত উঁচু—পাঁচ-ছটা সিঁড়ির ধাপ। এক ভদ্রমহিলা, বয়স্কা, দুজনের কাঁধে ভর রেখে নেমে আসেন, নীচে স্বামী, তাঁরও লাঠির ভর বাঁ-হাতে, তবু কে জানে কত বছরের অভ্যাসে ডানহাতটা বাড়িয়ে দেন স্ত্রীর দিকে। 'সরুন দাদু' বলে লাইন ভেঙে এক মিঠুন ছাঁট দুহাতে ধরে একাই নামিয়ে দেয় মহিলাকে। পেছন থেকে কেউ একজন বলে, 'ছবির পরে সন্দেশ খাওয়াবে গুরু, বাক্স এসে গেছে!' সত্যি বড় ব্যাগে অনেকগুলো সন্দেশের প্যাকেট আসে । নামানো হয়। বারান্দা দিয়ে তা ভিতরে চলেও যায়। 'অ্যাই, অ্যাই আজই কিন্তু কাকে ভোট দিবি ঠিক হয়ে যাবে।' 'সে কিরে। ক্যান্ডিডেট কই?' 'ছাড় ওসব ক্যান্ডিডেট ফ্যান্ডিডেট বাজে কতা, আসল হল পার্টি—তুমি কোন পার্টিকে ভোট দেবে আজই ঠিক হবে।' এ শালা কি সেজেছিস! সেন্টু মাখিসনি? ফটো দিয়ে গন্ধ বেরবে!' 'আরে মিলন, দাড়ি-ফাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিস যে! চুল ছেঁটেছিস, ক কী ব্যাপার?' 'আরে না না, বাবা বলল একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক তা এরকম কাপালিকের মতো চেহারায় ফটো তুলবি ? তাই।' 'মেয়েগুলোর সাজ দ্যাখ যেন বিয়েবাড়ি। চুলে ফুলটাই দেয়নি।' 'ফুল দিলে তো ভালোই হত রে। গরম কমত। কি সব দিয়েছে সারা মাথায় চকচক করছে।' 'ক্লিপ হেয়ার ব্যান্ড হবে হয়তো।'

' ও দিদিমা এসো এসো।' কি যেন ভাবছিলেন সুধাময়ী। নীলার ডাকে চমকে উঠেন। পেছনের মেয়েটি ওঁকে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। কোমরে হাত, সিঁড়িতে পা, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো দুজন টেনে তোলে ওঁকে। 'এইদিকে' চেয়ারে বসা লোকটি 'দেখি' বলে ওঁর কাগজটা দেখে বলে 'ওইদিকে'। ডানদিকে, করিডর ধরে এগিয়ে যান তিনি নীলার পেছন পেছন। পেচ্ছাপ পাচ্ছে তাঁর। একটা লম্বা টেবিলের একধারে বারান্দার গ্রিলে পিঠ দেওয়া চেয়ারে বসা দুটি লোক। 'নাম বলুন আপনার, নম্বর কত?' 'সুধাময়ী দেবী, নম্বর

জানি না বাবা।' 'ঠিক আছে নম্বর বলতে হবে না। টাইটেল বলুন, সুধাময়ী কী?'

কয়েক সেকেন্ড মনে পড়ে না সুধাময়ীর শ্বশুরবাড়ির পদবি, যেন কত যুগ আগের কথা, তারপর মনে পড়ে, মনে পড়ে, বিবাহ মনে পড়ে, মন্ত্রোচ্চারণ মনে পড়ে, সপ্তপদী মনে পড়ে, কনকাঞ্জলি মনে পড়ে, কড়ি খেলা মনে পড়ে, কি লজ্জা, কি লজ্জা, ফুলশয্যা মনে পড়ে। 'কি হল দেরি করছেন কেন, বলুন?' এ পাশের লোকটি ধমকায়।

'ভট্টাচাজ্জি। সুধাময়ী ভট্টাচাজ্জি বাবা।'

'পেয়েছি। একুশ নম্বর যান।' সামনের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখায় লোকটি আর সুধাময়ী খানিকটা বিহ্বল হয়ে ঢুকে পড়েন প্রায় টুলে বসা একটা লোকের গায়ের কাছে। 'এদিকে নয়, এপাশে দাঁড়ান।' সুধাময়ী টিভি চেনেন, তো সেইরকম একটা কিছু দেখেন টেবিলের ওপর তো তাতে কোনো শব্দ নেই, ছবি নেই, একটা লোক হাতে কি একটা কালো মতন মেশিন, ছোট ওটার থেকে, নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার পেছনে আর দুপাশে উঁকি দেওয়া আরো কয়েকজন। 'হয়ে গেছে, হয়ে গেছে যান যান' বলে তাঁকে পাশের ঘরের দিকে ঠেলে দেয় কেউ। ঠ্যালা খেতে খেতে সুধাময়ী কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'ছবি হয়ে গেছে বাবা? কখন হল?'

বেরিয়ে এসে সুধাময়ী ছানুকে খোঁজেন, দেখেন ভিড়ের মধ্যে। 'ও বাবা ছানু, কাড্ কখন দেবে?' তিন-চারবার বলার পর ছানু বরাভয় দেবার মতো হাত তোলে, 'সময় হলেই পাবে। বুঝলে এ হল শেষন সাহেবের গুঁতো, শালা সুড় সুড় করে ফটো তোলাচ্ছে', শেষ বাক্যটা অন্য একজনকে। 'দেখ দাদা, ঠিক লোকের ভুল ফটো যেন না তোলে!' একটা সমবেত হাসির হাওয়া পাক খেয়ে চলে যায় সুধাময়ীর মাথার ওপর দিয়ে। তিনি হাঁটেন টুকুশ টুকুশ। সত্যকে খোঁজেন। দেখতে পান না। হয়তো তার হিরো হন্ডা অন্য কোন বুথের সামনে। খুব পেচ্ছাপ পেয়েছে সুধাময়ীর। জল তেষ্টাও পেয়েছে। খিদেতে পেটের ভিতর মোচড়াচ্ছে। বিডিও অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি রাস্তা পেরিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় অফিসের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ান। শায়া কাপড় একটু তুলে ছড়িয়ে ধরেন। মাটি ভেজাতে ভেজাতে ভাবেন বাড়ি গিয়ে সত্যকে জিগ্যেস করবেন কবে তাঁর পরিচয় কাড্ পাবেন।

অন্য বৃষ্টির গল্প

সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার

'দাদু আমাকে অন্য বৃষ্টির গল্প বলো,' বলতে বলতে তোতন এসে ঢুকল ঠাকুরদার আলোয়ানের ভেতরে। শীত পড়েনি। তবুও ভাস্কর রায়চৌধুরী গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে ঘরের লাগোয়া একান্ত নিজস্ব বারান্দায় বসেছিলেন। তোতনের যে ঠিক শীত করছিল তা নয়। দাদুর চাদরের আকর্ষণ অন্য। মোটা কব্জি চেপে ধরে অন্য বৃষ্টির মতো গল্প শোনা। ওসব বইয়ে পাওয়া যায় না। বিলেত থেকে পিসিমণির পাঠানো ফেয়ারি টেলসের বইতেও নয়।

অবসরপ্রাপ্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দাদু, তোতনের চুলের মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বললেন, 'অন্য বৃষ্টির গল্প আজ নয়, আরেক দিন। আজকে মণীশদের বাগানের গাজরের গল্প।'

'মণীশ কে?' জিজ্ঞেস করল তোতন।

'মণীশ হল চকমকিদের বাড়ির আমগাছে থাকা কাঠবেড়ালি।'

'কাঠবেড়ালি কি স্কুইরিল?' ছ'বছরের তোতন বই থেকে জেনেছে শব্দ, প্রতিশব্দ। 'ওদের পিঠে কালো দাগ থাকে তুমি দেখেছ?' ভাস্কর রায়চৌধুরীর চোখের সামনে ভাসে বুড়ো কদমগাছের ডাল বেয়ে মসজিদের আনাচ-কানাচ করে বেড়ানো কাঠবেড়ালি। ঘন হয়ে আসা আশ্বিনের সন্ধেয় তোতন দেখতে পায় না ক্রোটন গাছের হলদে-লাল-সবুজ পাতায় কড়া সূর্যের আলো ঝলমল। সবে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ধুলো ধোয়া পাতা ঘেরা বাগানে কালো কাক ভিজে পালক শুকোতে গিয়ে রোঁয়া ফুলিয়ে বুকের শাদা বের করে বসে।

'দাদু, তুমি কাঠবেড়ালি দেখেছ?' ছোট পাঁচটা আঙুল দিয়ে তোতন দাদুকে ফিরিয়ে আনে! দাদু একা একা চলে যাচ্ছিল কি না! সেরকম কথা নয়। যেখানে যাবে তোতনকে নিয়ে যেতে হবে। ওর এগারোতলার ফ্ল্যাটের জানালায় কাঠবেড়ালি উঁকি দেয় না। স্কুলের বাঁধানো মাঠেও না। যে কটা গাছ ছিল, স্কুলের নতুন বাড়ি হতে গিয়ে সব কেটেকুটে ভুট্টিনাশ। গাছ, পাতা, কাঠবেড়ালি, পাখি এখন পিসিমণির মতো দূরের। কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে অন্যরকম আনন্দ, হাত ভর্তি বিলিতি খেলনার মতোই প্রায় মজা। হ্যাঁ, ভাস্কর রায়চৌধুরী দেখেছেন। তবু আবার দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করছেন। স্ত্রী, প্রতিভা, হাঁটু পাল্টাতে বিলেতে মেয়ের কাছে গিয়েছেন। ব্যাপারটা হতে বছর দুয়েক সময় লাগবে। বিদিশা লিখেছিল, 'ডাক্তার অল্পবয়েসী, আমাদের সঙ্গেই পাস করেছে। হাসতে হাসতে মাকে বলল, তারপর, চাইলে আপনি ব্যালেও শিখতে পারেন। মার মুখ দেখে মনে হল না ব্যালে শেখার প্রবল আগ্রহে ভুগছেন।'

তাই ল্যান্সডাউন-রোডের বড় বাড়িটা আপাতত ফাঁকা রেখে, ছেলে হীরক আর তার বউ প্রজ্ঞার বালিগঞ্জ পার্ক রোডের ফ্ল্যাটে থাকতে রাজি হয়েছেন ভাস্কর। তবে একটা শর্তে। ল্যান্সডাউনের শোয়ার ঘরের আসবাব ছাড়া তাঁর চলবে না। কিছুকাল আগে, কিংবদন্তী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বাবাকে হীরক, সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ারিঙের আরও এক নিদর্শনের বিবরণ হিসেবে, ওদের বাড়ির চোদ্দতলার পেন্টহাউজে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো তোলার কথা শুনিয়েছিল। তখনও প্রতিভার চিকিৎসার কথা শুরু হয়নি। তারপর বাড়ি ছেড়ে সাময়িকভাবে ফ্ল্যাটে থাকার কথা উঠতে ভাস্কর আসবাবের কথা তুললেন। হীরক তখন আর তোলাকে

কেন্দ্র করে আপত্তি করতে পারেনি। এগারোতলার ফ্ল্যাটে উঠল ল্যাজারাসের মেহগনির আলমারি, ইতালির শ্বেতপাথর দেওয়া দেরাজ, বেলজিয়ান আয়না লাগানো ড্রেসার। বড় ইজি চেয়ার, টুকিটাকি আরও কয়েকটা জিনিস।

তোতনের চোখের সামনে রাতারাতি গজিয়ে উঠল দাদুর ঘর নামক এক অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্য। ওদের ক্রোমিয়াম, কাচ আর প্লাস্টিকের রিনরিনে ফ্ল্যাটে দাদুর কালো অন্ধকার কারুকাজ করা আসবাবে পাখোয়াজের ভারী বোলের দুর্নিবার আকর্ষণ তোতনকে বারবার টানে। ওর মনে হয় এক্কেকটা ফার্নিচার যেন এক্কেকটা গল্প। আর সবের মধ্যে সম্রাটের মতো দাদু বুড়ো, কিন্তু আবার বুড়োও নয়। চকচকে মজাদার। মার মতো নয়, বাবার মতোও নয়, একেবারে আলাদা, বিশেষ কেউ। ছুটে ছুটে চলে আসে এ ঘরে। উষ্ণতা টের পায় কতটা অন্ধকার, নরম কাঠের আর কতটা দাদুর ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। উষ্ণতা, রহস্য, দাদু, কাঠ, গল্প সব মিলেমিশে যে অদ্ভুত স্বপ্ন তৈরি হয় ওর অপরিণত মনে, তা ব্যক্ত করার মতো ভাষাজ্ঞান তোতনের হয়নি।

পার্ক সার্কাসের ডি লাইট মাইন্ডেডের অফিসে সিনিয়র থেরাপিস্ট প্রজ্ঞাকে পৌঁছতে হয় সাড়ে দশটার মধ্যে। সাড়ে নটা নাগাদ হীরক বেরিয়ে যায়। তারপর আধঘণ্টার মধ্যে রান্নার লোককে শ্বশুর আর ছেলের দুপুরের খাবার তৈরির নির্দেশ। দিতে দিতে সেদিন প্রজ্ঞা দেখল তোতন কাঁচা সব্জির থালার উপর হুমড়ি খেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে চলেছে। কথা বলতে বলতেই কান পাতল প্রজ্ঞা।

'এইবার তোমাকে কেটেকুটে ঝোল করার আগে যদি পারো, পালাও! নয়তো রমামাসি খপ্ করে ধরে ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলবে,' বলে তোতন ব্যগ্র হয়ে থালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বিড়বিড় করে উঠল, 'যাও বলছি, সময় থাকতে পালাও!'

'কী হচ্ছে তোতন?' জিজ্ঞেস করল প্রজ্ঞা।

'মণীশের গাজর পালিয়ে গিয়েছিল মা। ওরা পালাচ্ছে না কেন?'

প্রজ্ঞা অবাক হয়ে তোতনের দিকে তাকাল। 'কে মণীশ?'

তোতন একটা বড় নিঃশ্বাস নিল।

'চকমকিদের বাগানের কাঠবেড়ালি। দাদু বলেছে। মা, তুমি কাঠবেড়ালি দেখেছ? দাদু দেখেছে। ওদের পিঠে কালো দাগ হয় কেন, জানো? দাদু বলেছে রাম হাত বুলিয়ে দিয়েছিল বলে। কাঠবেড়ালিরাও দাদুর মতো ব্রিজ বানায়, জানো মা। বাপিও কি ব্রিজ বানায়?'

প্রজ্ঞা চোখ বন্ধ করে ফেলল। ক'দিন আগেই এ ব্যাপারে ও বেশ কড়াভাবেই ভাস্করকে বলেছিল, 'কেন যে ওকে আজগুবি সব গল্প শোনান! তার চেয়ে বিজ্ঞানীদের কথা শুনলে ওর অন্তত একটা ওরিয়েন্টেশন হবে। এটা ওর ফরমেটিভ এজ। এখন যা শুনবে তা ওর ওপর গভীর ছাপ ফেলবে। আপনি নিজে এত বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার, বাবা। তাহলে আপনার সঙ্গে আর পাঁচটা দাদুর তফাত কী রইল? কিম্ভুত সব গল্প শুনিয়ে…'

'স্বপ্ন দেখতে শিখবে, মাগো,' কথার মাঝখানেই স্মিতহাস্যে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলেন ভাস্কর।

সেদিনও অফিস যাওয়ার তাড়া ছিল। ছোট্ট উত্তরের কোনও অর্থ করতে না পেরে প্রজ্ঞা নিজের উপর আর ভাস্করের উপরেও অসন্তোষ ও চাপা বিরক্তি নিয়ে অফিসে দৌড়েছিল।

আজ আরও একবার মেজাজ খারাপ করতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও তোতনের সজির থালার সঙ্গে কথা বলাটা তেমন সুবিধের ঠেকল না। স্কুলের মিস যদি একদিন ডেকে অভিযোগ করেন তোতন আজকাল খাতা-পেনসিলের সঙ্গে কথা বলছে, তখন থেরাপিস্ট মা হয়ে তার কী জবাব দেবে। ওকে তো মাইল্ড কেস অফ ইনফ্যান্টাইল ডিলিউশনের পর্যায়ে ফেলা যায়। হীরকের ওপরেও বিরক্ত লাগছে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভাস্করকে হীরক দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করে। একা হীরকই নয়। ওর ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা, ভাস্করকে শুধু চোখে দেখার জন্য, আবার সবসময় ওঁর পরামর্শ নিতে প্রায়ই প্রজ্ঞাদের ফ্ল্যাটে হাজির হয়। এ হেন বাবার বিরুদ্ধে কোনওরকম নালিশকেই হীরক তেমন গুরুত্ব দিতে পারে না, চায়ও না বলে প্রজ্ঞার ধারণা। ভাঁড়ার দিতে দিতে, তা সত্ত্বেও হীরকের সঙ্গে কথা বলার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে প্রজ্ঞা। তারপর ভাল করে চাল সেদ্ধ করার দৈনিক নির্দেশ দিতে দিতে সজির থালার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়। যাক্, কোনও সজিই পালায়নি! পরক্ষণেই চমকে ওঠে। এ কী করছে, ও! আচ্ছা পাগলামির পাল্লায় পড়া গেল। কঠিন গলায় নিজেকে বকে উঠল, মনে মনে। একটু ভয়ও হল। এত সাজেস্টিভ তো ও কখনও ছিল না? তাহলে কি কোনও কারণে অত্যধিক স্ট্রেস হচ্ছে।

ডি লাইট মাইন্ডেডের হিমশীতল অফিসে ঢুকেও অস্বস্তিবোধ কাটাতে পারল না প্রজ্ঞা। অন্যদের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা ভয়-অস্বস্তি-অসন্তোষকে টেনে বের করে সমস্যা সমাধানের পেশায় সিদ্ধহস্ত হলেও, নিজের অবচেতনের খোসা ছাড়াতে অসুবিধেই হচ্ছিল। দুপুরে চারতলার ক্যাফেটিরিয়ায় উঠে তাই জেরুর সঙ্গে দেখা হতে হাতে চাঁদ পেল। স্ট্রেস থেরাপিতে জেরু আজকাল বেশ নাম করেছে। পার্সি মেয়ে। দেখামাত্রই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল পরস্পরকে। তারপর, দুজনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও একরকম বন্ধুত্বও।

কাচের জানালার বাইরে খোলা আকাশ। নিচের বড় রাস্তায় দুপুরের ভিড়। ঠাণ্ডা ঘরে আওয়াজ, তাপ, ধুলো কিছুই ঢোকার জো নেই।

'সো ওয়াট সিমস টু বি দ্য প্রবলেম?' জোড়া ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জেরু।

শুরু হল থেরাপিস্ট-টু থেরাপিস্ট বাক্যালাপ। ছ'মাস আগে শ্বশুরের এ বাড়িতে আসা, ছেলের সঙ্গে তাঁর ভাব, ওঁর সঙ্গে হীরকের সম্পর্ক, ওর নিজের সম্পর্ক, হীরকের সঙ্গে ওর নিজের দৈহিক, মানসিক সম্পর্ক, তাবত খবর, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের লাঞ্চব্রেকে ক্যাপসুল আকারে জেরুকে বলল। মন দিয়ে শুনল জেরু। ওর মুখ দেখে প্রজ্ঞার মনে হল, কোথাও মাঝারি আকারের গোলমালের সন্ধান হয়তো পেয়েছে। দিন কতক পরে ওর খুপরিতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে উঠে পড়ল জেরু। কাজ আছে। দুটো প্রায় বাজে। প্রজ্ঞারও এইবার পেশেন্ট আসতে শুরু করবে।

ঘরে ঢুকে বাড়িতে ফোন করল প্রজ্ঞা। টেলিফোন তোতনই ধরল। আর ধরেই আরেক দফা আজগুবি গল্প শোনাল। বোঝাই গেল শব্দটা সবে শিখেছে, উচ্চারণ এখনও সড়গড় হয়নি, তবু বলল, 'জানো মা, সমস্যা একটা এসেছিল। কিন্তু দাদু সেটা খামে পুরে পোস্ট করে দিয়েছে। ও আর আসবে না। সমস্যাকে তুমি চেনো, মা?'

'না বাবা, সমস্যাকে আমি চিনি না। বাড়ি গিয়ে সমস্যার কথা শুনব। তুমি কিন্তু এখন আর দাদুকে বিরক্ত করবে না। টিভি দেখবে। আজ দুপুরে ওরা অঙ্ক শেখাবে। আমি কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখব তুমি কী রকম অঙ্ক শিখলে। ভুলে যেয়ো না তোতন, কেমন?'

বিরক্তিতে প্রজ্ঞার ভুরু কুঁচকে উঠেছে। বছর আষ্টেক আগে যে সদাহাস্য, প্রাণোচ্ছল

প্রজ্ঞা মিত্রকে দেখে সদ্য এম আই টি ফেরত হীরক রায়চৌধুরী মুগ্ধ হয়েছিল, যে মুগ্ধভাব টিকিয়ে রাখতে প্রজ্ঞার প্রচেষ্টার শেষ নেই, সেই প্রজ্ঞাকে আজ বেশ ম্লানই দেখাচ্ছে। হাসির লেশমাত্র নেই। কেন মিথ্যে কথা বলল তোতনকে? সমস্যা চেনে না। আলবাত চেনে। বলল না কেন, 'মূর্তিমান সমস্যা তোমার দাদু, তোতন। দাও না, ওঁকে খামে পুরে পোস্ট করে।' পরক্ষণে ফাঁকা ঘরে নিজের মনেই বলে উঠল 'ডোন্ট ওভাররিয়াক্ট পিপি। কাম ডাউন।' প্রজ্ঞাপারমিতার ধারণা, ভালবেসেই ও নিজেকে পিপি বলে। আসলে নামটা বহুকাল আগে, সেই কলেজের আমলের এক প্রেমিকের দেওয়া। লোকটাকে ভুলে মেরে দিয়েছে, শুধু তার দেওয়া নামটা রয়ে গিয়েছে।

ফাইলগুলো ওল্টাতে লাগল। দুটো নাগাদ ফাইবার অপটিক্সের ডেপুটি এম ডি সুজিত সেনের আসার কথা। আগেও বারদুয়েক এসেছেন ভদ্রলোক। বাষট্টি, তেষট্টি বছর বয়স হবে। সামনে একটা প্রমোশনের সম্ভাবনা, তার চাপ, এর উপর হঠাৎ জানতে পেরেছেন স্ত্রী কার সঙ্গে যেন প্রেম শুরু করেছেন। এখানেই শেষ নয়। ছেলে দিল্লিতে পড়তে গিয়ে ড্রাগ পেডলিঙের দায়ে ধরা পড়েছে। বেচারা ভদ্রলোক বেহাল হয়ে পড়েছেন। স্ট্রেস রিলেটেড বিচিত্র সব উপসর্গ দেখা দিয়েছে। কে কার সমস্যা সমাধান করে ভেবে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল প্রজ্ঞা। পরের ফাইল। বিশেষ কিছু তথ্য নেই। নতুন পেশেন্ট। কোনও এক বিজ্ঞাপন সংস্থার মাঝারি একজিকিউটিভ। নাম তপন গুহরায়। সাড়ে তিনটেয় আসার কথা। হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল প্রজ্ঞা। তারপর কী ভেবে নিয়ে কম্পিউটারাইজড টেলিফোনের এক নম্বর বোতাম টিপল।

মাইল পাঁচেক দূরে ফোন বেজে উঠল। একসময় ফোন তুলতেই হীরক শুনতে পেত, 'তোমার আমাকে মনে পড়ে? সেই যে নৈনিতালের লেকের ধারে দেখা হয়েছিল? আজ কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিলে।' কয়েক মাস আগেও প্রজ্ঞার গলার আওয়াজ পেলে হীরকের মাথায় বিচিত্র তরঙ্গ খেলে যেত। আজ ফোন তুলতে শুনল সেই গলাই, কিন্তু উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় মাধুর্যের অনেকটাই খোয়া গিয়েছে।

'শোনো, তোমার কি আজ দেরি হবে?'

'মিটিং আছে, আটটা হবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'কেন, কিছু হয়েছে?'

'নাহ্, এমনি, তেমন কিছু নয়। ঠিক আছে আমি তাহলে বাড়ি চলে যাব।'

দরজার ওপাশ থেকে লক্ শমী জানিয়ে গেল ফাইবার অপটিক্স এসে গিয়েছে। ফোন রেখে দিল প্রজ্ঞা।

বড় বড় কোম্পানির বড় বড় একজিকিউটিভদের বিচিত্র সমস্যার ভাগিদার হতে এক সময় দারুণ লাগত প্রজ্ঞার। ওর উপর ওদের আস্থা আর বিশ্বাসের বহর দেখে নিজের প্রতি আস্থা বেড়ে যেত। তারপর সফলভাবে যখন একের পর এক সমস্যা সমাধান করে দিত, তখন সে যে কী ভীষণ উত্তেজনা। নিজেকে ভয়ানক শক্তিশালী মনে হত। সেই অপরিসীম ক্ষমতাবোধ নেশার মতো হয়ে উঠল। পার্টটাইম থেকে ফুলটাইম কাউন্সেলিং শুরু হল। তারপর যখন শহরের সবচেয়ে নামী কাউন্সেলিং সেন্টার ডি লাইট মাইন্ডেডের পক্ষ থেকে চাকরির প্রস্তাব এল তখন একলাফে লুফে নিল প্রজ্ঞা। তারপর আর ফিরে তাকানোর প্রশ্ন নেই।

আজ কিন্তু সবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ভদ্রলোক ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে চলেছেন। প্রজ্ঞার আর ভাল লাগছে না। লোকটিকে হঠাৎই ভাস্করের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করল। মনে মনে কল্পনা করল ভাস্কর ওর কাছে কাউন্সেলিঙের জন্য এসেছেন। ছবিটা এতটাই অসম্ভব আর অবাস্তব যে হাসি পেয়ে গেল। নিজের অজান্তেই ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। কথার মাঝখানে থেমে গেল ফাইবার অপটিক্স। তারপর ক্ষিপ্ত গলায় বলে উঠল, 'আমার সমস্যার কথা শুনে আপনার হাসি পাচ্ছে। ইউ ফাইন্ড ইট ফানি। খুব মজা লাগছে, না! আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনার হাসি পেতে পারে, আমার কিন্তু হাসি আসছে না। আমার চিন্তায় চিন্তায় মাথা খারাপ হতে চলেছে, আর আপনি বসে বসে তা দেখে হাসছেন। এই আপনার কাজের প্রতি ডেডিকেশন!'

ভদ্রলোক খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। দোষটা যে প্রজ্ঞার তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু এ ধরনের ক্ষিপ্ত লোকেদের মোকাবিলা করাই তো ওর পেশার অংগ। তা ঠেকানোর হাতিয়ারও ওর বিলক্ষণ প্রস্তুত। ভদ্রলোকের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রজ্ঞা ওর মোহিনী তিন নম্বর হাসি চালু করল। এই বয়সের লোকেদের তিন নম্বরেই কাজ হয়। ওর চেয়ে কম বয়সে যারা ওই পদে উঠেছে তাদের জন্য দু'নম্বর, অনেক সময় এক নম্বরও প্রয়োজন হয়। দেখতে দেখতে ফাইবার অপটিক্স মোহিনীতেই মোহিত হলেন। তারপর প্রজ্ঞা বলল, 'পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা মানুষের সমস্যা আছে, এটা জানলে আপনার কোনও স্বস্তি হবে না, আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজকালকার দিনে পাহাড়প্রমাণ সমস্যা না থাকাই আশ্চর্য। আপনার যখন ইচ্ছে হবে, যখন সুবিধে হবে আপনি আমার কাছে আসবেন। ইতিমধ্যে একটা কথা মনে রাখার চেষ্টা করুন, এটা আমি অবশ্য আগেও বলেছি, সব সমস্যা একসঙ্গে সমাধানের চেষ্টা না-ই বা করলেন। একেকটা করে ধরুন। ছোটবেলায় পরীক্ষার জন্যে পড়ার মতো। ইতিহাস পড়তে পড়তে ভূগোলের কথা ভাবলে চলত না, মনে আছে তো? সেইরকম।'

'করছি তো, চেষ্টা তো করছি।' ভদ্রলোক ওইটুকু রাগ দেখিয়ে কেমন কাহিল হয়ে পড়েছেন। খুবই মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু পারছি না, মিসেস রায়।'

প্রজ্ঞা কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎই টের পেল ওর নিজের ভেতরে অদ্ভুত এক উত্তেজনা শুরু হয়েছে। বুক টিপ্‌টিপ্ করছে। পেটের ভেতরে খামচে ধরেছে, এমনকি হাতের তালুও ঘামতে আরম্ভ করেছে। থেকে থেকে মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে তারপরেই নিজের গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল প্রজ্ঞা। শুনতে পেল ও বলছে, 'নিয়মিত ব্রিদিং এক্সারসাইজ করছেন তো। খোলা জায়গায় হাঁটাচলা। এ ছাড়া আর একটা কাজ করে দেখতে পারেন। এটা অবশ্য এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। আপনার একেকটা সমস্যা একেকটা চিঠিতে লিখে, খামে পুরে, পোস্ট করে দিয়ে দেখুন তো। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেইসব সমস্যা চলে যায়, আর ফিরে আসে না।'

প্রজ্ঞা থামল। তখনও বেশ উত্তেজিত লাগছে। রীতিমতো অবাকও হয়ে গিয়েছে। কথাগুলো যে কোথা থেকে এল, কেন এল, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বলতে শুরু করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওর ধারণাই ছিল না ও এরকম একটা আজগুবি ঘটনা বলবে। কয়েক সেকেন্ড কাটল। ওর পেশেন্টের দিকে তাকাল। কীভাবে নিলেন বৃদ্ধ? নতুন পরামর্শে বেসরকারি সংস্থার বাষট্টি বছরের ডেপুটি এম ডি-র চোখ চকচক করছে। তারপরেই নিবে

গেল।

'কার ঠিকানায় পোস্ট করব?'

থমকে যেতে যেতে প্রজ্ঞা বলে উঠল, 'অবশ্যই আমার ঠিকানায়।'

ভদ্রলোক খুশি হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই প্রজ্ঞা হাতের পেনসিলটা সমস্ত শক্তি দিয়ে টেবিলে ছুঁড়ে মারল। বেচারা খট্ করে শব্দ করে, লাফ খেয়ে, দু'টুকরো হয়ে, ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের দু'কোণে। 'ড্যাম! ড্যাম! ড্যাম!' বলে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল প্রজ্ঞা। 'দ্যাট ওল্ড ম্যান ইজ ড্রাইভিং মি আপ দ্য ওয়াল!' তারপর দু'হাতে মাথা চেপে কিছুক্ষণ বসে রইল।

দুপুরে টেলিফোনে প্রজ্ঞার গলার আওয়াজে হীরক একটা গোলমালের আভাস পেয়েছিল। রাতে শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল, প্রজ্ঞা এল।

'এই শোনো,' বলে হাত বাড়াল হীরক। 'আজ কিন্তু তোমাকে মারাত্মক লাগছিল!'

'মুড নেই' বলে পাশ ফিরল প্রজ্ঞা।

হীরক ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিছু বলতে গিয়ে জিভ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। এ এক মোক্ষম অস্ত্র। প্রজ্ঞার সমস্ত অজুহাত এই এক কোপে ভেসে যায়। আজ কিন্তু কেঁপে উঠতে গিয়েও শক্ত হয়ে গেল।

'বলছি না, ভাল লাগছে না।' বেশ ঝাঁঝিয়েই বলে উঠল।

'অ্যাই, হল কী?' জোর করেই হীরক ওকে ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে।

'তোমার বাবা। হবে আর কী?'

'কী করেছেন? সমস্যা হয়েছে?'

শব্দটা হাতুড়ির মতো মাথায় এসে পড়ল।

রাত তখন গভীর। তোতনের ঘুম ভেঙে গেল। দরজার তলা দিয়ে দেখল বাবা-মার ঘরে আলো জ্বলছে। পাশ ফিরে ঘুমোতে গিয়ে শুনতে পেল মার গলার আওয়াজ। রাগে তীক্ষ্ণ, অপরিচিত শোনাচ্ছে। গুটি গুটি বিছানা থেকে উঠল। সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে, খাবার ঘর পেরিয়ে, চলল দাদুর ঘরের দিকে। দাদুর ঘরের দরজার তলাতেও আলো। ঢুকে পড়ল। আর তখনই শুনল একেবারে অজানা, অচেনা আওয়াজ। ওর ছ'বছরের জীবনে এমন শব্দ, গান বা সঙ্গীত ও কখনও শোনেনি। সব কিছু ভুলে বলে উঠল, 'ওটা কী বাজনা?'

'এটা বাখের ব্র্যান্ডেনবার্গ কনচের্টো। আর যন্ত্রটা হচ্ছে হার্পসিকর্ড। অনেক অনেক কাল আগে জার্মানিতে বাখ থাকতেন। আর অসাধারণ সব সঙ্গীত বা মিউজিক তৈরি করছেন। খুব বড় কম্পোজার ছিলেন। তাঁর সেই মিউজিক লোকে এখনও বাজায়, এখনও শোনে। এখনও ভালবাসে। তোমার ভাল লাগছে?'

মাথা নাড়ল তোতন। ভাল লাগছে। অন্যরকম ভাল। আগে যেরকম ভাল লাগেনি। তারপরেই মনে পড়ে গেল খারাপ লাগার কথা।

'মা-বাবা ঝগড়া করছে।' গম্ভীরভাবে জানাল।

ওর দিকে তাকিয়ে ভাস্কর বললেন, 'হুঁ। সমস্যা।'

'সমস্যা!' লাফিয়ে উঠল তোতন। 'এটা কি আরেকটা সমস্যা, দাদু? তাহলে তাকে খামে পুরে পোস্ট করে দাও না।'

'আমি পোস্ট করলে তো হবে না, দাদুভাই। এটা যে মা-বাবার সমস্যা। এটা ওদেরই পোস্ট করতে হবে।' তোতনের গায়ে ভাল করে চাদর মুড়ি দিলেন ভাস্কর। দাদুর কোলের

মধ্যে শুয়ে ব্র্যান্ডেনবার্গ কন্‌চের্টো শুনতে শুনতে দাদুর কোলের মধ্যে শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তোতন ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন দশেক পরে হীরক বেশ সকাল সকাল বাড়ি ফিরল। সঙ্গে বিশাল এক বাক্স। চা খেয়ে ঘণ্টা দুয়েক ধরে তোতনের ঘরে কাজ চলল। তোতনের ভ্রূক্ষেপ নেই। যথারীতি দাদুর আলোয়ানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। তারপর একসময় ওর ডাক পড়ল। দাদুর ঠেলাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিয়ে দাঁড়াল।

'দেখ, তোর জন্য কী এনেছি,' বলে তোতনকে কাছে টেনে নিল হীরক। 'এটা একটা খেলনা। এটার নাম কম্পিউটার।'

'কী করে খেলে?'

ঘণ্টাখানেক ধরে ছোটদের পি সি নিয়ে খেলাধুলো চলল ছেলে আর বাবার মধ্যে। তোতন আনন্দে আটখানা। একসময় গিয়ে দাদুকে ধরে আনল। প্রজ্ঞাও এসে দাঁড়িয়েছে একপাশে।

'দাদু, তুমিও খেলো,' বলে উঠল তোতন।

'একটু সময় দাও দাদুভাই। তোমার এই যন্ত্র চালাতে শিখি আগে,' বললেন ভাস্কর।

'সময় লাগবে না, বাচ্চাদের তো,' বলল প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞার সঙ্গে সে রাতের কথা কাটাকাটির পরই হীরকের মাথায় তোতনের জন্যে পার্সোনাল কম্পিউটার কেনার কথা এসেছিল। এক কলিগকে বলে তৈরি করিয়ে নিতে যেটুকু সময়। খোলাখুলি তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এইভাবে ছেলেকে মনোমতো খাতে চালানোর কৌশলে প্রজ্ঞা খুশি হলেও, কোথায় যেন বিঁধছিল। গত এক সপ্তাহে ওর সেই ফাইবার অপটিক্স দু'বার ফোন করে ওকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছেন। চিঠিতে সমস্যার কথা লিখে খামে পুরে ফেলতেই ফল পেয়েছে। পোস্টও করতে হয়নি। লেখামাত্র মনের বোঝা অনেকটাই নেমে গিয়েছে। তারপর, টেবিলে পড়ে থাকা ওই চিঠি দেখে ওর স্ত্রী নাকি ভীষণ ধাক্কা খেয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পারা, ইত্যাদি। এখন দু'জনের সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক। ফোন পাওয়ার পর থেকে প্রজ্ঞার মনে একাধারে আনন্দ আর অস্বস্তি শুরু হয়েছে। ভাস্কর সম্পর্কে বলতে বলতেই কম্পিউটার এসে যাওয়াতে কেমন যেন অনুশোচনা হচ্ছে। তোতনের হয়তো ভালই হল। কিন্তু এতদিন ধরে ভাস্কর আর তোতনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, ক'দিন আগেও তা ভাঙতে প্রজ্ঞা উঠেপড়ে লেগেছিল ঠিকই। কিন্তু এখন, তা কম্পিউটারের জন্যে ভেঙে যাবে, অন্তত শিথিল হয়ে আসবে, এটা যেন প্রজ্ঞা আর চাইছে না। মন থেকে কিছুতেই সায় পাচ্ছে না। অথচ ভাস্কর সম্পর্কে ওর আপত্তির কথা ক্রমাগত বলতে বলতেই না বাড়িতে ওটা এল। তাই হীরককেও এখন আর ওর মনের নতুন অবস্থার কথা বলা যায় না। বলা যায় শুধু একজনকেই।

সেদিন রবিবার। রমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে প্রজ্ঞা ঢুকল ভাস্করের ঘরে। জানলার ধারে ক্যানভাস্ আর রঙ নিয়ে বসেছেন ভাস্কর। ছবি আঁকার অভ্যাস অনেক কালের। এ বাড়িতে আসার পর তোতনের জন্যে হয়ে ওঠেনি। আজ অনেকদিন পরে ওগুলো আবার বেরিয়েছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন ভাস্কর। মন দিয়ে সরোদে আহির ভৈরোঁ শুনছেন নাকি অন্য কথা ভাবছেন বুঝতে পারল না প্রজ্ঞা।

ওর সাড়া পেয়ে একটা টুল এগিয়ে দিলেন ভাস্কর। প্রজ্ঞা বসল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে

কাটল। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাস্করই বললেন, 'মিথ্যে মিথ্যে মন খারাপ করো না মাগো। সবই ঠিক আছে। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। ক'দিন আগে কম্পিউটার পয়েন্ট থেকে একটা মেয়ে এসেছিল। বলে গেল এখন ওরা অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে শেখাচ্ছে। দাদুভাই আর আমি আজকাল নিয়মিত ওখানে শিখতে যাই।' বিস্ময়ে হতবাক প্রজ্ঞা বলে উঠল, 'কই তোতন তো কিছু বলেনি।'

'না, ওটা নাকি আমাদের মধ্যে সিক্রেট। ও বারণ করেছিল বলতে। আমি হয়তো বলতাম না, কিন্তু তোমার মুখ দেখে বলে দিতেই হল।'

প্রজ্ঞা দেখল ভোরের আলোয় ভাস্করের চোখ অপার্থিব কৌতুকে চকচক করছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শ্বশুরের দিকে। তারপর হঠাৎই বলে ফেলল, 'বাবা, অন্য বৃষ্টির গল্পটা কী, তোতন প্রায়ই বলে।'

ওরা কেউই দেখতে পেল না দরজার পাশে হীরক এসে দাঁড়িয়েছে। হীরক শুনল ওর বাবা বলছেন, 'অন্য বৃষ্টির গল্প তোমাকে তো বলে দিতে হবে না, মাগো। তোমার তো দেখার চোখ আছে। তুমি কাজে লাগাও না, তাই হয়তো মাঝেমাঝে মুশকিল হয়। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যারা অন্য বৃষ্টি দেখতে পায়, তুমি তো তাদের একজন। চেষ্টা করলে, ইচ্ছে থাকলেই দেখতে পাবে।'

হাতের তুলি নামিয়ে রেখে জানলার বাইরে তাকালেন ভাস্কর। এখানে গাছের মাথা দেখা যায় না, গুঁড়ি তো নয়ই। সূর্য এসে পড়ে না বাড়ির দেওয়ালে, কার্নিশে, জানালার কাচে। ভাস্কর তবু দেখতে পেলেন পেয়ারা গাছের ডালে পাখির বাসা। মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগে, সেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার ঠিক পরপর, কাকের বাসার স্ট্রাকচার নিয়ে অনেক গবেষণা চালিয়েছিলেন। সেই কনস্ট্রাকশনের ফরমুলা, যা ভাঙা কাঠি দিয়ে তৈরি, গাছের ডালে বসে থাকে, ঝড়-জল-বৃষ্টিতে ক্বচিৎ টলে।

'আমি সত্যি পারব, বাবা?' অবাক বিস্ময়ে প্রজ্ঞা জিজ্ঞেস করল— 'আপনি বুঝলেন কী করে, জানলেন কী করে?'

'তোমার চোখেই তো সব লেখা আছে। তুমি চাইলেই স্বপ্ন দেখতে পারো, দাদুভাইকে দেখা শেখাতে পারো। তোমার তো কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

হীরক ঘরে ঢুকল।

'কী কথা হচ্ছে তোমাদের?'

'কিছু না,' বলে প্রজ্ঞা খালি হয়ে যাওয়া চায়ের পেয়ালা নিয়ে উঠে পড়ল। ওর আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার ইচ্ছে ছিল। কিছু বলত কিনা ও জানে না। শুধু বসে থাকত হয়তো, তাও ঠিক ছিল। কিন্তু হীরকের কথাগুলো কেমন বেসুরো, বেখাপ্পা শোনাল। পরিবেশ একটা গড়ে উঠছিল। আর একটু হলেই প্রজ্ঞা যেন সেটা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারত। কিন্তু এক ধাক্কায় সব মিলিয়ে গেল। প্রজ্ঞা ঘরের দিকে ফিরে তাকাল। ঢুকে যা দেখেছে এখনও তা-ই দেখতে পেল। তবু কী যেন নেই।

প্রজ্ঞার চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করেই হীরক বলে উঠল, 'বাবা, তুমি নাকি তোতনের কম্পিউটারে নতুন প্রোগ্রাম ঢুকিয়েছ? তুমি কী করছ বলো তো? এতদিন ধরে প্রজ্ঞা আমাকে অনেক কথাই বলেছে, আমি আমল দিইনি। কিন্তু তুমি এসব কী আবোল-তাবোল আরম্ভ করেছ, বলো তো?'

ভাস্কর একবার প্রজ্ঞার দিকে তাকালেন। ও দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তিন সপ্তাহ আগে এই

কথোপকথনে ওর মুখে যে তৃপ্তির আভাস দেখা দিত, আজ তার লেশ নেই। আজ শুধু উদ্বেগ, বিব্রতভাব আর অনুনয়। তারপর হীরকের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ভাস্কর বললেন, 'নতুন কিছু নয়। পুরনো প্রোগ্রামটাই একটু মডিফাই করে দিয়েছি। ওতে ওর অঙ্ক শিখতে সুবিধেই হবে। মজা পাবে। আগের প্রোগ্রামটা একটু বোরিং মনে হল। একেবারে শুরুতেই ব্যাপারটা রসকষহীন করে দিলে ও মজা পাবে না। ভবিষ্যতে অঙ্ক শেখার কথা উঠলেই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'জীবনটা শুধু মজা নয় বাবা। সব কিছুতে তোমার মিথ্যে মিথ্যে মজা খোঁজার চেষ্টা একটা একসেনট্রিসিটি। তুমি তোমার সুবিধেমতো এক্সপেরিমেন্ট করো, তোমার এই আজগুবি দর্শন কাজে লাগাও, আমার কিচ্ছু বলার নেই। কিন্তু তাই বলে তোতনকে তোমার গিনিপিগ করতে যেয়ো না।.এটা আমরা সহ্য করব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাস্কর। তারপর একরকম নিজের মনে বললেন, 'না, দুর্ভাগ্যবশত পুরোটা মজা নয়। মাঝেমাঝে ঝামেলা-টামেলা এসে অবস্থা বেশ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই গাম্ভীর্যকে ঠেকা দেওয়ার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, এমন কোনও দায় বোধহয় নেই।'

হীরক প্রজ্ঞার দিকে তাকাল। ভাবখানা লড়াইয়ে প্রত্যক্ষদর্শী কেন, একটা পক্ষ, আমার পক্ষ সমর্থন করছ না কেন? প্রজ্ঞা ওর চোখের ভাষা পড়ল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, 'এটা তো লড়াই নয়, হীরক। যে বাস্তব থেকে আমরা পালাতে চাইছি, কিংবা পাল্টাতে চাইছি, হয়তো অস্বীকারও করতে চাইছি, সেই বাস্তবে ফিরে আসা বা থেকে যাওয়া নয়। অন্য কোনও বাস্তবের সন্ধান পাওয়া, সেখানে থাকা, সেটাকে জানা বা বোঝার কথা। আমরা সেই পথ নেব কি না, তা আমাদের ব্যাপার। তোতন সে পথ নেবে কি না তা তোতনের ব্যাপার। কিন্তু পাছে ও অন্য বাস্তবের পথ বেছে নেয় সেই ভয়ে ওকে সে কথা জানাব না, তার সঙ্গে পরিচয় করব না, সেটা কি ঠিক?'

হীরক হাঁ করে প্রজ্ঞার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর একটা কথাও বুঝতে পারল কিনা সন্দেহ। 'তুমি এসব কী বলছো, প্রজ্ঞা,' অসহায়ভাবে বলে উঠল হীরক।

'বাবা বুঝিয়ে দেবেন,' বলে প্রজ্ঞা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'তুমি ওর কথা কিছু বুঝলে?' ভাস্করকে জিজ্ঞেস করল হীরক।

'তুই যখন এলি তখন ওই কথাই হচ্ছিল,' বলে মৃদু হাসলেন ভাস্কর।

'তোমরা তো স্বপ্ন দেখার কথা বলেছিলে বাবা। কিন্তু যুগ যে বড় কঠিন। এখন স্বপ্ন দেখার সময় নয়। কমিউনিস্ট না হয়েও বলতে হয়, এটা সংগ্রামের সময়।' হীরক দম নিল।

'স্বপ্ন ছাড়া কিন্তু সংগ্রাম বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। একঘেয়েমি এসে যায়, ইচ্ছে চলে যায়, সংগ্রাম আর করে ওঠা হয় না।'

'গেট রিয়াল, বাবা,' অধৈর্য হয়ে বলে উঠল হীরক, 'তুমি নিজে জানো, যা বললে সেটা কতটা অবাস্তব।'

'তুই এমনভাবে বাস্তব বলছিস যেন শহিদ মিনার। বাস্তব তো নানারকম। তার মধ্যে অমোঘ যা তা হল কেলের ভাবার, একদিন আমরা সবাই মরে যাব। তখন আমাদের রাগ-অভিমান, তর্ক-বিতর্ক সব মিলিয়ে যাবে।'

'একেবারে সব নয়,' বলল হীরক।

'না সব নয়। কিছু কিছু স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমাদের নয়, অন্য লোকের। আমাদের তখন

স্মৃতি সংগ্রহ করার মতো অবস্থা থাকবে না। কিন্তু স্মৃতি কী? বাস্তবায়িত স্বপ্নই তো স্মৃতি। প্রেমিকা বসে স্বপ্ন দেখছে, প্রেমিক এসে দাঁড়িয়েছে। প্রেমিক এল, প্রেম করল, চলে গেল। স্বপ্নই স্মৃতি হয়ে গেল।'

'এসবের সঙ্গে মরে যাওয়ার যোগ কোথায়?'

'যোগ একটা আছে,' ভাস্কর মনোযোগ দিয়ে কথা সাজিয়ে নিলেন।

'আসলে ব্যাপারটায় দুটো স্তর আছে। যে কাজের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বপ্ন নেই। সেগুলো জ্যান্ত নয়। মরা। আমাদের মারা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, তার আগেই মরে যায়। অথচ সেগুলো করা জরুরি। কিন্তু সেগুলো করতে হলো, করে যেতে হবে, শুধু প্রয়োজনবোধ যথেষ্ট নয়। অঙ্ক শেখাব মতো মামুলি কাজগুলো থেকে মজা বের করতে না পারলে তা ভয়ানক ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। ক্রমাগত সেই ক্লান্তির চাপে মানুষ বেঁচে থেকেও মরে যায়। তাই অঙ্ক শেখায় মজা দরকার।'

'স্বপ্ন দেখলে মজা পাওয়া যায়? তা, বাজার করার ক্ষেত্রে তুমি কী ধরনের স্বপ্ন দেখার প্রস্তাব দিচ্ছ?' হীরকের গলায় শ্লেষ আদৌ প্রচ্ছন্ন নয়।

'হ্যাঁ ঠিক প্রশ্ন। দু'স্তরের মধ্যে মজা হল, একটা ভাগ। অন্যটা হল স্বপ্ন। অঙ্ক শিখতে গিয়ে মজা পেতে হবে। সেই মজার চালিকাশক্তি হল স্বপ্ন। অঙ্ক শেখার সময়, আর অন্য সময়েও। তার জন্য দরকার কল্পনাশক্তি। শান দিতে দিতে তাকে ক্ষুরের চেয়েও ধারালো করে তোলা। সম্ভব, অসম্ভব, বাস্তব, অবাস্তব, সমস্ত ভেবে ফেলার শক্তি গড়ে তোলা।' অনেকদূর দিয়ে শাদা পাখির মতো প্লেন উড়ে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাস্কর বলে উঠলেন, 'তোতনের কোনও ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হজম করার মতো কল্পনাশক্তি ওর আছে। ওটা ঘষে মেজে তৈরি করতে হবে। ও ইঞ্জিনিয়ার হোক কিংবা ফিজিসিস্ট হোক, সেই শক্তি ওর কাজে লাগবে। অসম্ভবকে ভাবতে না পারলে ও আবিষ্কার করবে কী করে?'

'অঙ্কের বদলে কম্পিউটার দিয়ে আঁকিবুকি কাটলে ফিজিসিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার কিছুই হয়ে ওঠা হবে না।' জোদি বাচ্চার মতো হীরক হারা লড়াই জেতার ক্ষীণ চেষ্টা চালাল।

'অত মুষড়ে পড়িস না। হয়তো ওর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছেই হবে না। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হবে। তাতে তোর আপত্তির কোনও কারণ নেই।'

কথাগুলো হীরকের সদ্য শোনা মনে হল। প্রজ্ঞা বলে গেল না কিছুক্ষণ আগে। বাস্তব-টাস্তব। আর একটা জায়গাতেও খুঁত খুঁত করছিল।

'আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলো, তুমি রি-প্রোগ্র্যামিং করতে শিখলে কোথায়? আমি তোমাকে যা দেখেছি, তাতে তুমি তো কখনও কম্পিউটারের ধারকাছ দিয়েও যাও না।'

'ওহ্, ওটা তো বলা যাবে না, দাদুভাই আর আমার সিক্রেট।' ভাস্করের মুখে সেই মৃদু হাসি।

'ও কাম অন।' ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে অবিকল মার্কিন কায়দায় বলে উঠল হীরক।

তোতন ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখে রুখে গেল। তারপর গুটিগুটি ঠাকুরদার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'প্লাস আর ইন্টু কি এক জিনিস?'

'না একেবারে এক নয়, কাছাকাছি,' বললেন ভাস্কর।

'ফাইভ ইন্টু ফোর কি টুয়েন্টি?'

মাথা নাড়লেন ভাস্কর।

'কিন্তু ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভও তো টুয়েন্টি?' বলল তোতন।

'আর ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ?' কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করল হীরক।

দু'হাতের আঙুল চোখের সামনে মেলে ধরল তোতন। তারপর ডানহাতের আঙুলগুলো একে একে গুণে বলল, 'ফিফটিন।'

'ফাইভ ইন্টু থ্রি-ও ফিফটিন,' বলল হীরক।

'আমি জানি । দশটা কাঠবেড়ালি আছে। ওদের সবাইকার পাঁচটা দাগ। আমি ফাইভ টাইমস টেবিল শিখে গেছি, বাপি।' তোতন গর্বিতভাবে তাকাল হীরকের দিকে। 'ওদের ফিফটি দাগ আছে। ফিফটি তো পঞ্চাশ, না দাদু?'

'তোকে কে বলল?' সামান্য অবাক হয়ে জানতে চাইল হীরক।

'কম্পিউটারে আছে,' তাচ্ছিল্য সহকারে তোতন জবাব দিল।

'কম্পিউটারে বাংলা আছে?' অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কথায় হীরকের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার যোগাড়।

'হ্যাঁ, ইংরেজিতে বাংলা আছে। দাদু করে দিয়েছে। পি-ও-এন-সি-এইচ-এ-এস-এইচ পন্‌চাস,' বলে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বসার ঘর, খাবার ঘর পেরিয়ে, ওর ওই কোণের ঘর থেকে ভেসে আসতে লাগল 'পঞ্চাশ', 'পঞ্চাশ'।

মৃদু হেসে ভাস্কর বললেন, 'শব্দটা ওর পছন্দ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, প্রচুর মজা পেয়েছে,' বলেই সচেতন হয়ে পড়ল হীরক।

দু'জনে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। কয়েক মুহূর্ত কাটল। ধীরে ধীরে হীরকের স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে এল। 'আসলে আমি ভেবেছিলাম তুমি কী করছ সে বিষয়ে হয়তো নিশ্চিন্ত নও,' অজুহাতের মতো বলে উঠল, 'আমার বোঝা উচিত ছিল।'

আরও কিছুটা সময় কেটে গেল। জানলা দিয়ে ঢুকে এল ঠাণ্ডা হাওয়া। 'বার্কলে থেকে একটা ইনভিটেশান এসেছে। লেকচার সিরিজ। সামনের মাসে যেতে হবে। ফেরার পথে তোর মার সঙ্গে দেখা করে আসব ভাবছি।'

'সামনের মাসের তো দেরি নেই,' হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে বলে উঠল হীরক।

'টিকিট হয়ে গিয়েছে।' ভাস্কর জানলার বাইরে তাকালেন। অনেক দূরে একটা চিল। 'তোতনকে মিস করব। ওর জন্যেই তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব।'

'তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। আমি নিজে দেখব, ও যাতে ঠিক থাকে।'

'অবশ্য ওর স্কুল খুলে যাবে।'

'ওকে চিঠি লিখো, ওর ভাল লাগবে।'

'হ্যাঁ, ইন সাইফার। দেখা যাবে ওর দৌড় কত,' বলে হেসে উঠলেন ভাস্কর।

রাত দুটো নাগাদ প্লেন উড়ে গেল। তোতন জেগে ছিল। দমদম যেতে যেতে একবার বলেছিল, 'দাদু, তুমি অন্য বৃষ্টির গল্প বললে না!'

'খুঁজতে হবে। সব কি বলে দেওয়া যায়,' বলে ভাস্কর হীরক আর প্রজ্ঞাকে নতুন প্রোগ্রামিঙের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

ফেরার পথে চুপ করে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে রইল তোতন। কাঁদল তো না-ই, হীরক-প্রজ্ঞাকে কিছুটা অবাক করে ঘুমোলও না। ফলে যা হওয়ার তাই হল। পরের দিন ধুম জ্বর। সারাদিন বিছানায় ছটফট। প্রজ্ঞার অফিস যাওয়া মাথায় উঠল। তোতনের মাথায়

জলপট্টি দিতে দিতে বারবার ভাস্করের কথা মনে হতে লাগল। ওঁর অভাব আজ বড় বেশি বোধ করছে। কোথায় ভদ্রলোক, মাঝপথে, মাঝ আকাশে। আমাদের কথা ভাবছেন, নাকি ওঁর লেকচার সিরিজের কাগজ নিয়ে বিভোর হয়ে আছেন। সন্ধেবেলা হীরক ফিরল।

'জ্বর কমেছে?'

'কিছুটা।'

কম্পিউটারের দিকে তাকাল হীরক। ছোট টেবিল ল্যাম্পের আলোয় দেখল তোতন ওর দিকে তাকিয়ে। জ্বরে ওর চোখদুটো ছলছল করছে। হীরকের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বলে উঠল, 'বাপি, তুমি অন্য বৃষ্টির গল্প জানো? মা জানে না।'

হীরকের আঙুলগুলো অন্যমনস্কভাবে কম্পিউটারের বোতামের উপর নড়ছে। মনের মধ্যে বিশাল শূন্যতা । মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া কথা আজ অনেকদিন পর বারবার ফিরে আসছে। একটা অনুশোচনা। সারাদিন ধরে নিজেকে শক্ত, টানটান করে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেই রূপকথার রাজবাড়ির দরজা অনেককাল আগে মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাজকন্যাকে আর দেখা হয়নি। দরজা যে ও নিজে হাতে বন্ধ করেছে। ওটা কি কখনও খোলা যাবে?

কম্পিউটার কখন অন হয়ে গেল। স্ক্রিনের উপর ভেসে উঠল রঙিন গ্রাফিক্স। পিয়ানোর দুটো কর্ড শোনা গেল। যান্ত্রিক গলা বলে উঠল, 'স্টোরি টাইম ফোক্‌স!' তোতন উত্তেজিত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসেছে। হীরক-প্রজ্ঞাও অবাক, ওকে বাধা দেবে কী! এক এক করে ইংরেজি হরফ ফুটে উঠল। জোরে জোরে বানান করতে লাগল তোতন, 'ও, এন···'

তারপর জ্বর ভুলে আবিষ্কারের উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'অন্য বৃষ্টির গল্প।' শুকনো মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। আর তার কয়েক মুহূর্ত পরে আবিষ্কারের চেয়ে অনেক বড় উপলব্ধির আলো ওর মুখে ছড়িয়ে গেল। বলল, 'দাদু; দিয়ে গেছে।'

ভিজে মাটির গল্প

ডঃ নিবেদিতা ঘোষ (সরকার)

রূপোলী ফিতের মত এঁকেবেঁকে একপাশে পড়ে আছে ভরাই। অবশ্য এখন ওর নাম শুখাই হলেই হয়। দু পাশে দানোর মত বিশাল চড়া উঁকি মারছে—সেই চড়ায় নির্ভয়ে খেলে বেড়াচ্ছে কচিকাঁচার দল। ভরাই-এর পায়ের ঘুঙুর নেই, গলার কলকলানি গান নেই, ভরাই এর বুক শুকনো।

অথচ বর্ষায় এই ভরাই-এরই কি না ভর ভরন্ত দশা উপছানো যৌবন নিয়ে—দুকূল ছাপিয়ে কি তার নাচ।

তবু কেন জানি—এই শুখা ভরাই-ই এক অদৃশ্য ডোরে বাঁধে তিয়াসকে,—অনেকদিন অনেক বছর থেকে—সেই ছোট্ট বেলা থেকে···তিয়াসের ছোট বেলা—সে যেন গত জন্মের কথা। কেমন রঙীন ছবি ছবি।

বাড়ী ঘর পরিষ্কার নিকোনো উঠোন, গোলা ভরা ধান, থালা ভরা ভাত, বাপ, মা, বোন সবই ছিল তখন তিয়াসদের। রাক্ষুসে ভরাই-এর জলেই তো সব গেল, বাপটাও গেল, ছোট বোনটাও গেল—গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গেল।

আর তারপর বানের জল সরে গেলে সেই নতুন পলিতে সেবার চাষের কি ধুম, তিয়াসদের তখন আর কিছুই নেই। গোলা ভরল জোতদারদের, গোলা ভরল হারীন মণ্ডলের। তিয়াসের সদ্য বিধবা মা মেয়েকে নিয়ে ঘুরল, এ রাস্তা-ও রাস্তা—এল হারীন মণ্ডলের উঠোনে।

হারীনের তখন পাকা বাড়ী উঠেছে—বেড়ার দুধারে বাহারী ফুলগাছ, উঠোনে আলপনার লক্ষ্মীর পা। সেই পা মাড়িয়ে তিয়াসের মা গেল হারীনের পা ধরতে। স্পর্ধা দেখ!

'আরে ছুঁস না, ছুঁস না, অজাত, কুজাত, সব' হারীনের ধাক্কা-পেড়ে ধুতির নীচে কালো চাষাড়ে পায়ের উপর তখন তিয়াসের মা-এর নোয়ানো মাথা। সে মাথা একঝটকায় আবার মা লক্ষ্মীর পা-এ, অসহায় বিধবার পেছনে দাঁড়ানো দু-বিনুনী বাঁধা তিয়াসকে সেদিন নজর করেনি হারীন। নজর করেছিল—তবে সে তো অনেক কাল পরের কথা।

ভরাই আবার শুখা হল—শুখা হল মা-মেয়ের পেট। এবার বেচার মধ্যে পরনের কাপড় আর উপোষী শরীর। তা সেও ভাল বিকোলো না।—তিয়াস চেয়ে দেখল সব। দেখল যত—বুঝল তার চেয়ে ঢের বেশী। তিয়াসের চোখের জল শুকোলো।

গ্রামে মড়ক লাগল সেবার, তিয়াসের মা-কেও ধরল রোগে। যমের সঙ্গে লড়াই মা-মেয়ের। তা মা তো মোটে লড়তে চায়ই না—লড়ার ইচ্ছেই নেই। তিয়াস তবু লড়ে গেল, মজুর খাটে, ইঁট বয়।

হারীনের ঠাকুর্দার নামে ঠাকুরবাড়ী উঠছে, ইঁট বওয়ার কাজের জন্য শিয়াল কুকুরের কাড়াকাড়ি। এদিকে ঘরে মা যেন নিভু সলতে।

এমনি সময়ে হাত ধরল চাচা, রহিম চাচা, রহিম চাচা আর ওর ছেলে ফারুক বিড়ি বাঁধে, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনে গালে হাত দিয়ে, 'আল্লা'র কাছে দুয়া চায় দুঃখী মানুষের জন্য। দুয়াই চায়—আর তো কিছু নেই দেবার, বড় গরীব ওরা। তবু সেই দুয়াতেই তিয়াসের মা সেবার উঠে বসল, মোল্লা পাড়ায় রহিম চাচার ঘরেই উঠে এল মা-মেয়ে।

গাঁ-এ হাসপাতাল উঠছে। ইঁট বওয়ার কাজের অভাব নেই। মজুরী দিতে গিয়ে হারীন মণ্ডলের পাকা বাড়ী আরো দু-এক তলা বাড়ে।

'বেটা দালাল'—গজরায় রহিম চাচার ছেলে ফারুক, তা 'দালাল'-ই বা মন্দ কি—তিয়াস ভাবে। আর ভাবে পরের জন্মে 'দালাল' হয়েই জন্মাবে। হারীনের উঠোনে লক্ষ্মীর 'পা' গোলায় ঠাসা ধান, বাড়ীতে বার মাসে তের পার্বন—সেখানে কাঙালী ভোজনে তিয়াসদের বাঁধা পাত, হারীনের ধাক্কা পেড়ে ধুতির নীচে জুতো পরা পায়ে তিয়াসের মা-এর মত কত মাথা নোয়ানো। ফারুক পারবে না কি কোনোদিন অমন 'দালাল' হতে।

শুখা ভরাই-এর চড়ায় ফারুকের সঙ্গে খেলে বেড়ায় তিয়াস। খেলতে গিয়ে ফারুক ভুলে যায় বিড়ি বাঁধতে, তিয়াস ভুলে যায় ইঁট বইতে।—সে অনেক খেলা—কখনো 'রাজা-রাজা' খেলা, কখনো সখনো মজুরীর পয়সা হারিয়ে ফেলে তিয়াস।

আর সেই সব সর্বনেশে দিনে—দিন যখন রাতের কোলে ঢলে পড়ে ঘুমিয়ে, ভরাই-এর জলে নাচে চাঁদের ছায়া, 'টিশ্ টিশ্ ট্যাঙোশ্ ট্যাঙোশ্'—শুরু হয় রাতের পাখীদের ডাক—তখন চুপিসাড়ে বেড়া টপকে ঘরে ঢোকে তিয়াস। মা যেন তৈরীই থাকে। এ খুঁট, ও খুঁট খুঁজে পয়সা না পেয়ে চুলের মুঠি ধরে পেটায় তিয়াসকে। খুব পেটায়। 'ধিঙ্গি', 'রাক্কুসী', 'ঘর জ্বালানী'—মায়ের চোখে আর মুখে আগুন ছোটে। চাচা, ফারুক—এরা কেউ কিছু বলে না। শুধু পরে যখন রাতের খাবার না খেয়ে, শক্ত শরীরে বাইরের দাওয়ায় পড়ে থাকে তিয়াস,—ফারুক ওর কপালে,মার খাওয়া কাটা দাগে হাত বোলায়—বলে 'সবুর, সবুর কর।'

তা সবুর কি কারো সয়! সয় না। আর তাই শুখা ভরাই আবার ওঠে ভরে, কখনো সূর্যের লাল টিপ, কখনো চাঁদের রূপো ঝালরে সেজে ছলছলিয়ে নেচে চলে, আর সেই নাচের ছন্দ দ্রিম দ্রিম তালে বাঁধানো ঘাট, শাল হোগলার জঙ্গল, কাঁচা-পাকা রাস্তা, হারীনের প্রাসাদ, গৃহদেবতার মন্দির, মোল্লা পাড়ার পীরের থান, রহিম চাচার বিড়ির দোকান পেরিয়ে—বেড়া টপকে খোলার ঘরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ে ঘুমন্ত তিয়াসের শরীরে।—ভয়ে ধিঙ্গি মেয়েকে মা ছেঁড়া, মোটা শাড়ীতে ঢাকে। মেয়ে বেড়ে উঠেছে। সর্বনেশে বাড়। গরীবের ঘরে এত বাড় নিয়ে কি করে মা! আধপেটা খেয়ে, রাতদিন মজুর খেটে—মেয়েটা যে তবু 'ভরাই'।

টের পায় তিয়াসও। শিয়াল কুকুরের চোখে, শকুন-মানুষের চোখে আর সবশেষে ফারুকের চোখে,—কিছু একটা ঘটে গেছে বড়, নদীর চরে মেলা আর জমেনা—খেলা ফুরিয়ে যায়, কথাও হারিয়ে যায়। কাঙালী ভোজনে পাত পাততে আর ছোটেনা তিয়াস—লজ্জা করে তার। সে খাটে কেবল। দিনে মজুর, রাতে মজুর, শরীর তবু বাড়ে। হাসপাতালের কাজ এগোয়।

এমনি সময়ে হারীন মণ্ডল একদিন নাকে আতর মাখা রুমাল সেঁটে, মোল্লা-পাড়ার বদ গন্ধ সয়ে বেড়ার দরজা ঠেলে এল তিয়াসের 'মা'কে দেখতে। দেখল, শুনল, দেখাল, বোঝাল, দু থলে ধান, বাড়ীর হাঁসের ডিম, পুকুরের মাছ—কত কি এল বাড়ীতে সেদিন— হারীনের লোকেরা বয়ে আনল। আরো এল তেল, পাউডার, সেন্ট, আলতা।

'ব্যস, গায়ের বিড়ির গন্ধটা ছাড়িয়ে দে মেয়ের।'

মা পোড় খাওয়া মেয়ে। কথাটা বুঝল, মনেও ধরল। তা মন্দ কি। বলতে গেলে হারীনই এখন গাঁয়ের রাজা। একবার সেই রাজ্যপাটে বসতে পারলে আর দ্যাখে কে। আর তাছাড়া সেই লক্ষ্মীর পা আঁকা উঠোনে অপমানের ইতিহাস তো ভোলেনি মা।

'বাড়ী বয়ে এসেছিল, ঘরের নোক্ষ্মী করে নিয়ে যাবে বলে'—মা জানাল সবাইকে।

মোল্লা পাড়ার পাট চুকল। ভরাই-এর জলে চান করে তিয়াস সেদিন মা-এর কাছে তেল

দিয়ে চুল বাঁধল পরিপাটি। গায়ে সেন্ট দিল মা, নতুন পাটভাঙ্গা শাড়ী ব্লাউজ পরিয়ে দিল। রহিম চাচা, ফারুককে ছেড়ে পীরের থান পেরিয়ে—ভরাই-এর ধার ঘেঁষে মায়েতে মেয়েতে চলল হারীন মণ্ডলের প্রাসাদে। ভরাই এঁকে বেঁকে অনেকক্ষণ সঙ্গ দিল ওদের। ভরাই-এর জলে ছায়া পড়ল তিয়াসের—সেই ভরাই-এর শুখা চরে —খেলে খেলে বেড়ানো মেয়ে—নতুন জামা শাড়ী পরে মায়ের সঙ্গে আজ চলেছে 'ঘরের নোক্ষ্মী হতে' ভরাই সব দেখল চুপচাপ। ফিস ফিস করে কুটুস পাখীরা এ ওকে বলল সেই কথা, ঝিঁ ঝিঁ ডাকল কেঁদে কেঁদে। তিয়াসের চোখ শুধু শুকনো, অনেক কাল বাদে আজ সকালে ওর মা একথালা ভাত খেয়েছে মাছ দিয়ে পেটপুরে। কত কি বলেছে মা—কত আশা ভরসা কত বিশ্বাস ভক্তির কথা ।

'দেবতা, দেবতা, মনিষ্যি নয়'—হারীনের জুতো পরা পা এতকালে ছুঁতে পেরেছে মা সাহস করে। রাত বাড়ল, চাঁদ ঢাকা পড়ল মেঘে, হোগলা, শালের বনে হাঁড় কাঁপানো হাওয়া বইল। 'ভোর-কই', 'ভোর কই' বলে প্যাঁচারা চেঁচামেচি জুড়ল—তিয়াস বসল রাজ্যপাটে। সেই লক্ষ্মীর পা আঁকা উঠোনের ধারে বড় ঘরের নরম গদীতে লক্ষ্মীর বরণ হল।

হাড়গিলেরা ভোর না হতেই ছুটল বাড়ীর সামনে। আজ আবার হারীনের ছেলের কল্যাণে কাঙালী ভোজন ডেকেছে বড় করে। তিয়াসকে আর ছুটতে হল না আজ পাত রাখতে। ঢাকা দেওয়া থালায় পঞ্চ -ব্যান্নন নিয়ে ঝি এল। তিয়াসের বড় সুখ। তিয়াস খুঁজে খুঁজে কাজ পায় না আর। ভরাই-এর শুখা চরের কথা ভাবতে ভাবতে তিয়াস খায়, দায়, ঘুমোয়।

হারীনের বেড়ার ধারের বাগানে কুঁড়িরা ফুটে উঠল এক এক করে—কি বাহার—কি বাহার! তিয়াস ঘুরে ঘুরে দ্যাখে। ওকে কেউ বাধা দেয় না, খেয়ে পরে বেঁচেছে মা—আর কি চাই। ফারুক আলির মুখ জলছবি হয়ে যায় ধীরে ধীরে। কই সেও তো আসেনা একবার তিয়াসের রাজ্যপাট দেখতে।

হারীন মণ্ডলের চর্বির পুরু স্তর ভেদ করে মনটা দেখতে চেষ্টা করে তিয়াস রোজ। ঘরে তার ঘোমটা টানা বউ-ছেলে-পুলে-নাতি-নাতনী ভর্তি—তবু কি দয়া-কি দয়া হারীনের—অভাগী এই মা-মেয়ের উপর।

এরই মধ্যে মা বলে 'সর্বনাশ', সর্বনাশ কিসের তিয়াস বোঝেনা, 'সন্তান' আসছে নাকি, তিয়াস ছুটে যায় ভরাই-এর ধারে, ভরাইও আবার ভরছে—শুখা চর ঢাকছে জলে। সেই জলে নিজের ছায়া দ্যাখে তিয়াস। 'সন্তান' 'সন্তান'-অজানা অনুভূতি আর ভয়ে মমতায় তিয়াস এতদিনে 'নারী' হয়ে ওঠে।

হাসপাতালের কাজ বন্ধ। ঘরে বসেই খবর পায় তিয়াস। গাঁয়ে নাকি ভয়ানক আকাল। যাক হারীনের তো গোলা ভরা ধান—মা-মেয়ে সাহস পায়।

এদিকে খিদের আগুনে গাঁ জ্বলে ওঠে, জ্বলে ওঠে মোল্লা পাড়াও। তাদের অনেক কালের ধিকি ধিকি জ্বলা খিদের আগুন আকালের তাণ্ডবে জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। ঘৃণা যোগায় ইন্ধন। দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে—দাঙ্গা বাঁধে—ঘর পোড়ে, দোর পোড়ে-আগুনের লকলকে জিভ গ্রাস করে একের পর এক প্রাণ, মোল্লার প্রাণ হিন্দুর প্রাণ।

ফারুক আলি না কি নেতা হয়েছে ওদের। তবে ওর আগুনের বারুদ যে কোথায়-তিয়াস জানে। ভয়ে ও দোর দেয় ঘরের। সুখ বুঝি সইল না কপালে।

জীবনে খিদে দেখেছে, বান দেখেছে, মৃত্যু দেখেছে তিয়াস অনেক। কিন্তু ঘৃণার এমন বীভৎস, প্রাণঘাতী রূপ আর কখনো দেখেনি। মৃত্যুর মত নৈঃশব্দ গাঁয়ে। কোনো ঘর থেকে আসে না শাঁখ-ঘণ্টার আওয়াজ কিম্বা আজানের একঘেঁয়ে লম্বা সুর। হাড়গিলের, শকুনীর

পেট ভরাতে শুধু উঁচু হয় মৃতের স্তূপ। তাদের কেউ মরেছে আকালে কেউ বা দাঙ্গায়।

রাতারাতি গোলার ধান শহরে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে হারীন। গোলায় আগুন জ্বলে। হারীনের বউ ছেলেরা আগেই পালিয়েছিল, তাই শুধু ধরা পড়ে হারীন। লক্ষ্মীর 'পা' আঁকা উঠোন হারীনের কালো রক্তে ভিজে ওঠে। ঘা পড়ে তিয়াসদের দোরে। দোর ভাঙে, ভারী শরীরটাকে টেনে পালাতে গিয়ে তিয়াস পড়ে ফারুকের সামনে।

'মার্ মার্—জ্বালিয়ে দে—জ্বালিয়ে দে-এরা সব হারীনের কেনা মনিষ্যি,'—ফারুকের পিছনে চেঁচিয়ে ওঠে একদল যাদের পেটে আর খিদের জ্বালা নেই—রয়েছে শুধু ঘৃণার বিষ, ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ওদের থামায় ফারুক, কি যেন দেখছে ও,

'থামো সব, ওকে মেরো না—ওর পেটে আমার সন্তান—আল্লার দোহাই'।

—সবার চোখ যায় তিয়াসের দিকে, উঠোনে পড়ে থাকা হারীনের দেহ নড়ে চড়ে ওঠে,

—'খবরদার—ও সন্তান আমার, ভগবানের দোহাই,'

আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় মারমুখী খুনের দল।

'আল্লার দোহাই'
'ভগবানের দোহাই'
'আল্লার দোহাই'
'ভগবানের দোহাই'

—ওর অজাত সন্তানের জীবন-মৃত্যুর অনিশ্চয়তা নিয়ে এবার লড়ে যায় দু দল মানুষ। মাঝখানে তিয়াস।

ভরাই এর জলের আওয়াজ কানে আসে ওর। আবার বুঝি কূল ছাপিয়েছে নদীটা।

তিয়াসও বাঁধ ভাঙে,

'থামো, এ সন্তান হিন্দুরও নয়, মোল্লারও নয়।'

—বলে কি পাগল মেয়েটা। অজাত শিশু-ভ্রূণ মৃত্যুভয়ে ককিয়ে ওঠে তিয়াসের শরীরে। তিয়াসের চোখে আগুন ছোটে।

'না, এ সন্তান কারোর নয়, এ সন্তান আমার—এ আমার মাটির সন্তান'।

—লড়াই থামেনা।

এদিকে ভরাই-এর জল ততক্ষণে কূল ছাপিয়ে, রাস্তা-ঘাট ডুবিয়ে, পীরের থান-শিব মন্দির, মোল্লা-পাড়া-হিন্দু পাড়ার ঘর-দোর ভেঙে—মৃতের স্তূপ ডিঙিয়ে ছুটে এসেছে অ-নে-ক দূর।

চোত গাজনের মেলা

ওয়াহিদা বেগম

বিষণ্ণ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সুফিয়ার বুক ফেটে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। চৈত্র মাসের শেষদিনগুলো বড় বিষণ্ণ। বছর শেষের মায়ার যাদুটান দিনকে টেনে লম্বা করেছে বুঝিবা। শূন্য গাজনতলার দিকে চোখ পড়তেই সে সত্যিই হু হু করে কেঁদে ওঠে। তার মনের শূন্যতা প্রকৃতির আরেক শূন্যতাকে ধরতে চায়। নিজেকে অপরাধী লাগে। সে তো চায়নি, তারা তো চায়নি কোনদিন ভরা সংক্রান্তিতে শূন্য খাঁ খাঁ শিবের দালান। তার বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেলেও এত দুঃখ পেত না সুফিয়া। কিন্তু লোটন! কি দোষ করেছিল সে? কি দোষ করেছিল সুফিয়া? কেন এই দুর্ভেদ্য দেওয়াল? সুদেব ঘোষের ছেলে লোটনের জন্য তার মনটা কাঁদে। এতক্ষণ ঠামা ঠামা করে ছুটে আসত ছেলেটা। পায়ে ধরে জিদ করত, বায়না ধরত বোলান গান শোনার; আবদার করত জিভেগজার। সুফিয়ার সেই মিলমিশ দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভাসে। চৈত্রের দুপুরে হরিনাথপুরের মিন্‌সেদের বুকে ছোট জামা এঁটে লালপেড়ে শাড়ি আর নকল গয়নায় মেয়ে মানুষ সেজে কতই না ছেনালি। সুফিয়ার হাসি পায়। অভিনয় পটুতা মনে করে মজা পায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে মনে পড়ে সব। রসুলপুরের মেয়ে বৌদের তখন গাজনতলায় বোলান শোনার মানা নাই। সুফিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কোথায় গেল। কোথায় গেল সে সময়। সে শূন্য প্রকৃতির দিকে চেয়ে উত্তর খোঁজে।

ঢাকে গাজনের বোল ফুটলে সজনে ডাটারও দিন শেষ। ফেটেফুটে চোফাট হয়ে ফুড়ুৎ। প্রকৃতির কি আশ্চর্য নিয়ম। বংশ বিস্তারের কি অদ্ভুত প্রকৃতি। কালের নিয়মে দিন যায় মাস যায় বছর যায়। আবার ফিরে আসে। প্রকৃতির এই পর্যায়বৃত্ত গতি এই খেয়ালি খেলা কেউ কি রুখে দিতে পারে? তবে কেন মানুষের এত তেজ। কেন অকারণ ক্ষমতার বড়াই। ঘৃণায় বেঁকে ওঠে ঠোঁট, সুফিয়া নষ্ট বুদ্ধি মানুষের দিকে অজান্তে এক দলা থুথু ছিটোয়।

সানকিতে পান্তা ভাত আর কাঁচা লঙ্কা নিয়ে সে ভীরু চোখে বিষণ্ণ প্রকৃতির দিকে তাকায়। এই বৈরাগী রূপ ভৈরবী হতে কতক্ষণ। হয়ত এখনি মেঘে মেঘে গিলে নেবে আকাশ। সামান্য একচিলতে খড়োবাড়ি কি কালবৈশাখীর মাতাল হাওয়ায় টিকতে পারবে এবার। প্রকৃতির লীলা বোঝা দায়। ভাতের থাবা মুখে তুলতে গিয়েও থেমে যায়। লোটন। লোটন কি করছে এইবেলা। গঞ্জের মাঠে আজ চোত গাজনের মেলা। লোটন কি স্থির থাকতে পারে? সেকি তিষ্ঠতে পারবে বাড়িতে এই বেলা? চৈত্রের শেষের বিষণ্ণ প্রকৃতি আর শূন্য গাজনতলা সুফিয়াকে উথাল পাতাল ভাবায়। হাতে ধরা ভাতের থাবা তার বুক পর্যন্ত উঠেই থেমে যায়। পাশের গাঁয়েই হৈ হৈ। ঢাকের বোল তার রক্ত মজ্জায় কাঁপুনি ধরায়। সে ভুলে যায় তার শরীরে খাঁটি মুসলমানের ধারা। বেহুলার সতীত্বকে মনে পড়ে। মনসার কুচক্রকে মনে পড়ে। লখিন্দরের বাসরঘরের কারিগরি কূটকৌশলকে মনে পড়ে। রাজা হরিশচন্দ্রকে মনে পড়ে। মনে পড়ে সীতার পাতাল প্রবেশের কথা। বোলান গানের পালায় হরবার শোনা এইসব গল্পের কথকতা। সুফিয়া বুক চাপড়ায়। সমাজের ভিতর কূটকৌশলির গড়ার ছাঁদাটাকে কি কেউ দেখতে পায় না—হায় আল্লা।

খাওয়ার ইচ্ছেটাই তার মরে গেছে। সুফিয়া হাত দিয়ে সানকিটা ঠেলে দেয়। বুকের

ভিতর রোদন স্পষ্ট হয়। লোটন লোটন আয় বাবা। গঞ্জের হাটে ঐ দেখ চোত গাজনের মেলা। পাঁপড়, জিলিপি, ফুলুরির পাশে তোর প্রিয় ঐ দেখ জিভেগজা। গঞ্জের মেলা সুফিয়াকে হাতছানি দেয়। বারবার মনে পড়ে লোটনের কথা। মাইক-এ রসুলপুরের মাতব্বররা কড়া গলায় নিষেধ করেছে। ও মেলায় এ গাঁয়ের কেউ যাবে না এবার। রসুলপুর আর দেবকীনগরের মধ্যে ভাগাভাগি দেওয়াল। সুফিয়া রসুলপুরের, লোটন দেবকীনগরের এককোণে পড়ে আছে। তাদের প্রাণের আকুতি কি ইথার তরঙ্গে ভেসে ভেসে যেতে পারে আবার? সুফিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। লোটন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সারা সকাল। সারা দুপুর সারা বিকেল ছেয়ে আছে সেই অস্থিরতা।

সুফিয়া ভীরু পায়ে দুগাঁয়ের সীমানার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়বে এখনি। লাল আলোর আভায় বর্ণময় ভারতবর্ষের রঙবদল স্পষ্ট ধরা পড়ে এ সময়। রসুলপুর আর দেবকীনগরে বারুদের ভাণ্ডার, জঙ্গলে জঞ্জালে মানসিকতায় আজ বারুদ। ফুলকির অপেক্ষায় স্থির। ধর্মভীরু সুফিয়া ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ধর্মের ধ্বজাধারীরা এখন অধর্মের সেপাই।

রসুলপুরের ঢাকের বোল নাই বাদ্যি নাই। দেবকীনগর মাতোয়ারা। তারা আজ গঞ্জের হাটে চলেছে চোত গাজনের মেলায়। বাঙ্গালীর ঐ উৎসবে রসুলপুর আজ ব্রাত্য। রসুলপুরের কিনারায় দাঁড়িয়ে সুফিয়া ফোঁপায়। তেলে জলে এক হয় না। সুফিয়া জানে। কিন্তু লোটনের সঙ্গে তো তার সে সম্পর্ক নয়। দুগাঁয়ের দুজাতের চাপান উতোরে সুফিয়ারা কেন ব্রাত্য হবে? নিজের ছেলের মুখটা সুফিয়ার মনে নেই। দুদিনের জ্বরে সব সম্পর্ক শেষ। দাফনের সঙ্গে সঙ্গে একটা মেটে কবর ছাড়া কোন ছবি সে মনে করতে পারে না। গোরস্থানে টাটকা কবর দেখলে সেই দিনটাকে মনে পড়ে হয়ত একবার। মৃত্যুকে আড়াল করা যায় না সুফিয়া জ্ঞান হতেই জেনে এসেছে। মুর্দা লাস তো সন্তান নয়। তার উপর তো সুফিয়ার কোন অধিকার নাই। যদি কোন পুণ্যফল থাকে হাসরের ময়দানে দেখা হবে আবার। ছেলেকে তাই ভুলে ছিল সুফিয়া। মনের শূন্যতা শূন্য থাকে না। সুদেব ঘোষের ছেলে লোটন ভরাট করেছিল এতকাল। লোটন জড়িয়ে ছিল সুফিয়াকে কতখানি আজ টের পায়। এ গাঁয়ের পাট ওঠাবার পর পরই সুফিয়া বেশি করে টের পেয়েছে। ছেলের মৃত্যুর পর লোটনকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখেছে আবার। দুগাঁয়ের সীমানায় সুফিয়ার মাতৃহৃদয় মাথা কোটে। লোটন কি ফিরে আসবে না আবার? তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কি বলবে না চলো দেখবে চলো চোত গাজনের মেলা। লোটনের হাতছানি সুফিয়াকে ঘরছাড়া করে। টেনে আনে রসুলপুরের সীমানায়। দুগাঁয়ের সীমানায় এসে সুফিয়া থমকে দাঁড়ায়। মাতব্বররা জানতে পারলে তাকে আস্ত রাখবে না। দশের সামনে বিচার হবে। বিচারে সাজা হলে কি লজ্জা। এই বয়সে কোথায় ঠাঁই হবে আবার। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই বয়সে? রসুলপুর ঠাঁই না দিলে দেবকীনগর কি তাকে বুকে টেনে নেবে? না নেবে না। সে জানে তার শরীরের নিচে বয়ে চলেছে সুন্নি মুসলমানের রক্ত। দেবকীনগরের মাটি তার জন্য নয়। রসুলপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাই কুঁকড়ে ওঠে ভয়ে। নিঃশব্দে উচ্চারণ করে লোটন!—কেন মানুষের ভেদবুদ্ধি সুফিয়া বোঝে না। তার বুকের মধ্যে লোটনের জন্য হাহুতাস। তার মনের মধ্যে মায়ের কান্না। কেউ কি শুনতে পাচ্ছে? ঢাকের শব্দে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে সব। সুফিয়া রসুলপুরের ধানক্ষেতে আবেগ ছড়িয়ে দিয়ে দেবকীনগরের দিকে চেয়ে চেয়ে বুক ভাসায়।

এই সেদিনও সুদেব ঘোষের দেওয়াল ছিল তার কোঠাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে। দুবাড়ির

মধ্যে খিড়কি পথে অনায়াসে যাতায়াত। বৌঝিদের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে মাখামাখি। পুরুষদের গায়ে গায়ে বসে সাত গাঁয়ের খবরাখবর শোনা। পঞ্চায়েত নিয়ে বিস্তর আলোচনা। চাঁদের আলোয় বসে ফাগুনের হাওয়া খাওয়া আর বোলানের বোল বাঁধা। হিন্দু নাই, মুসলমান নাই রসুলপুরে শুধুই নারী পুরুষ, মানুষ। ভোটার লিস্টের কাগজে দশঘর ঘোষ, চারঘর নাপিত, তিনঘর ময়রা, ঘর পাঁচেক তিলি। আর সবই মুসলমান। পরবে উৎসবে ভাই ভাই—কোলাকুলি। বৌঝিদের অনাড়ম্বর সিঁদুর খেলা। কাসেম মিঞা যেমন চৈত্রে শিবের ভক্তি সাজে উপোস মানে তেমনি সোরেন সাহা মহরমের কাসিদ সাজতে দ্বিমত করে না। রসুলপুরের মাটির গুণ মানে দশঘরার পঞ্চায়েত।

গঞ্জের থানার বড় দারোগা কারুর চরিত্রে এক তিল খুঁত পায় না। সদরের মহকুমা শাসকের অপিসের ফাইলের নিচে রসুলপুরের সুনাম ধিকধিক করে জ্বলে। সদরের বে-আক্কেল নেতাদের তর্জন তাদের দিকে আঙুল তুলে শাসায়। গেলবার ভৈরব মোদক কৃষ্ণনগর হাইকোর্টে গিয়ে শুনে এসেছে ভোটের নতুন হিড়িক। দেশের হিন্দু নেতারা গলা ভরে চিৎকার করছে—ভারত ছাড়ো, না হয় কোরান ছাড়ো। ভৈরব লজ্জায় মরে যায়। ছি ছি কি অলক্ষুণে কথা। ফিরে এসে রসুলপুরের দরগার মজলিসে দাঁড়ালে সেখানেও শুনেছে গবম গরম বক্তৃতা। শুনেছে আর থ হয়ে ভেবেছে রসুলপুরও কি আর পাঁচ গাঁয়ের মত চুনকালি মাখবে এবার? ও সুফিয়াবুবু বল নাগো, বল না ইব্রাহিমের কথা। সুফিয়া আড়াই হাজার বছর আগেকার আরবের ইতিহাস পাঁচমিনিটের মধ্যে ভৈরবকে শোনায়। ভৈরব তন্ময় হয়ে শোনে। বাপ হয়ে ছেলের গলায় ছুরি চালাল। পুত্র ইসমাইলের গলায় ইব্রাহিম ছুরি চালাল নিজে হাতে? সুফিয়া বলে সবই খোদার পরীক্ষা। আকাশের দিকে আঙুল তুলে সুফিয়া বলে ও তো মানুষকে পরীক্ষায় রাখে সবসময়। খোদার ইচ্ছেয় নেক ইমানদার আদমি সবসময় জয়ী হয়। ইসমাইল হাসি মুখে পিতা ইব্রাহিমকে বলল আমি তোমার সবচেয়ে পিয়ারা।—আপনজন। তুমি আমার গলায় ছুরি চালাও। ইব্রাহিম পুত্রের অনুরোধে ছুরি চালাল। কিন্তু আশ্চর্য হল দুনিয়ার মানুষ। পুত্রের পরিবর্তে জবাই হয়েছে দুম্বা। এই হলো কোরবাণির সার কথা। বলো ভৈরব আশ্চর্য নয়। কোরানের আয়াত কত সুন্দর দেখ আল্লা মানুষের উদ্দেশ্যে বলছেন—লাল অনালুল বিররা হাত্তা তুনফেকু মিম্মা তুহিকুন—অর্থাৎ তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয়বস্তু দান করবে ততক্ষণ যাবৎ পুণ্যের অধিকারী হবে না।

ভৈরব চোখ মোছে। জজকোর্টের মোড়ের জনসভার জমায়েতে নেতাদের মুখটা মনে পড়ে। ওরা কি কাউকে ভালবেসেছে কোনদিন? ওরা কি প্রিয়বস্তুর মানে বোঝে? দরগার মজলিসের মাতব্বরদের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকালে রক্ত হিম হয়। চাপান উতোরের চাপে লোটন, ভৈরব, সুফিয়াবুবু, কাসেম মিঞারা কোথায় যাবে? কোথায় লুকোবে তাদের চোখের জল? রসুলপুর তাদের একমাত্র আশ্রয়। তারা রসুলপুরকে চেনে। এ মাটিতে তাদের নাড়ির টান। এইখানে তাদের স্বর্গের ঠিকানা। এ মাটিতে তাদের জন্মান্তরের গ্রন্থি আঁটা। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে ইঁট পুজো। দিকে দিকে উত্তপ্ত জনসভা। রক্তে ধর্মীয় আবেগের প্রবতা বৃদ্ধি। খাঁটি হিন্দু খাঁটি মুসলমান প্রমাণ করার হুজুগ। সেই হুজুগে ভৈরব মোদক সুফিয়াবুবুদের ঠাঁই নাই। লজ্জা লুকোবে এমন আড়াল পেতে তারা কাজের ছুতো খুঁজে অকারণে পালায়। লোটনের ঘুড়ি আকাশে ভাসলে সুফিয়া ঘর থেকে তাকায়। ঐতো সবচেয়ে উঁচু ঐটা লোটনের বটে। সুফিয়ার দুচোখে আনন্দের ধারা। রুটি সেঁকতে সেঁকতে ভুল হয়। একপিঠে টাকার মতো ফুটো, মাটির খোলা মুছে আবার রুটি বসায়। জব্বারের ছেলেটাও দখিন মাঠে ঘুড়ি

ওড়ায়। লোটনেরে হিংসে করে ছোঁড়াটা, সুফিয়া জানে লড়াকু বাপের লড়াকু ছেলেটা ধান্দাবাজ। লোটনের দ্বিগুণ বয়স। এই বয়সে কি কেউ ঘুড়ি নিয়ে খেলে? ফুটবলে লাথি মেরে এসময় আর সবাই ঘাম ঝরায়। আজ আবার কি মতলবে দক্ষিণ মাঠে? সুফিয়া মনে মনে জ্বলে যায়। রাগে ক্ষোভে বেলুনের চাপে পিঁড়িতে রুটির বিরূপ আকার দাঁড়ায়। হায় হায় কাজে আজ তার মন নেই। মন অশান্ত হলে সুফিয়া কোরান খুলে বসে। সুর করে একমনে অনেকখানি পড়ে যায়।

অজু করে জায়নামাজে বসলে সুদেবের বৌ দূরত্ব রেখে বসে। কোরানের সুর শোনে ঘোমটার ফাঁকে শ্রদ্ধায় নত হয় মাথা।

শিবের দালানে ঝাঁপান গানের সুরে সুফিয়া, কাসেমও কি সুর মেলায় না? পাশাপাশি বাস। জলচল নেই বটে তবে দুধারার স্রোতই আপনার। সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ায়।

হায়রে কাজে আজ তার সত্যিই মন নাই। লোটনের ঘুড়িটার দিকে দুদণ্ড তাকাবে তারও অবসর নাই। কেন এমন হয়? জীবনের ছকটাই যদি মিছে হত। যদি মিছে হত সব। তাহলে তো সবটাই অবসর। সুফিয়া মনে মনে হাসে। আবোলতাবোল চিন্তা তাকে হাসায়।

দখিন মাঠের আকাশে দুটো ঘুড়ির প্যাঁচ। হায় হায়। হকারের ব্যাটা তৈয়বের প্যাঁচ। লোটনের ঘুড়িটা গোঁত্তা খেয়ে পড়ল ধানক্ষেতে। লোটনের চোখে জল। সুফিয়া জ্বলে ওঠে। জব্বারের ব্যাটা তৈয়ব হাড় বজ্জাত। শুধু শুধু লোটনকে কাঁদায়। সুফিয়ার রাগ ঝুঁকে পড়ে তৈয়বের ঘাড়ে। শিং ভেঙে বাছুরের দলে এলো কেন ছোঁড়াটা। ঐ পর্যন্ত ভেবে সে কাজে মন দেয়।

অজুর পানি নিয়ে মগরেবের নামাজের উদ্দেশ্যে ঘোমটা কেটে পশ্চিম মুখো বসেছে সুফিয়া। লোটন এসে লুকিয়েছে ধানের কুটির পাশে, দুষ্টু ছেলে। দিনভর টইটই। সুফিয়ার মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। নামাজ সেরে কথা হবে বসো।

কেবলা মুখে নামাজের পার্টিতে খাড়া হলে অন্যকথা ভাবার নিয়ম নাই। সুফিয়া সে কথা মনে মনে জানে তাই নয় হাড়ে হাড়ে মানে। নিয়ম বেঁধে দাঁড়িয়েও উঠোনের ঝটপটানির টের পায়। শুনব না মনে করেও কানে আসে সে কথা। তার বারবার সুর ভুল হয়। জব্বারের গলা তৈয়বের গলা তাকে বিরক্ত করে। তবু নামাজ শেষ করে এসে উঠোনে দাঁড়ায়।

সুদেব ঘোষের বৌ নাকি সুরে বলে—জব্বারকে দিয়ে লোটনকে খুন করালে সুফিয়াবুবু? তোমার মনেও এই ছিল?

—খুন? সে তার কিছুই জানে না। সবেমাত্র উঠোনে পা রেখেছে। শরীর ছুঁয়ে আছে মগরেবের নামাজের পবিত্রতা। লোটনের দিকে চোখ পড়তেই সুফিয়া চমকে ওঠে। চোটটা সাংঘাতিক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে লোটনের মুখটা। কে? কে করলে এ অবস্থা? জব্বার?

সুদেবের বৌ গলা তোলে—কি দোষ করেছিল আমার ছেলেটা?

সুফিয়া কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। সে দ্রুত পায়ে লোটনের কাছে ছুটে যায়। সস্নেহে কোলে তুলে নেয় লোটনের মাথা। কি হয়েছে লোটন? আমায় খুলে বল বাবা। সুদেব ঘোষ মার মার মুখে ছুটে আসে—খবরদার। লোটনকে ছোঁবে না সুফিয়াবুবু। আমার দিব্যি রইল ওকে নামিয়ে দাও। ভালোমানুষির আড়ালে তোমাদের চোখের বিষ আমরা বুঝি না? দরগার মজলিসে কিসের ফিসফিস? সুদেব! সুদেব বল্‌ছে এই কথা। সুফিয়ার শরীর শিথিল হয়। লোটন আপনাআপনি কোল থেকে নেমে যায়। সুদেব একি বল্‌ছে? ওকি ভেবে বলছে সব? সুফিয়া কাতর গলায় মিনতি করে। ও. সুদেব চুপ কর। তোর

ছেলেকে কোনদিন ছোঁব না কথা দিলাম। এই ভর সন্ধ্যেয় জেনে বুঝে তুই আর মিথ্যা বলিস না। আমার চোখে কিসের বিষ দেখলি তুই? কার শেখানো কথা তুই আওড়ে গেলি সুদেব? মজলিসের কথা রাখ। আমার সাথে মিথ্যে বললে জিভ খসে যাবে।

সুদেবের বৌ গলা চড়ায়—ভৈরব তো ভুল শোনেনি। সদরের বাবুরা তোমাদের পাততাড়ি গুটোতে বলছে গো। তাই বলে যাবার আগে শেষ কামড় আমার ছেলেকে? ছিঃ ছিঃ সরমে মরে যাই।

সুফিয়া তিরিক্ষি গলায় চিৎকার করে—ও সুদেব। বৌকে মানা কর। রসুলপুরের মাটিতে যেন সদরের বাবুদের মত বিষ না ছড়ায়। আমি, তুই, ভৈরব, লোটন, কাসেম সব পাশাপাশি এতকাল আছি এটা তোদের ভালো লাগছে না? দরগার মজলিসের কানাঘুষো নিয়ে কেন মিছে আমাকে জড়াস। বাতাসে কিসের গন্ধ তুইও জানিস আমিও জানিরে। রসুলপুরের কাদার তাল, কাসেম মিঞার পায়ে দলে দলে ইঁট হয়। সেই ইঁট মার্কা পড়ে। কেরামতের ট্রাকে চড়ে ইঁট শহরে যায়। সেই ইঁটে পুজো করে মন্দির গড়ার স্বপ্ন দেখে কারা তুই জানিস না? দরগার মজলিসে তাই নিয়ে কানাকানি তার মধ্যে আমি আসছি কোত্থেকে?

সুফিয়া বলতে বলতে হাঁপিয়ে যায়। তার বুকের মধ্যে সমুদ্র সমান ঢেউ পাড় ভেঙে আছড়ে পড়তে চায়। সুদেব সব জানে। তাব উত্তর দেবার সাধ্যি নাই। তাই ছেলেকে দুম্‌দাম মেরে রাগ তোলে অকস্মাৎ।

সুফিয়া কঁকিযে উঠে। খবর্দার সুদেব। আমার চোখের সামনে লোটনকে মারবি না। মারতে হয় নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মার। কেউ কিচ্ছুটি বলবে না।

সুদেব গর্জে ওঠে—আমার ছেলেকে আমি মারব তোমার কি? জব্বারের ব্যাটা তৈয়ব যখন মেরে শেষ করে দিলো তুমি কি তখন অন্ধ হয়েছিলে?

সুফিয়া—হায় আল্লা! আমি তখন নামাজে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নামাজে দাঁড়ালে কোনদিকে কান দিতে নাই তোকে কি আজ এও বলে দিতে হবে?

বিশ্বাস না হয় তোর ছেলেকেই শুধিয়ে দেখ। সে তো আর তোর মত মিথ্যে বলবে না।

লোটন সুফিয়ার পক্ষে বলতে গেলে সুদেব টুঁটি চেপে ধরে। সুদেবের বৌ লোটনের হাত ধরে হিড়হিড় করে তাকে ঘরে টেনে নেয়।

সংখ্যাগুরু সংখ্যায় লঘুর উপর জবরদস্তি চালায়। চিরকাল ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। এদেশে যারা সংখ্যালঘু রসুলপুরে তারাই রাজা। জব্বর সাত তাল করে মজলিসে নালিশ জানালে সুদেবের সাত'শ টাকা জরিমানা। আগে হলে সুদেব মানত মাতব্বরদের কথা। কিন্তু দেবকীনগরের উসকানিতে সে হেঁট করেনি মাথা। তার যদি দোষ হয় একআনা পনেরো আনা জব্বারের। তার বেলায় সাতশ আর জব্বারের কেন তিনশ টাকা জরিমানা হবে? মোক্ষম জায়গায় খোঁচা দিয়েছে সুদেব। সুদেবকে খেলাচ্ছে দেবকীনগর। খেলছে সুদেব। জল থেকে তোলা মাছের মত হাঁপাচ্ছে কখনও। ভারতবর্ষের বাতাসে বারুদ। এই সুযোগে দেবকীনগর আনোয়ারকে একঘরে করেছে। হয়ত সুদেবেরই প্ররোচনায়। কারণটা ভিন্নতর। সে নাকি বড় ঘরের মেয়েদের দিকে পিটির পিটির চোখে তাকায়। চোখ গেলে দিলেও রাগ পড়ে না সত্যি। দেবকীনগরের দিবাকর হালদারের ভাষায় লোকটা সত্যিই পাজি। তবু এই হিড়িকে রসুলপুরের মগজে অন্য কথা—অগ্নিগর্ভ জনতার রায় আনোয়ারের অপমানের শোধ সুদেবকে পুষিয়ে দিতে হবে। তুলতে হবে ওর এ গাঁয়ের

বাস।

সুফিয়ার চোখের পাতায় অফুরান জিজ্ঞাসা। কেন। সামান্য ঘুড়ির প্যাঁচ কাটা নিয়ে দুগাঁয়ের সম্ভ্রম ধূলিসাৎ? রসুলপুরে যেমন হিন্দু রইল না। দেবকীনগরের মাটিতে তেমন মুসলমানরা ঘর ছাড়া। বিকেল পর্যন্ত লোক বিনিময় হল দুগাঁয়ের। সুফিয়ার বুকের মধ্যে হু হু জ্বালা।

রসুলপুরের গাজনতলা আজ শূন্য। শিবের দালান সুফিয়াকে কাঁদায়। তার বুকের মধ্যে স্বজন হারানোর হাহাকার। লোটনকে কতদিন দেখিনি। আজ হয়ত লোটন আসবে হয়ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলবে চলনা গো সবাই চলেছে চোত গাজনের মেলায়।

গঞ্জের মাঠে ঢাকের বোল। বোলান দলে চোখে চশমা এঁটে মহিলা বেশে পুরুষের নাচ, পালাগান দুহাত তুলে সুফিয়াকে ডাকে। লোটন কি ডাকবে না একবার?

মজলিসের মাতব্বরদের নির্দেশ এবারে রসুলপুরের কেউ গঞ্জের মেলায় যাবে না। লোটনও কি তার পর হয়ে গেল আজ? সুদেবের রাগের মাথার সব কথাই কি সত্যি কথা? সুফিয়া ভুলে যেতে চায়, সব ভুলে যেতে চায়। এ ভাগাভাগি সে চায়নি কোনদিন। এ বিভেদ সে মানে না। এদেশের আকাশে বাতাসে যে যুদ্ধের দামামা। মন্দির, মসজিদ নিয়ে হানাহানি। কাদের উসকানি? সদরের বাবুরা কি কখনও পুজো করে? সুফিয়ার জানতে ইচ্ছে হয়। মজলিসের মাতব্বররাও এক ছাঁচে গড়া। তবে কেন সুফিয়া আর লোটনের মাঝে বিভেদের দেওয়াল? সুফিয়া রসুলপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখে কত রঙবেরঙের পোশাকে ছেলেরা চলেছে গঞ্জের মেলায়। ফি বছর এসময় রসুলপুর জমজমাট। সুফিয়ার শরীরের কানায় কানায় এক অদ্ভুত প্রত্যাশা লোটন, হয়ত লোটন এ পথেই যাবে গঞ্জের মেলায়। নিশ্চয় যাবে। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলকে দেখে। চেয়ে চেয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়। ওরা তো কেউ তার লোটন নয়। নিজের অজান্তে চোখে জল আসে।

শেষ বিকেলের মৃদু আলোয় সে সত্যিই টের পায় সমাজের বুকে মস্তবড় ছ্যাঁদা। সে পথে বিষধর কেউটেরা এসে বিষ ঢেলে যায়। কে বাঁধবে নিশ্ছিদ্র বাসরঘর? ভারতের মাটিতে তেমন মানুষ কোথায়? সুফিয়া হাঁপায়। ইদানিং সে তার বয়স বাড়ছে টের পায়। এই বয়সে কম দেখল না। মানুষ চেনবার দিন এসেছে এবার। ভেদবুদ্ধি মানুষের দিকে সুফিয়া থুথু ছিটোয়। সে জানে রসুলপুরের পাঁচহাজার জনতায় নামাজির সংখ্যা বড়জোর নয়। দেবকীনগরের কালীমন্দিরে পুজো দেবার লোক নাই। ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে ভোট বাবুদের প্যাঁচ কষাকষি খেলা। এ খেলায় রসুলপুর দেবকীনগর মাতোয়ারা।

মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না সুফিয়া জানে। তাই নিজের সন্তানের জন্য সুফিয়া কখনও চিৎকার করে কাঁদেনি। লোটনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ রসুলপুর আর দেবকীনগরের বিবাদের জের। সুফিয়া ভোঁকাট্টা ঘুড়ির মত আছড়ে পড়ে মাটিতে। রসুলপুরের মাটিকে আঁকড়ে ধরে লোটনের জন্য ফোঁপায়।

সমতা

বিদিশা ঘোষ দস্তিদার

কমলার ছেলেবেলাটা বেশ ভালোই কেটেছিল। নদীর ধারে ওদের খোড়ো ঘর, আর একচিল্‌তে উঠোন, বাড়ীর পেছনে দু-চারটে আম-জাম-নারকেল গাছ, দুটো ছাগল আর একপাল হাঁস—এই ছিলো ওদের সম্পত্তি। কমলার বাবা ছিদাম ঘোষকে ওদের গাঁয়ের সব্বাই একডাকে চিনত, তেমন মুরুব্বী গোছের কেউ ছিলো না ছিদাম। একটা ছোট মুদীর দোকান ছিল, আর ছিলো মিষ্টি গানের গলা। বেশ কয়েকটি ছেলেপিলে ছিলো ছিদামের, বর্ষায় নদী এগিয়ে এলে ছিদামের মা একগাদা ঠাকুর দেবতার স্তব করতো, নাতি নাতনীদের আগ্‌লে, কমলার মা তুলসী, চাল চুঁইয়ে পড়া জলের ফোঁটার তলায় নারকোলের মালা বসিয়ে দিতো, বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি আর বাতাসের শোঁ-শোঁ গর্জন, নারকোলের মালায় জল পড়ার টুপ্‌টাপ্‌ শুনতে শুনতে কমলার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসত।

একটু বড় হয়ে কমলা বুঝতে পারলো ওরা বড্ড গরীব, একটা কাপড় ওরা তিন মেয়ে আর মা ভাগাভাগি করে পরতো। ভাতেব পাতে তরকারী জুটতো না, অসুখ-বিসুখ জ্বরজ্বালায় তুলসীর রস আর নির্জলা উপোসই ছিল সম্বল, ডাক্তার কিংবা ওষুধের বিলাসিতা ওদের স্বপ্নেও ঠাঁই পায়নি কোনদিন।

কমলার দিদির বিয়েটা খুব নমো নমো করেই সারলে ছিদাম, তবুও পণের তিনশো টাকা দিতে না পারায়, ছ'মাস বাদেই দিদিকে ফেরৎ দিয়ে গেল ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা। বহুকষ্টে হাতে পায়ে ধরে, একশো টাকা কোনরকমে জোগাড় করে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠায় ছিদাম, কিন্তু তারপর থেকে আর একবারের জন্যও দিদিকে বাপের বাড়ী আসতে দেয়নি ওরা, ছিদাম কিংবা তার বউ তুলসীর অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ দুঃখও ছিলো না। মেয়ে পার করলেই পর হয়—এই ছিলো ওদের বিশ্বাস।

কমলার বিয়ে হবার আগে, ওর দাদা কাশীনাথের বিয়ে হয়ে গেল, বৌদির দুর্জয় বাক্যবাণে মাঝে মাঝেই কমলার মা পুকুরধারে বসে চোখের জল ফেল্‌তো, অবশ্য কাশীনাথও কিছু কম যায় না, সংসারে তার আহার-নিদ্রা অথবা মৈথুনক্রিয়ায় একটু ব্যাঘাত যদি ঘটতো তবে মা-বউ-বোন বা বাবা কাউকেই সে ছেড়ে কথা কইতো না। কমলা দেখেছে, প্রবল মার খেয়েও ওর বৌদি ভীরু ছাগলছানার মতো, দাদার হাতে পান্‌ কিংবা জলের ঘটি তুলে দিচ্ছে।

সংসারের নিত্য অভাব অভিযোগ, কিংবা মা-বাবা-দাদা-বৌদির ঝগড়া—এগুলো তেমন খারাপ লাগতো না কমলার। একদিন ঝগড়া হলেই সে ঝগড়ার বাদী ও বিবাদী যেই হোক্‌ না কেন, পাড়াশুদ্ধ লোক দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতো, তারপর বেশ কিছুদিন ফুশুর-ফুশুর-গুজুর-গুজুর—এর, ওর, তার সাথে কথা বন্ধ কিংবা কারণে অকারণে ঠেশ দিয়ে একটি বাক্য ছুড়ে দেওয়া—এ সবেতেই কমলার বেশ আনন্দ হতো।

এইভাবে কখনো খেয়ে, কখনো না খেয়ে, ঝগড়া-কোঁদল ঘরের কাজ করে দিব্যি আঠেরোটি বছর কেটে গেল কমলার। তারপর হঠাৎই একদিন বিয়ে হয়ে গেলো।

কমলার স্বামী সলিল বরানগরে একটা কারখানায় কাজ করে, থাকে চিৎপুরের একটা বস্তিতে। জীবনে সেই প্রথম কোলকাতা দেখলো কমলা। আনন্দে, বিস্ময়ে ওর মুখে কথা

ফুটলো না। কমলার বর মানুষটি বেশ। তিনকুলে কেউ নেই, নিজেই টাকা জমিয়ে, একটা হাতঘড়ি আর রেডিও কিনেছে। কমলার বিয়ের দরুণ বরপণ হিসেবে পাওয়া পাঁচশো টাকা, কমলার নামেই ব্যাঙ্কে জমা করিয়েছে। দোষের মধ্যে ঘোর মদ্যপ, আর একটু মারকুটে। তা, ওসব কমলার বেশ সহ্য হয়ে গেলো অল্পদিনেই, এমনকী কিছুদিন বাদে মদের সাথে খাবার জন্য চমৎকার বেগুণী, পিঁয়াজী তৈরী করতেও শিখে গেলো কমলা। সলিল কমলাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করে, ওদের একটি-দুটি ছেলেপিলেও হলো।

কমলা এখন পুরোদস্তুর সংসারী, কোলকাতায় আসার পর কল-জলের বাঁধা সময় ও স্বল্পতায় অসুবিধে হত ওর, অধুবিধে হত খোলা উঠেনে স্নান করতে, এখন ও তিন ছেলের মা, ভোর না হতেই কলের লাইনে বাল্‌তী পাতে, জল-কল, কাপড় মেলা, গুল দেবার জায়গা নিয়ে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী প্রতিবেশীদের সাথে রীতিমত ঝগড়া হয় ওর, বাংলা-হিন্দী বুলি ও গালাগালিতেও বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছে ও। কালীপুজো, শিবরাত্রি কিংবা ছট্‌পরবে—যখন চাঁদা তুলে ভিডিও ভাড়া হয় বস্তিতে, সারা রাত জেগে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে কমলা হিন্দী ফিল্ম গেলে। মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী গেলে মন টেঁকে না ওর, কোলকাতা ছেড়ে ওর একদণ্ডও ভালো লাগে না। কমলার গাঁয়ের মেয়ে বৌরা এখনো ইলেকট্রিকের আলো দেখেনি, বাথরুম-পায়খানা ব্যবহারের কথা শুনে ওরা হেসেই অস্থির হয়, কমলার পায়ে হাতীবাগান ফুটপাথে কেনা উঁচু হিলের জুতো, কপালে সিঁদুরের বদলে আটকানো সোয়েডের টিপ্, আর ব্লাউজের তলায় অন্তর্বাস—এ সবই ওদের হাসি আর নিন্দার বস্তু। তাই বাপের বাড়ী কমলার আর যাওয়া হয়ে ওঠে না, অবশ্য বিশেষ কোনো দুঃখও নেই ওর সেজন্য, ছেলেমেয়ে-স্বামী-জল-কল, ভিডিও-শিবরাত্রি এসব নিয়ে ও বেশ সুখেই আছে।

আঘাতটা এলো একেবারেই অন্য জায়গা থেকে, বলা নেই কওয়া নেই, সলিলের কারখানায় হঠাৎ লক্‌আউট, ফলে একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়ল কমলা। নিজেরাই বা কী খায়, আর ছেলেমেয়েগুলোর মুখেই বা কী দেয়, এছাড়া বস্তির ঘরভাড়া, অন্যান্য খরচ—সলিল-কমলা ভেবে কূল পায় না। নিদ্রাহীন কাটে রাতের পর রাত।

বস্তিতেই থাকে শ্যামার মা, বয়স হয়েছে, স্বাস্থ্য কিন্তু তেমন ভাঙেনি। অনেক বলা-কওয়ার পর বি কে পাল এভিনিউতে একটা বড় বাড়ীর কয়েকটা ফ্ল্যাটে কাজ দেখে দিল সে। ঐসব ফ্ল্যাটে বাড়ীগুলোর মাটিতে পাতা কার্পেট, ঘর ঠাণ্ডা রাখার মেশিন, রেফ্রিজারেটার আর অজস্র জিনিষের সমৃদ্ধি দেখে কমলার চোখে পলক পড়ে না। তার গ্রামের পড়োশী মেয়ে-বৌরা ওর সস্তার জামা-কাপড় প্রসাধন দেখেই বিস্মিত এবং অসূয়ান্বিত হতো, ওদের গোপন ঈর্ষার ছায়াপড়া চোখের সামনে আপন শহুরে বৈভব মেলে ধরে কমলা আপ্লুত হতো এক অদ্ভুত আনন্দে। কিন্তু এত প্রাচুর্য ও বিলাস কমলা আগে তো কখনো দেখেনি। ওর মনে একটা রুদ্ধ আক্রোশ দানা বাঁধে। ওর গ্রামের পাড়ায়, কিংবা কোলকাতার বস্তিতে যাদের দেখেছে কমলা, তারা সবাই ওরই মতো ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে পরে। ভাতের পাতে মাছ জুটলেই তাদের মনে হয় উৎসবের দিন, কিন্তু এইসব বাড়ীর মেয়ে বৌরা বুঝি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, ধব্‌ধবে তাদের রং, চুলে রেশমী উজ্জ্বলতা, আর পোষাক প্রসাধন? মুখে, চোখে, গালে, ঠোঁটে মাখবার এত রকমারী সুগন্ধী, এসব কোনদিন কমলার কল্পনাতেও ছিলো না। আর পোষাক? সে যে এত সুন্দর রঙের এত বাহারের আর এত দামের হয়, তাই বা ও কি জানত? কিন্তু কমলার সব চেয়ে কষ্ট হয় এইসব বাড়ীগুলোর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দেখলে। ওর নিজের সন্তান পুঁটী, গোকুল আর নয়ন-এর জন্য ওর বুকের ভেতরটা হাহাকার

করে ওঠে। ঘড়ি ধরে পুষ্টিকর খাবার, রঙিন ছবির বই, নামীদামী ইস্কুল, রকমারী পোষাক-এর কোনোটাই ও নিজের সন্তানদের দিতে পারেনি, তাই টিনা, ডোনা অথবা নীলের জন্য যখন ও ডিম সেদ্ধ করে, আপেলের খোসা ছাড়ায় কিংবা রুটিতে মাখন লাগায়, অজান্তেই ঐসব ফুটফুটে বাচ্চাগুলোর ওপর ওর রাগ হ'তে থাকে। রাগ হয় নিজের ভাগ্যের ওপরেও।

ছ'নম্বর ফ্ল্যাটের কর্তা-গিন্নীর খুব মন খারাপ। এলাহাবাদ থেকে ওদের একমাত্র মেয়ে রিমা শ্বশুরবাড়ীর সাথে ঝগড়া করে চলে এসেছে। সকালে কাজে যেতেই টের পায় কমলা কিছু একটা ঘটেছে। বুড়ো কর্তা-গিন্নীর চোখ মুখ থম্‌থম্ করছে, রিমা, শোবার ঘরের বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে রয়েছে, রান্নাঘরে গিন্নীর ছেলের বৌ 'ব্রেকফাস্ট' তৈরী করছে—বাড়ীর আবহাওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক। কমলা ছেলের-বৌ পুপ্‌সির হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে পেঁয়াজ কুচো করতে থাকে। পুপ্‌সির চোখে মুখে চাপা আনন্দ উছ্‌লে উঠছে—ও গলা নামিয়ে কমলাকে বলে—'ফেরৎ দিয়ে গেছে, বুঝলে? দেবে না ? যেমন চামার আমার শ্বশুর, জামাইকে কারখানা করে দেবে কথা দিয়েছে, একটি পয়সাও ঠেকায়নি, এখন বোঝো, দশ তারিখের মধ্যে তিরিশ লাখ টাকা দিতে হবে, নইলে আর নেবে না ওকে, আমি তো তোমার দাদাবাবুকে সাফ সাফ বলে দিয়েছি, এ ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাতে যেও না। যার মেয়ে সেই বুঝুক্, হ্যাঃ নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না!' এরপর পুপ্‌সি একটা ইংরেজি গাল দেয়। বিস্ময়ে কমলা স্তম্ভিত। পেঁয়াজ কাটতে কাটতে ওর হাত থেমে যায়। হঠাৎ অনেকদিন বাদে, ওর দিদির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে, বাবা ছিদাম ঘোষকে। কোনোরকমে ছ'নম্বর ফ্ল্যাটের কাজ সেরে, ও একুশ নম্বরের কলিং বেল টেপে। জাপানী বাজনা থামতে না থামতেই মিসেস চাওলা দরজা খুলে দেন। কমলা দ্রুতহাতে ঘর ঝাড়ু দেয়, মোছে, তারপর বাসন মাজতে রান্নাঘরে ঢোকে। মিসেস চাওলা ওকে হাতের ইশারায় বসার ঘরে ডাকেন, কমলা দেখে বাইশ নম্বরের মিতু বৌদি, সতের নম্বরের রাধিকা, মিসেস চৌধুরী, মিসেস আলুওয়ালিয়া—সবাই গোল হয়ে বসে গলা নামিয়ে, ভুরু কুঁচকে উত্তেজিত হয়ে কিছু আলোচনা করছেন। কমলা ঢুকতেই মিসেস চৌধুরী ওকে কার্পেটে বসতে বলেন, তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেন —'হ্যাঁ গো, ছ'নম্বরে কি হল? রিমা হঠাৎ একা এলো যে? জানো নাকি কিছু ?'—

কমলা আর অবাক হয় না, বরং যা দেখেছে আর পুপ্‌সির কাছে যা শুনেছে সবিস্তারে হাত মুখ নেড়ে বর্ণনা করে। শুনতে শুনতে ওর শ্রোতারা কখনো গালে হাত দেয় কখনো চোখ বড় করে, তারপর উত্তেজিত হয়ে ইংরেজী আর হিন্দীতে অনেক আলোচনা করে। কমলা বুঝতে পারে ওদের মধ্যে দুটো দল হচ্ছে। একটা দল, রিমার এই হেনস্থায় বেশ খুশী. তারা বলে তাদের মতে রিমা যেমন অহংকারী কুঁদুলে ওর এমনটাই হওয়া উচিত, আর এক দল বলে যতই হোক, পয়সার জন্য বাড়ীর বউকে ফেরৎ দেওয়াটা খুবই অন্যায়, ছ'নম্বরের কর্তা-গিন্নীর বয়স হয়েছে, এ সময় এরকম একটা আঘাত···কমলার চোখের সামনে কথা গড়ায়, রিমার কথা থেকে পাঁচ নম্বরের শৈলেনের মদ খেয়ে বউকে মারধোর করার কথা, আঠেরো নম্বরের মাধুরীর গোপনে গর্ভপাত করানোর কথা, মিঃ ঘনশ্যাম-এর জুয়ায় হেরে কনটেসা বিক্রী করে দেবার কথা, তেরো নম্বরের শ্যামলীর মেয়েটাকে ওদের ড্রাইভার রতনের মত দেখতে সেই কথা—কমলার চোখের সামনে এক আশ্চর্য জগৎ উন্মোচিত হয়, মিসেস চৌধুরী, রিমা, মিসেস আলুওয়ালিয়া, পুপ্‌সি, মিঃ ঘনশ্যাম—এদের সবার থেকে নিজেকে খুব একটা আলাদা মনে হয় না ওর, রান্নাঘরের সিংকে মিসেস চাওলার বাসন বার করার শব্দ শোনা যায়, কমলা কার্পেট থেকে উঠে, রান্নাঘরে বাসন মাজতে চলে যায়। ওর বেশ হাল্‌কা লাগছে।

বাড়ী ফিরে কমলা ভাত বসায়, জলের টগ্‌বগ্‌ শব্দ শুরু হতেই পুঁটী-গোকুল-নয়ন স্টোভের ধার ঘেঁসে বসে, ওদের চোখেমুখে প্রত্যাশা। কমলার একটু আগে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া খুশিটা একটু একটু করে হারিয়ে যেতে থাকে। ডোনা-টিনা-নীল-পল—আর ওর ছেলেমেয়েরা—নাঃ কিছুতেই মেলে না। ওর মন আবার অস্থির হয়, মনের কোণে ক্ষোভ জমে। সলিলের অক্ষমতাকে মনে মনে ও গাল দেয়।

ভাত খাওয়া হয়েছে কি হয় নি, সলিলের বন্ধুরা ওকে ডাকতে আসে। কারখানা খোলার দাবীতে আজ বড় মিছিল, আজকের মিছিলে কর্মহীন শ্রমিকদের স্ত্রী-ছেলেমেয়েরাও যোগ দেবে—এই ওদের পরিকল্পনা। কমলা খুব বিরক্ত হয়। 'কী হবে মিছিল করে? কারখানা ওমনি খুলে যাবে। আর খুললেই বা কী এমন রাজকার্য হবে? সেই তো থোড় বড়ি খাড়া—আর'—ওর ভীষণ রাগ হয়ে যায়। ওর রাগ দেখে ভূপতি হাসে, বলে 'বৌদি, এত রাগবেন না, শুধু আমাদের কারখানাই নয়, সারা দেশে লাখ লাখ কলকারখানা বন্ধ—আমাদের চেয়েও দুরবস্থার মধ্যে আছে লোক, একদম না খেয়ে,—সবার জন্য একটু ভাবুন'—

'কেন সব সময় নীচু দিকে নজর দেবো কেন? কে না খেয়ে আছে তা দেখব, কেন আমার চেয়ে হাজারগুণ ভালো ভাবেও তো লোক আছে, এই ছেলেমেয়েগুলোর দিকে আমি তাকাতে পারি না। না একটু ভালো খাওয়া দাওয়া—না একটু লেখাপড়া, যান না, ঐ বড় বড় বাড়ীগুলোয়, যেখানে সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা করে বাচ্চারা মানুষ হয়, তাদের বাবা মাকে গিয়ে বলুন না—আমাদের কথা ভাবতে!'—

—একদমে এতগুলো কথা ব'লে কমলা হাঁপায়। ভূপতি আবার হাসে, বলে—'আঃ রে বৌদি, সেই জন্যই তো, যাতে আপনার আমার দুবেলা ভাত জোটে, এই ছেলেপিলেগুলোর জন্য একটু লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়, বড় হয়ে এদের চাক্‌রী-বাক্‌রী জোটে—এ-সবের জন্যই আপনাকে আজ যেতে হবে—আর বড়লোকেরা তো আপনার আমার ভাগ থেকে নিয়েই নিজেরা ফুলেছে, আপনার ন্যায্য পাওনাটি তো বুঝে নিতে হ'বে তাদের থেকে, তাই না?'

কমলা নিমরাজী হয়ে মিছিলে বেরোয়। বড় রাস্তায় বেরিয়ে ও দেখে অজস্র কালো কালো-মাথা ছেলে-মেয়ে বাচ্চা-বুড়ো কেউই আর বাকী নেই। কমলা অবাক হয়—এতো লোক, এতো লোক তারই মতো কষ্ট পাচ্ছে, এতো লোকের ভাত জোটেনা, এত লোক চায় বাচ্চাদের পেটপুরে খেতে দিতে, লেখাপড়া শেখাতে?

অজস্র লোকের গলার শব্দ কমলার ছেলেবেলায় দেখা বন্যার নদীর মত গর্জনে মুখরিত হয়, কমলা টের পায়, মানুষের স্রোতটা বাঁধভাঙা নদীর রূপ পাচ্ছে, সেই মুখর, সরব, প্রাণবন্ত প্রতিবাদী স্রোতে মিশে কমলা এগিয়ে যায়, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি রিক্সা স্তব্ধ করে কেবল বেগবান মানুষেরা পথে হাঁটে, কোটি মানুষের পায়ের তালে কমলার পাও তাল মেলায়।

মুক্তি

শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লবী অবাক হয়ে মাকে দেখল। শাদা শাড়ি, শাদা ব্লাউজ আর শূন্য সিঁথিতে মাকে অনেক কমবয়সী দেখাচ্ছে। সুতপা কি সব দরকারে ছুটোছুটি করে রান্নাঘর আর শোবার ঘর করছিল। মা'র এই সপ্রাণ ভঙ্গিও পল্লবীকে অবাক করে তুলেছে। ঠিক ষোল দিন হতে চলল পল্লবীর বাবা ওদের ছেড়ে, এ জগৎ ছেড়েই চলে গেছে। টেবিলের ওপর তাঁর এ্যাসট্রেটা কেমন অসহায়ের মতন পড়ে আছে। খাটের রেলিং-এ এখনো আটকে আছে বাবার একটা গেঞ্জি আর চেককাটা লুঙ্গি। সমস্ত বাড়িঘর জুড়ে তাঁর ফেলে যাওয়া জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে বাবার কথা, বাবার মুখটা পল্লবীকে ভেতরে ভেতরে শুধু ধসিয়েই দিচ্ছে। পল্লবীর বাবার পিঠের মধ্যিখানে একটা কালো কুচকুচে আঁচিল ছিল, ঠোঁট থেকে গাল অবধি একটা লম্বা ছুরির ফলার মতো কাটা দাগ আর ডান পায়ের কড়ে আঙুলের নখটা ছিল কাগজের মতো পাতলা ফ্যাকফেকে সাদা। ঐসব চিহ্নগুলো ছিল ওর বাবার নিজস্ব চিহ্ন। বাবা বেঁচে থাকতে এত খুঁটিনাটি পল্লবীর মনেই ছিল না এখন ছবির মতো চিহ্নগুলি মাথাজুড়ে। মানুষ চলে যায় আর অসহায়ের মতো দেখতে হয় তাই। এটাই নিয়ম। টিভিটা শুধু শুধু চলছে। স্মৃতি, শোক আর নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য পল্লবীই ওটা চালিয়ে রেখেছে। কেমন ভাল্লাগছেনা, অস্থিরতা-বোধ। দু'দিন আগেও বাড়ি ভর্তি লোকজন, সেজ পিসী, ন পিসী, দুলুকাকু ও দুলুকাকুর বৌ আর মেয়ে, দিদা। তাই এতদিন বাবার অভাবটাও এত তীব্র হয়ে বাজেনি, এখন যেন আর সহ্য করা যাচ্ছেনা। এত লোক, কথাবার্তা, হৈ চৈ-রান্নাবান্না দুলুকাকুর মেয়ে পিংকির ছেলেমানুষি— এসব যেন শোকের বদলে, কেমন একটা উৎসবের চেহারা এনে দিয়েছিল। ঐ যে কথায় আছে না, দুঃখ ভাগ করে নিলে কমে, আনন্দ বাড়ে। শোক করবার জন্য নিরালা নিভৃত কোণ চাই। এই ক'দিন এত হৈ-হল্লা পল্লবীকে এতটুকু আড়াল হবার সুযোগ দেয়নি। পরশু থেকে সব এক এক করে চলে যেতে বাবার জন্য শোক পল্লবীকে বিঁধে ফেলছে। থেকে থেকে চোখে জল আসে। মনে হয় বাবা যেন এই নাম ধরে ডেকে উঠলেন, জল দিয়ে যেতে বললেন। এক গ্লাস। কাল থেকে কতবার পল্লবী বাবার ডাক শুনে সাড়া দিয়ে উঠেছে 'যাই' বলে আবার পরমুহূর্তে ভ্রান্তি বুঝতে পেরে চোখ ভরে গেছে জলে। নাঃ, বাবা তো আর ডাকবে না।

রান্নাঘর থেকে মা'র অস্তিত্বের শব্দ ভেসে আসছে ঠুন্‌ঠান। কি যেন একটা ভেজে ভেজে রাঁধছে, ফোড়নের গন্ধ ছাড়ছে। বিরক্তবোধ করল পল্লবী। মা আর রান্নার সময় পেলো না। এসব খাবে কে ? মা'র হয়েছে কী? বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে কেমন টলে গেল। এতোক্ষণ ধরে পা গুটিয়ে বসে থাকাতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। পল্লবী শাড়ির আঁচল সরু করে বাম কানের ফুটোয় ঢোকাল। শুনেছে, যে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে তার বিপরীত কানে সরু কিছু দিয়ে সুড়সুড়ি দিলে ঝিঁ ঝিঁ ধরাটা কমে আসে। কানের ভেতর দু'চারবার সুড়সুড়ি দিতেই পল্লবী টের পেল ঝিঁ ঝিঁ ধরাটা অনেক কমে আসছে। ও আস্তে হেঁটে এল জানালা পর্যন্ত। পায়ের পাতায় এখনো ভার-ভার অবশ ভাব। জানালার পর্দা সরিয়ে পল্লবী বাইরে তাকালো। আকাশে আজ অনেক তারা। ছোটোবেলায় বিশ্বাস করত মানুষ মরে গেলে আকাশের তারা হয়ে যায়। বালিকা বয়সে মুক্তিমাসী আকাশের একটা নতুন তারা দেখিয়ে

বলেছিল, 'দেখেছিস তারাটা নতুন, নিশ্চই ঐ তারাটা বাবা'— বলে আঁচলে চোখ মুছেছিল মুক্তিমাসী।

এখন জানে এসব নিছক কল্পনা তবু যেন বৃথাই পল্লবী মাথা তুলে আকাশের তারা খুঁজল। বাবা কি চেয়ে দেখছে ওকে? কোন তারাটা বাবা? হেমন্তের পরিষ্কার আকাশে সব তারাগুলোই জ্বলজ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। নতুন কোনো তারা চোখে পড়ল না। আর তাছাড়া তারাদের সীমাসংখ্যার হিসাব পল্লবীর জানাও নেই। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো সবগুলো জ্বলছে না, মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ভাবে জ্বলছে। দূর থেকে একজন লম্বা মানুষকে হেঁটে আসতে দেখল পল্লবী। আরেকটু কাছাকাছি হতেই চিনতে পারল, রবীনকাকু। বোধহয় অফিস থেকে ফিরছেন। রবীনকাকুকে ফিরতে দেখে আবার চট্ করে চোখে জল এসে গেল। ওর বাবাই আর কোনদিন কোন জায়গা থেকে ফিরে আসবে না।

পল্লবী সরে এল জানলার পাশ থেকে। কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া তৈরি করছে। বোধহয় টুকুন। ক'দিন পরেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা। ঠিক তখনি পল্লবীর নিজের স্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। আর ক'দিন ছুটি বাকি আছে কে জানে। বাবার অসুখে দিন দশ আর মৃত্যুর পর মাসখানেক—প্রায় দেড়মাসের ছুটি নিয়েছে ও। নতুন চাকরি, এর বেশি আর ছুটি বাড়ানো উচিত হবে না, এদিকে স্কুল যেতেও ইচ্ছে করে না তবু ক'দিন ছুটি বাকি আছে দেখবার জন্য ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ রাখল ও। কিন্তু ক্যালেন্ডারের তারিখ কোথায়? বাবার নিজের হাতে লেখা কিছু অক্ষর আবার চোখের ছবি ঝাপসা করে দিল পল্লবীর। অনেকগুলো ফোন নম্বর লিখে রেখেছে বাবা। তমালকাকুর বাড়ির ঠিকানা। কিচ্ছু ভাল্লাগছে না, চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে অবুঝের মতন। 'বাবা ফিরে এস আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, খিটিমিটি করলেও গায়ে মাখব না।'

দেয়ালে ঝোলানো বাবার ফটোর দিকে চোখ চলে গেল পল্লবীর। গলায় ফুলের মালা পরে হাসছে। বাবা কী ফুল পছন্দ করত! ফটোর মতো হাসি হাসি মুখও ছিল না বাবার। ইলামাসির বিয়েতে জোর করে হাসিয়ে বাবার একটা ফটো তুলেছিল তরুণমামু। এ্যালবাম ঘেঁটে খুঁজেপেতে নেগেটিভ বের করে এনলার্জ করা হয়েছে ফটোটা। মৃত্যুর পর মৃতের হাসিমুখের ফটোই খুঁজে টাঙ্গায় আত্মীয়-পরিজন। সংসারটা তোমার কাছে সুখেরই ছিল— এমন একটা ভাব অবলম্বন করতে চায় মৃতের কাছের মানুষরা। দুঃখের ভাব ফুটলে বিবেকের দংশন যে নিজেদেরই। পল্লবীর বাবার কাছে সংসারটা কী সুখের ছিল? সবসময়ই যেন রেগে থাকতেন। অসুখে ভুগে আরো খিটখিটে হয়ে পড়েছিল। অবশ্য দোষও ছিল না, হাঁপানি মানুষকে শেষ করে দেয়। বাবার সে কষ্টটা তো চোখের ওপরেই দেখেছে। সারা রাত বালিশ থাক্ থাক্ সাজিয়ে হাপরের মতো হুশ হুশ শ্বাস টানত বাবা। বাতাস চাইত, পেত না, তাতে আরো ক্ষেপে যেত, মাকে যাচ্ছেতাই করে বকত। যেন দোষটা মারই, মার জন্যই বাবার শ্বাসকষ্ট। অথচ পল্লবীর ক্ষেত্রে বাবা ছিল দুর্বল। সেবার জাপান গিয়ে বাবা বাড়ির আর কারো জন্য কিছু না আনলেও পল্লবীর জন্য জাপানী পুতুল, ছাতা—এইসব টুকিটাকি নানা জিনিস এনেছিল। কিন্তু সেই পল্লবীর সঙ্গেই বাবার সম্পর্ক আজকাল কিরকম পাল্টে যাচ্ছিল। বাড়াবাড়ি অসুখের দিনকতক আগে বাবার সঙ্গে বেশ বড়রকমের রাগারাগি হয়ে গেছিল। তুচ্ছ কারণে তুচ্ছ রাগারাগি। স্কুলের টিচারদের সঙ্গে দক্ষিণভারত যাবার কথা হয়েছিল পল্লবীর। ও নিজেও যাবার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছিল না বাবার শরীরের কথা ভেবে। কিন্তু মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল বাবার আচরণে। পল্লবীর দক্ষিণভারত যাবার কথা শুনে চেঁচিয়ে উঠেছিল বাবা। 'না না

অত নাচানাচির দরকার নেই, আমার শরীর ভালো না।'

কী যে হলো! বাবার স্বার্থপর স্বার্থপর কথা শুনে পল্লবীর গা জ্বালা করে উঠেছিল। চিরজীবন কী এই চারদেয়ালের মধ্যেই আটকে থাকব। নিজে চাকরি-বাকরি করে স্বাধীন হয়েও তবে স্বাধীন না! টকাস্ টকাস্ করে ও বাবাকে মুখের ওপর দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। আর তার দিনকতক বাদে আবার অসুখ বাড়ল। নিজে চলে গিয়ে পল্লবীর যাওয়া আটকে দিল। কেমন জব্দ! তখন পল্লবীর গভীর আফশোস হয়। কেন সেদিন বাবাকে ও অত কথা শোনাতে গেছিল! হাসপাতালের অমনোযোগী বিছানায় পড়ে থাকা বাবার ক্লান্ত ক্ষীণ মুখটা চোখের সামনে দেখতে পেল পল্লবী। একদিন সকালে হাসপাতালে বাবার খাবার দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিল ও। চোখের কোল বসা, গলার শির কাছি দড়ির মতো ফুটে বেরিয়েছে, কাঁচা-পাকা একমুখ দাড়ি পল্লবীর হাত ধরে হঠাৎ ডুকরে উঠেছিল। 'মরতে বড় ভয় করে রে খুকু'।

হঠাৎ কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়াতে ডুকরে উঠল পল্লবী। চিৎকার করে কেঁদে উঠে বিশ্বটাকে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে হল। মনে হল মেঝেতে মাথা ঠোকে, দেওয়ালে ঘুষি ছোঁড়ে। অবশ্য এ সব কিছুই করল না বরং সামলে নেবার চেষ্টা করল। শুধু ফোঁপানিটা অপ্রতিরোধ্য যন্ত্রণার মতো জেগে রইল।

টি-ভির পর্দার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়েছিল পল্লবী। কতরকম ভঙ্গি, ঢেউয়ের মতো ভাঙছে-গড়ছে টি-ভির চৌকো কাঁচের দেওয়ালে। একটা বয়স্ক ভারী মুখ রেগে রেগে অনেক কিছু বলছে। বুঝতে না বুঝতেই পল্লবী টের পেল বাবার সেই প্রিয় সিরিয়ালটা শুরু হয়েছে। এই সিরিয়ালটা দেখার জন্য বাবা যেন মুখিয়ে থাকত। সময়-মতোই একদিন শেষ হবে সিরিয়ালটা শুধু বাবাই সময় পেল না শেষ দেখে যাবার। পল্লবী বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল টিভিটা। মাথার ভেতরটা ভার হয়ে আছে।

কান্নার দরুণ আঠার মতো লালা জমেছে মুখের ভেতর। বাথরুমে গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে নেবার প্রয়োজন অনুভব করল পল্লবী। চুল গুছিয়ে বাথরুমের দিকে এগোতে এগোতে ও যেন চমকে উঠল। রান্নার ছ্যাঁক্-ছোঁক্ ঠুনঠান্ শব্দের সঙ্গতের সঙ্গে মা'র গলার গুনগুন সুর শোনা যাচ্ছে। মা গান গাইছে। চাপা গলায় পুরনো দিনের একটা আধুনিক গান। বেশ সুরেলা আর টানটান তো মা'র গলা এখনো। অবাক হল পল্লবী। সুতপাকে কোনদিন এত নির্বিঘ্নে সহজ ভঙ্গিতে গান গাইতে শোনে নি ও। কেমন একটা মিহি সন্দেহ গুলিয়ে উঠল বুকের ভেতরে। মা খুব খারাপ ধরনের মহিলা? বাবার পেনশন আর গ্র্যাচুইটির লক্ষাধিক টাকা মা'র হেফাজতে এসে যাবে বলে সে আনন্দে মা গান গাইছে। নইলে স্বামীর মৃত্যুর পর সুতপার এত গান গাওয়ার আনন্দ কিসের। বুক থেকে হুশ্ করে একটা শ্বাস বেরিয়ে এল। বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছে। মানুষ এত ছদ্মবেশ পরে থাকে কী করে! ওর মা, চিরদিনের নিজের মাকেই ও এতদিন চিনত না বলে কেমন আপশোষ হল। মা'র সঙ্গে চিৎকার করে ঝগড়া করে উঠতে ইচ্ছে করল।

মুখেচোখে জল দিয়ে খানিক শান্ত হল পল্লবী। যে গেছে সে আর ফিরবে না। ছিটকিনি খুলে প্যাসেজ পেরোবার সময় মাকে দেখল টেবিলের ওপর খাবার রাখছে। মেয়েকে দেখে ডাকল সুতপা, 'খুকু আয়, খেতে বোস।'

সুতপার গলায় এতটুকু শোকজনিত অবসাদ নেই। তাজা ঝরঝরে।

পল্লবী খেতে বসে একটাও কথা বলছিল না। অবশ্য এই পনের দিন ওরা দু'জনে কটা কথাই বা বলেছে। কেমন একটা দূরত্বও যেন এসে গেছে মা আর মেয়ের মধ্যে। এই শোক

ওদের কাছে টানেনি, দুরে সরিয়ে দিয়েছে সব অলংকার খাদে গেছে শুধু দু'হাতে দু'গাছি করে সোনার চুড়ি। রঙহীন সিঁথি, এতদিনের অভ্যস্ত টিপও মুছে গেছে। লম্বা চুল ঘাড়ের কাছে হাত-খোঁপা করে জড়ানো। শাদা শুভ্র অন্য চেহারার মা'কে দেখে কেমন ঘোর এসে যাচ্ছিল পল্লবীর। মা'র ছিপছিপে লম্বা চেহারাটা দেখে বোধ হচ্ছে বৈধব্য আসেনি ; মা চিরকালই অমনি কুমারী। মা'র চোখেমুখে শোকের কোন চিহ্নই নেই। বিয়েই হয়নি পল্লবীর সামনে বসে-থাকা সুতপা নামের মহিলার। তবে পল্লবী কে? কোথা থেকে এল! বেশবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভেতরটাও কী বদলে যায়! নইলে পুরনো মাকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন পল্লবী। পাতে কইমাছের ঝাল দেখে পল্লবী অবাক হয়ে মা'র দিকে একরাশ বিরক্তি নিয়ে তাকাল।

মেয়েকে ওভাবে তাকাতে দেখে সুতপা কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে বলল, 'শংকরীকে দিয়ে বিকেলে রেল লাইনের বাজার থেকে আনিয়েছি। এতদিন ধরে নিরামিষ খেতে খেতে মুখ একেবারে··· । কতটুকু ভাত খাস তুই আজকাল'।

পল্লবীর মনে হল এটা মা'র নিজের কথাও নয়। বাধ্য হয়েই তো মাকে নিরামিষ খেতে হচ্ছে। ও সুতপার দিকে তাকাল। সামান্য একটু আতপ চালের ভাত, আলুসেদ্ধ, কাঁচালঙ্কা আর ঘি দিয়ে মাখছে মা। অথচ আগে মাছ না হলে মা'র মুখেই রুচত না। মা'র জন্য হঠাৎ বুকে কষ্টবোধ হ'ল পল্লবীর। রাতে এই ভাত খাওয়া নিয়েও সেজপিসী কথা শুনিয়েছিল মাকে ক্যাটক্যাট করে। রাতে ভাত না খেলে মা'র অম্বল হয়, রুটি একেবারেই সহ্য হয় না। অবাক লাগে পল্লবীর, কে ভাত খেল কে রুটি এসব দিয়ে হবেটা কি! যে গেছে সে কি ফিরে আসবে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাটাও মাথায় এল, এখন যদি মাকে মাছ দিয়ে তৃপ্তিতে ভাত খেতে দেখত তবে সহ্য করতে পারত না পল্লবী। তবে ও ভাবত না যে বাবার জন্য মা'র এতটুকু শোক নেই। এসব বাহ্যিক আচার-আচরণ দিয়েই ভালোবাসা, শোক ইত্যাদি পরিমাপের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সমাজ। হৃদয়ের খবর কে জানতে চায়! ও তো দুহিতা, ও মাছ খেলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। পুত্রকন্যার জন্য শোকপালনের কোন নির্দিষ্ট পন্থা নেই, যত শোক স্ত্রীর, সহধর্মিনীর! সহধর্মিনীই কি পুরুষদের একমাত্র কাছের মানুষ?

এত সব চিন্তা মাথায় ঘোরাফেরা করলেও বাবা মারা যাবার এক মাস সময়ও পুরতে না পুরতে পাতে মাছ দেখে তবু কেমন ঝাঁ-ঝাঁ করে রাগ চমকে উঠল পল্লবীর মাথার ভেতর। যেন মাছ খেলেই বাবার প্রতি ওর শোক, সম্মান সব কমে যাবে। মুখে কিছু কথাও এসে গেছিল কিন্তু বলতে গিয়েও থমকালো। মা'র বাঁ হাতের তালুর মধ্যে একটা অদ্ভুত সুন্দর রঙহীন মাটির মূর্তি।

মা'র নাকের পাটা লাল, ঠোঁটের কোণে লজ্জা, চোখের দৃষ্টি উদাস আনমনা। ছেলেমানুষের মতো কী যেন লুকোতে চাইছে অথচ জানাবার ইচ্ছা চোখে-মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। শেষে আর পারলনা। 'এই দ্যাখ খুকু আজ দুপুরে এটা বানালাম! কত্তদিন পর। সেই নতুন বিয়ের পর একটা করেছিলাম।' কথা কটা বলেই কী ভেবে মা'র চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

পল্লবী অবাক চোখে তাকাল। 'তুমি বানিয়েছ?'

সুতপা ঘাড়.কাত করল। আবার মুখের রেখা সহজ-সরল। এত বড় একটা গুণ আছে তা ও কোনোদিন জানতই না। তাছাড়া আজ মাকে সুরেলা গলায় গান গাইতেও ও শুনেছে।

পল্লবী কখন যেন মাছ ভেঙে ভাত দিয়ে খেতে শুরু করেছিল।

অল্প একটু ভাত শেষ করতে সুতপার সময় লাগেনি। খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। এঁটো হাত মুঠো করে উদাস হয়ে কী ভাবছিল হঠাৎ অনেক দূর থেকে উঠে আসার মত করে বলল,

'কোনদিন সমুদ্র দেখিনি। আমায় সমুদ্র দেখাবি খুকু, চল্‌না দু'জনে পুরী থেকে ঘুরে আসি।'

পল্লবী হাসবে কী কাঁদবে বুঝে পেল না। মা কী পাগল হয়ে গেছে! স্বামীহারা না শৃংখলমুক্ত এক মহিলা! মুক্তির আনন্দে ওরকম করছে। মুক্তির পর মানুষ না কি ওরকমই আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে ; নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে মা'র চেহারা আর আচরণের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

কিন্তু পিতৃহারা কন্যার শোক পল্লবীর বুকে, মা'র আনন্দোচ্ছল মূর্তিটা ওর দু'হাতে চট্‌কে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে হল। ওর বাবার জন্য ওর মা'র শোক নেই একথা ভেবে বুকে ক্রোধের তাণ্ডব বয়ে গেল একটা। বিবেকবুদ্ধি-শিক্ষাদীক্ষা-সভ্যতা-রুচি ভুলে প্রায় কুক্কুরীর মতো খেঁকিয়ে উঠল পল্লবী। 'পাগলামির একটা সীমা আছে। একটু চুপ করবে তুমি।'

সুতপা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালো তারপর কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'তুই ঠিক তোর বাবার মতোন হুবহু।'

বড় করে একটা শ্বাস চাপল সুতপা তারপর খুঁটে খুঁটে টেবিলের ওপর থেকে ভাতের কণা তুলতে লাগল। কপালের কাছের খুচরো চুলগুলোর জন্য সুতপার মুখটাকে ভয়ানক শোকাতুরা দেখাল যেন এইমাত্র কোন মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে সুতপা।

খানিক পরে কেমন অবশ ভঙ্গিতে সুতপা হেঁটে হেঁটে চলে গেল শোবার ঘরের দিকে।

প্রাজ্ঞের মতো মাকে চেয়ে চেয়ে দেখল পল্লবী। আঁচিয়ে ঘরে এসে মাকে খুঁজল। কোথায়! এঘর-ওঘর খুঁজে না পেয়ে ব্যালকনিতে উঁকি মারতেই দেখল রেলিংয়ে হাত রেখে কী যেন এক গভীর ভাবনায় ডুবে রয়েছে মা। ভাঙা চাঁদের আলো আর নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তিতে মাকে অন্য এক জগতের বাসিন্দা বলে বোধ হল পল্লবীর। এক সুপ্তিতে নিমগ্ন মৃতের জন্য শোক নয়, মৃতপ্রায় এক সত্তাকে জীবনবারি ছিটিয়ে সুতপা যেন পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে। সাধনার নিমগ্নতা থেকে মাকে জাগাতে ইচ্ছা করল না। অনুশোচনায় বুকের ভেতরটা গোলাচ্ছে। বহুদিনের একটি শৃংখলিত সত্তা মুক্তি নিতে চলেছিল তাকে পল্লবী আজ আবার ঠেলে দিল শেকলের দিকে।

ধীর পায়ে শোবার ঘরে চলে এল পল্লবী। খাটে বসতে বসতে ভাবল কোন মৃত্যু কোন জীবনের দ্বার খুলে দেয় বই কি। এক চরম উপলব্ধি আজ খুলে দিচ্ছে পল্লবীর সমস্ত বোধবুদ্ধির জানালা-দরজা। সব বিয়েই সুখের হয় না, বিয়ের আরেক নাম কী তবে বন্ধনই!

কার জন্য আজ শোক করতে বসবে পল্লবী! শত শত শৃংখলিত শিল্পীসত্তার জন্য। এক নির্বোধ ঘাতকের জন্য! না কি এক নিতান্ত অসহায় পিতার জন্য!

কার জন্য শোক করবে বুঝে না পেয়ে শুষ্ক চোখে শূন্য দৃষ্টিতে বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল পল্লবী।

অজাতক

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

ফিউন্যারাল হোমে সোমনাথকে দেখতে যাওয়ার জন্যে সুতপা আর রবিবারের বাংলা স্কুলে গেল না। দীপেনেরও হেলথ্‌ওগায় এক্সারসাইজ করতে যাওয়া হল না। সকালে নিউইয়র্ক থেকে আসা একটা ফোন্ ওদের সারাদিনের ছক পাল্‌টে দিয়ে গেল।

এদেশে আসার পর সাবওয়ে স্টেশনে সোমনাথের সঙ্গে দীপেনের প্রথম আলাপ। নিউইয়র্কে এক হোটেলে ওর সঙ্গে থেকেও ছিল ক'বছর। ক্রমশ দেখা সাক্ষাৎ কমে গিয়েছিল। ইদানীং আসা যাওয়াও হয়নি সেরকম। তবু সোমনাথের খবরটা শুনে সুতপা বলল— 'একবার যাওয়া উচিত। এক সময়ে তো ভালই চিনতে।'

সাংসারিক বা সামাজিক ব্যাপারে দীপেনের বিশেষ পরিকল্পনা থাকে না। সুতপার ক্যালেনড়ারে লেখা থাকে সারা মাসের ছুটির দিনগুলোর লৌকিকতা আর সামাজিকতার রুটিন। তার প্রত্যেকটাতে যেতে ইচ্ছে না করলেও মেনে নেয়। সুতপার ধারণা—বিদেশে এ সব বজায় না রাখলে অসময়ে পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকবে না। বন্ধুত্ব নয়, পরিচিতের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা। দীপেন ঠাট্টা করে বলে—ক্যালকুলেটিভ সোশ্যাল লাইফ।

কালো স্যুটের সঙ্গে ম্যাচিং টাই পরতে পরতে দীপেন ভাবছিল—অসুস্থ অবস্থায় সোমনাথকে একবারও দেখতে যাওয়া হল না। আজ শুধু নিয়ম রাখার জন্য স্যুট টাই পরে ফুলের তোড়া নিয়ে যাওয়া নিজের কাছেই কেমন লজ্জার মতো মনে হচ্ছে।

সুতপা যে কীভাবে সবকিছু বুঝে নেয়। সাদা শাড়ির আঁচল কাঁধে পাট করতে করতে বলল—'অসুখে দেখতে যাওয়া হয়নি বলেই আজ একবার যাওয়া উচিত। তবু অনিতার মনে থাকবে ওর দুঃখের দিনে আমরা পাশে ছিলাম। এরপরও একটু খোঁজ খবর করব। বিদেশে কার যে কখন এ অবস্থা হয়…।

আজকাল এ সব কথা প্রায়ই বলে সুতপা। ক্রমশ মনে একটা ভয় জন্মাচ্ছে। গত কয়েক বছরে চেনাশোনা কজনই তো মারা গেল। বিদেশে এক একটি মৃত্যু বড় বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে যায়।

ফিউন্যারাল হোমের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করতে করতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিরাট বাড়িটার মধ্যে এক একখানা ঘরে এক একটি দেহ সাজিয়ে রাখা আছে। ঢোকার মুখে লবিতে খাতায় নাম সই করতে গিয়ে দীপেন লক্ষ করল সুতপার হাত কাঁপছে। ওঁর পিঠে হাত রেখে হলওয়ে দিয়ে ভেতরে এগিয়ে গেল। ডানদিকের ঘরে কোনও আমেরিকান মহিলার ক্যাস্‌কেড রাখা। ঘর ভর্তি চেয়ারে লোকজন বসে আছে। শব্দহীন নিথর নিঃস্তব্ধ পরিবেশ।

সোমনাথের ক্যাস্‌কেডের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই দীপেনের মনে হল কত ছোট দেখাচ্ছে ওকে। কাঠের বাক্সে সিলকের বিছানায় ধুতি পাঞ্জাবি পরে শুয়ে আছে যেন একটি কিশোর। চুল সযত্নে আঁচড়ানো। পাউডার দেওয়া মুখে সামান্য চন্দনের ফোঁটা। ফিউন্যারাল হোমের লোকেরা ওর দেহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবার পর কোনও বাঙালি সাজানোর সময় সাহায্য করেছে। দুই হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখা। বন্ধ চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

সোমনাথ তাকিয়ে থাকলে হাসিতে চোখ ভরে থাকত।

সামনের সারির চেয়ারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনিতা বসে আছে। সুতপা ওর হাত ধরে নিঃশব্দে কাঁদছে। বাচ্চা মেয়ে দুটো অবাক হয়ে লোকজন দেখছে। সারা জীবনের জন্যে কী যে হারাল সে কথা বোঝারই বয়স হয়নি ওদের।

দরজার কাছে কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে দীপেন ঘুরে দাঁড়াল। সোমনাথের বাবাকে ধরে ধরে আনছে বিমান। ভদ্রলোক কালকের ফ্লাইটে এসেছেন। শোকে ক্লান্তিতে বিহ্বল অবস্থা। ক্যাস্‌কেডের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। দু'হাত দিয়ে ছেলের গালে মাথায় স্পর্শ করে ফিস ফিস করে কী যেন বলছেন। কান্না জড়ানো সেই অস্পষ্ট স্বর শুধু ভাঙা ভাঙা ভেসে আসছে—বাবু, আমি এসেছি···

দীপেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল না। বাড়িটার মৃত্যু শীতল পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে বৃদ্ধের চাপা কান্নার শব্দ। লবিতে বেরিয়ে এসে দেখল সুমন্ত্রদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দীপেনকে দেখে বললেন—'বুড়ো মানুষ! এখনও জেট্ ল্যাগ যায়নি। তার ওপর এরকম শক।'

অমিতাভদা বললেন—'এই এক ব্যাপার দেখেছিলাম ভাস্কর মারা যাওয়ার সময়েও। ছেলের অসুখের খবর পেয়ে মার দেশ থেকে আসতে আসতে সব শেষ হয়ে গেল।'

দীপেন ক্লান্ত ভাবে বলল—'আমরা কতদূরে থাকি সুমন্ত্রদা। কিছু হলে আত্মীয় স্বজন এসে পৌঁছতেই পারে না।'

সুমন্ত্রদা কেমন অদ্ভুত হেসে বললেন—'আমেরিকায় সব কি পাওয়া যায়। আমাদের অ্যামবিশনের জন্যে একটু দাম দিতে হবে না?'

ফেরার পথে গাড়িতে সুতপা চুপচাপ। সোমনাথের কফিন আজ রাতে ফিউন্যারাল হোমেই থাকবে। কাল ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক ফার্নেসে দেবে। অশোক হিন্দু পুরুত পট্টবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আরও অনেকেই যাবে নিশ্চয়ই। দীপেন আর যাবে না। বড় কষ্ট হয় ওখানে। এখনও পর্যন্ত কাছে থেকে কোনও মৃত্যু দেখা হয়নি। সুতপা বলে—'তুমি ভাগ্যবান লোক। তোমার আপনজন এখনও প্রায় সবাই বেঁচে আছে। আর আমরা ছোটবেলাতেই কত জনকে হারালাম।'

দীপেন শুনেছে সুতপার বাবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন। এক দাদা অল্প বয়সে ম্যানিনজাইটিসে গেছে। ওদের বাড়িতে অসময়ে আরও কেউ কেউ চলে গেছে। দীপেন, দেশে থাকতে কোনদিন শ্মশানে যায়নি শুনে ও আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—'এরকম কখনও শুনিনি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়, নয়তো পাড়ার কেউ মারা গেলেও শ্মশানে যাওনি কখনও?'

দীপেন বলেছিল—'দাদারা যেত। আমার অ্যাজমার জন্যে মা একটা মাদুলি পরিয়ে রেখেছিল। সেটা পরে নাকি শ্মশানে যাওয়া বারণ ছিল। কারুর মারা যাবার খবর এলে মা দাদাদের পাঠাতেন।'

সুতপা হেসে ফেলেছিল—'সত্যি! তোমরা ঘটিরা এত কুসংস্কার মানো কেন বলো তো?'

দীপেন একটু চটে গিয়েছিল। মাকে নিয়ে ঠাট্টা ওর পছন্দ নয়। বলেছিল—'এর মধ্যে আবার ঘটি-বাঙালের কি আছে? ছেলের একটা অসুখ থাকলে মার পক্ষে মাদুলি পরানোটাও হাসির ব্যাপার নাকি? আর দরকার না পড়লে হঠাৎ শ্মশানেই বা যাব কেন?'

সুতপা সামান্য হেসে বলেছিল—'কিন্তু দরকার তো একদিন হবে দীপেন। ধরো আমিই হঠাৎ মরে গেলাম। জায়গাটা চিনে রাখলে কষ্টটা একটু কম হত।'

আমেরিকায় এসে এই জায়গাটাও চেনা হল। আগে আগে এত মৃত্যু সংবাদ পেত না। প্রথমে ফিলাডেলফিয়াতে সৌমেন্দু যখন ক্যানসারে মারা গেল, কী অসম্ভব প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ওদের মধ্যে। বিদেশে এসে মরে গেল ছেলেটা। বাবা, মা, ভাই বোন কোথায় পড়ে রইল? দেশের মাটি ছেড়ে এক হাজার মাইল পাড়ি দিতে এসেছিল শুধু মরবার জন্য? তারপর একে একে অনিমেষদা 'গেলেন, বন্দনাদি গেলেন, ডাঃ মিত্র, দীপ্তেন্দুদা, এষা, কত লোকের জন্যে ফিউন্যারাল হোমে আসতে হল দীপেনকে। তবু ক্রিমেটোরিয়ামে ওর যেতে ইচ্ছে করে না।

গাড়ি চালাতে চালাতে দীপেনের একটু খিদে তেষ্টা পাচ্ছিল। কোন সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক খেয়াল ছিল না। এখন মনে হচ্ছে অন্তত একটু কফি খেলেও হত। কুইনসে সাউথ ইন্ডিয়ান দোকানে কিছু খেয়ে নিলে হয়। সুতপা দোসা ভালবাসে। কিন্তু এখন ওকে জিজ্ঞাসা করতেও খারাপ লাগছে। কতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। অন্যমনস্কের মতো রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু ওরও তো খিদে পাওয়ার কথা। প্রায় পেটে ব্যথা পেটে ব্যথা বলে। বোধহয় গ্যাসট্রিকের ব্যথার সূত্রপাত। রোগা থাকার জন্য খালি ডায়েট করার চেষ্টা। হয়তো ঐ জন্যেই পেটে ব্যথা হচ্ছে।

—'তোমার খিদে পায়নি? বেশ টায়ার্ড দেখাচ্ছে কিন্তু। কোথাও একটু থামব?'

সুতপা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। রুমাল দিয়ে মুখখানা ভাল করে মুছে নিয়ে বলল—'তুমিও তো কিছু খাওনি সারাদিন। অত সকালে ইচ্ছেও করছিল না। থামতে পারো একটা কফি শপে। যা হোক কিছু খেয়ে নিই।'

—দোসা খাবে? কফিও পেয়ে যাবে একই সঙ্গে। এখন আর স্যান্ডউইচ টুইচ্ ইচ্ছে করছে না।'

সুতপা রাজি হয়ে গেল। ম্যাড্রাস্ প্যালেসের সামনে বেশ ভিড়। কুইনসে গাড়ি পার্ক করা এক ঝকমারি ব্যাপার। জায়গাটা ভারতীয় শাড়ি, গয়না আর মশলার দোকানে ছয়লাপ। সঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ইলেকট্রনিক গুডস-এর দোকান আর ট্র্যাভেল এজেন্সি। পার্কিং পাওয়ার জন্যে পাক খেয়ে আসছে অজস্র গাড়ি। বহুকষ্টে পার্কিং করে ওরা ভেতরে গেল। রবিবার সকালে দলে দলে মাদ্রাজিরা বসে দোসা, ইডলি খাচ্ছে। ওরা মশলা দোসার অর্ডার দিয়ে কফি নিয়ে বসল একটা কোণের টেবিলে।

—'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছো? সাউথ ইন্ডিয়ান মহিলারা কিন্তু আমেরিকায় এসে একদম পালটায় না। সাজগোজ, হাবভাব একেবারে লেকমার্কেটের মাদ্রাজিদের মতো।'

দীপেনের কথায় সুতপা হাসল—'কেন বলো তো? অথচ আমরা বাঙালি মেয়েরা বছর না ঘুরতেই মেমসাহেব হয়ে যাই। ভাবতেই পারি না চুলে তেল মাখছি, সিঁদুর পরছি, অকারণে দামি দামি শাড়ি পরে দোকানে বাজারে ঘুরছি।'

—'শুধু তোমাদের ইংরেজিটা পাল্টায় না।'

দীপেনের ঠাট্টায় প্রতিবাদের ভান সুতপার গলায়—'যাঃ ছন্দাদি সম্যানে গাজরকে খ্যারট্ বলতে লাগল তোমার মনে নেই?'

—'আসলে বাঙালির অ্যাডাপ্টিবিলিটি খুব বেশি। তার জন্যে বিদেশে আসারও দরকার নেই। আমরা ছাত্র জীবনে প্রেমা ভিলাতে দোসা খেতে খেতে প্রেম করলাম। কলকাতায় কে আমাদের দোসা খেতে শেখাল? আবার এখানেও ম্যাড্রাস প্যালেসে ঢুকেছি। অথচ এদের কখনও 'রয়েল বেঙ্গল রেস্টুরেন্ট'-এ দেখবে না কিন্তু। বাঙালি হচ্ছে সর্বভূক, আগুনের মতো।

এইসব হাসি গল্পের মধ্যে দিয়ে লাঞ্চ সারতে সারতেও দীপেন বুঝতে পারছিল শুধু কথার জন্যেই কথা বলা। মন ভারী হয়ে আছে অন্য চিন্তায়। গাড়িতে উঠে অনুপ জলোটার ক্যাসেট বাজাতে গিয়েছিল। সুতপা মাথা নেড়ে বারণ করল।

অনেকখানি পথ প্রায় নিঃশব্দে কেটে গেল। দীপেন ভাবছিল সোমনাথের বৈষয়িক ভাবনা। অনিতা কী কী বেনিফিট পাবে ওর অফিস থেকে, ইনসিওরেন্স, বাচ্চা দুটোর ভবিষ্যৎ, এমনি নানা ভাবনা।

হাডসন্ নদীর ওপর জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ দিয়ে যাবার সময় দূরে নদীর দিকে চেয়ে সুতপা বলল—'আমাদের সব রিচুয়্যালস্ বিদেশে মানার কোনও মানে হয় না। ঐ বাচ্চা মেয়েটা কাল ধূপকাঠি জ্বেলে মুখাগ্নি করবে?'

দীপেন ভাবছিল রিচুয়্যালস-এর আর দেশ-বিদেশ কী? ধূপকাঠি আর পাটকাঠিতেই বা কী এসে যায়? শিশুর স্মৃতিতে এই নিষ্ঠুর ঘটনাটা দীর্ঘদিন দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে ফিরে আসে না কি?

পরদিন সকালে অফিস যাবার সময় দীপেন দেখল সুতপা আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। কাল থেকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব ঘটনা ওকে বড় বেশি নাড়া দিয়ে যায়। কাল রাতে শুয়ে বলেছিল—'আমি শুধু অনিতার কথাই ভাবছি। ভেবে দ্যাখো, আমাদের দুজনের মধ্যে একজন নেই। কী অসম্ভব একাকীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা…'

অনেক রাত অবধি দুজনের ঘুম আসেনি। সোমনাথের মৃত্যুকে ঘিরে এই জীবনের নশ্বরতা, তারই মাঝে মানুষের সংকীর্ণতা, ঈর্ষা, অহংকারের কথা—ওদের সাময়িক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এরপর কয়েক সপ্তাহ দীপেন কাজে কাজে খুব ব্যস্ত থাকল। পরের মাসে প্রথমে হিউস্টন্ গেল এক সপ্তাহের জন্য। ফিরে এসে দেখল সুতপা মাঝে মাঝেই অফিসে যাচ্ছে না। কাছাকাছি একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে। এমনিতে যথেষ্ট সিরিয়াস ওর কাজকর্মের ব্যাপারে। কিন্তু ইদানীং টুকটাক ছুটি নিচ্ছে। পেটে একটা ঘিনঘিনে ব্যথা। পেনকিলার খেলে কমছে। আবার একটু একটু শুরু হচ্ছে। অথচ ডাক্তারের কাছে যাবার সময় নেই। শেষে দীপেন রেগেই গেল একটু। একদিন অফিস থেকে ফিরে বলল—'রোজ রোজ পেটব্যথা বলছ, তোমার ও বি গাইনির ডাক্তারের কাছে যাওনা একবার। চেক্ আপ্ করিয়ে নাও।'

—'এই তো ক মাস আগে প্যাপ টেস্ট আর চেকআপ্ করালাম। মনে হয় না ওসব কিছু প্রবলেম হচ্ছে—'

'তাহলে ডাঃ রায়ানের কাছে যাও। হয়তো পেটের ট্রাবল হচ্ছে। দরকার হলে কিছু টেস্ট করিয়ে নাও। সব সময় পেটে ব্যথা হবে কেন?'

আবার কিছুদিন ধামাচাপা থাকল ব্যাপারটা। সুতপা ব্যথার কথা বলে না। হঠাৎ বিছানায় পেটে হিটিং প্যাড চেপে শুয়ে আছে দেখে ধরল দীপেন। দু-চারদিনের মধ্যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডাঃ রায়ান সুতপার পেটের বাঁদিকে যন্ত্রণা হয় শুনে জায়গাটা পরীক্ষা করলেন। বললেন—'কোলাইটিসের মতো মনে হচ্ছে। স্পাইসি রান্না, গ্রিজি ফুড ছাড়তে হবে আপাতত। একটা মিল চার্ট করে দিচ্ছি। সঙ্গে ওষুধ খাও। বেশি টেনশন, অনিয়ম কোর না। ব্যথার জন্য পেনকিলার লিখে দিচ্ছি।' একগাদা ওষুধের শ্যাম্পল্ আর প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল।

কদিন ভালই ছিল সুতপা। বাড়িতে ঝাল মসলা ছাড়া রান্না খাচ্ছে দুজনেই। পেটের ব্যথা একেবারে কমেনি। তবে শুরু হলেই পেনকিলার খেয়ে নেয়।

শনিবার বিকেলে গৌতমের মেয়ের অন্নপ্রাশন। যাবে না যাবে না ভেবেও শেষমুহূর্তে যাবার তাল তুলল সুতপা। দীপেনের একদম ইচ্ছে নেই। একটা উইক এন্ডে সন্ধ্যেবেলা ফাঁকা যেতে দেবে না এই মেয়ে। পেট নিয়ে ভুগছে। তবু পার্টিতে যাওয়া চাই। গিফট্ কিনে শাড়ি গহনা পরে একেবারে তৈরি। অথচ গিয়ে যে কী খাবে সুতপা। সেই ভেবে দীপেনের রাগ হচ্ছে—।

'ঐ রিচ রান্না খেয়ে আবার পেট চেপে শুয়ে থেকো রাত্তিরে। এত হুজুগ কেন করো? একটা শনিবার সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে বাড়িতে কাটানো যায় না? এই অবস্থা আমাদের?'

সুতপা হেসে ফেলল—'তোমার সঙ্গে তো সব সময় আছি। চলো না, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না এখন। বাড়ি থেকে দুধ সিরিয়াল খেয়ে যাচ্ছি। পার্টিতে বাচ্চাদের যে আলাদা স্টু থাকবে তাই খেয়ে নেব।'

পার্টিতে ঝেঁটিয়ে লোকজন বলেছে গৌতমরা। হল ভাড়া করে কেটারিং-এ খাবারের অর্ডার দিয়ে বেশ ঘটা করে অন্নপ্রাশন দিচ্ছে। আগে আগে তো ইন্ডিয়ান কেটারিং-এ এরকম ব্যবস্থাই ছিল না। কোথায়ই বা এত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট তখন? আর সদ্য সদ্য আমেরিকায় এসে বাঙালিরা এত খরচ করতেও পারত না। এক একটা জন্মদিন, মুখেভাত, বিয়ের রিসেপশন হত আর মেয়েরা অনেকে মিলে দুশো তিনশো জনের রান্না নামিয়ে দিত। বারোয়ারি পুজোর রান্না করে করে এক্সপার্ট সব। গীতা বৌদির তো এমন খাতির বেড়েছিল যে সাহায্য চাইলে বলতেন—'পাঁচশোর কম চমচম দরকার হলে আর কাউকে বলো আমি আবার অত কম বানাতে পারি না। মাপের গণ্ডগোল হয়ে যায়।'

কিন্তু এখন ভাল ভাল ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় অর্ডার দেওয়াই রেওয়াজ হয়েছে। মেয়েরাও রেঁধে রেঁধে ক্লান্ত। আর রাঁধতে চায় না। গৌতমরা চাঁদ প্যালেসে অর্ডার দিয়েছে।

অ্যাপেটাইজারের সিঙ্গাড়া আর শিককাবাব-এর প্লেট নিতে গিয়ে দীপেন দেখল সুতপা কিছুই নিল না। গৌতমের বউ কেয়া এসে সুতপাকে একটা প্লেট ধরাবার চেষ্টা করছিল। সুতপা কাকে যেন সেটাই ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

হলের মধ্যে লম্বা লম্বা টেবিল জুড়ে বিরাট আড্ডা জমেছে। ক্যাসেটে লাগাতর বিস্‌মিল্লার সঙ্গে ভি জি যোগ। রেকর্ডটা খুব হাতবদল হয় এখানে। সারা হলঘর সাদা স্ট্রিমার দিয়ে সাজানো। দরজার সামনে লেখা—'শুভ অন্নপ্রাশন'। গৌতমের ছেলেটা সমানে কেঁদে যাচ্ছে। অসম্ভব সেজেগুজে ক্ষেপে গেছে বোধহয়। থেকে থেকেই ছোট্ট টোপরটা মাথা থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। কদিন আগে আসল মুখেভাত হয়ে গেছে। আজ পার্টির ভিডিও তোলার জন্য আবার বেচারিকে ধড়াচুড়ো পরিয়েছে।

অনেকক্ষণ সুতপার দেখা নেই। ডাইনিং হলে মেয়েদের মহলে ভিড়ে গেছে নিশ্চয়ই। হঠাৎ দীপেন দেখল ইন্দিরা বেশ ব্যস্ত হয়ে ওকে কী যেন বলতে আসছে। দীপেন এগিয়ে যেতেই ইন্দিরা বলল—'সুতপার শরীরটা ভাল লাগছে না বলছে। আপনি লেডিজ রুমের ওদিকে যান। আমি ডাঃ সেনগুপ্তকে ডেকে আনছি।'

দীপেন তাড়াতাড়ি লেডিজ রুমের কাছাকাছি লবিতে পৌঁছে দেখল সুতপাকে মেয়েরা সোফায় শুইয়ে রেখেছে। মুখখানা যন্ত্রণায় বিবর্ণ। পা দুটো সোজা রাখতে পারছে না। ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল—'আমায় বাড়ি নিয়ে চলো বড্ড ব্যথা করছে। আর পারছি না।'

অবস্থা দেখে দীপেন বেশ ভয় পেয়ে গেল। এত যন্ত্রণা তো কোনদিন হয়নি। ততক্ষণে ডাঃ সেনগুপ্ত এসে গেছেন। সেনগুপ্ত কার্ডিওলজিস্ট। খানিকক্ষণ দেখে বললেন, 'অ্যাম্বুলেন্স কল্ করো! এক্ষুণি হাসপাতালে নেওয়া দরকার। পালস্ রেট ভাল নয়। তার ওপর এরকম অ্যাকিউট, অ্যাবডমিন্যাল পেইন। সময় নষ্ট করা যাবে না।' কিন্তু কিসের ব্যথা কিছুই বললেন না।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। সুতপাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে ভেতরে তোলার পর দীপেন পাশে বসে দেখতে পেল ওদের গাড়িটা নিয়ে সঙ্গে আসবে বলে ইন্দ্র চাবি চাইছে। নাহলে গাড়িটা এখানেই পড়ে থাকত। দীপেনের মনেও পড়েনি গাড়ির কথা। ইন্দ্রকে চাবি দিয়ে দিল। ঝড়ের গতিতে সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালের দিকে ছুটে চলল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এমার্জেন্সিতে বসে আছেন সর্বাণীদি, ইন্দ্র, ডাঃ সেনগুপ্তর সঙ্গে আরও কজন। গৌতমের পার্টি ফেলে শুভেন ইন্দিরাও চলে এসেছে। খুব টেনশানে আছে ওরা। কী হল সুতপার? এমন যন্ত্রণা যে এখনও কিছু ধরাই যাচ্ছে না?

দীপেন বলছিল—'ব্যথাটা কিছুদিন ধরে শুরু হয়েছিল। ওষুধপত্র খেয়ে একটু কমেও এসেছিল। কিন্তু এত পেন কোনদিন হতে দেখিনি।'

সর্বাণীদি ভুরু কুঁচকে বললেন—'কোলাইটিসে এরকম যন্ত্রণা হয় নাকি? এখন তো সারা পেট জুড়েই ব্যথা বলছে। গল্ ব্লাডার নয় তো?'

ডাঃ সেনগুপ্ত চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন—'ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা আলট্রা সাউন্ড করছে। দেখি, একবার খবর নিয়ে আসি।'

দীপেনের অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত কী ধরা পড়বে কে জানে? গল ব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স যাই-ই হোক, হয়তো এখনই সার্জারি করতে হবে। তবু তো চেনা রোগ। অন্য কিছু হল না তো? সেই অচেনা রোগের কথা ভাবলেই ভয় হয়।

কখন নিঃশব্দে বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে। রাত প্রায় এগারোটা। লবিতে রেডিওর খবরে বলছে বরফের ঝড় আসছে। এ অঞ্চলে শেষ রাতে এক ফুটের বেশি বরফ জমে যাবে। বেশি রাতে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে বলে সাবধান করছে। হঠাৎ দীপেনের মনে হল এতগুলো মানুষ বরফের ঝড় মাথায় করে হাসপাতালে বসে থাকবে? বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়ে আছে, এভাবে সকলের অপেক্ষা করে থাকার কোনও মানে হয় না। ও সবাইকে বাড়ি পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই যাবে না। সর্বাণীদিও থাকতে চাইছেন।

ডাঃ সেনগুপ্ত ফিরে এসে বললেন—'এরা তো বলছে সিভিয়র পেলভিক ইনফেকশন। কিন্তু জ্বর নেই বলেই আশ্চর্য লাগছে। রাতের ডিউটির এই বাচ্চা বাচ্চা ইনটার্নদের ইনভেস্টিগেশনে সব সময় ডিপেন্ড করাও মুশকিল। তবে সুতপার গাইনির ডাক্তার এক্ষুণি আসছেন। চিন্তা কোরো না।'

দীপেনের কথায় যদি বা বাড়ি ফিরতে ইতস্তত করছিল ওরা, ডাঃ সেনগুপ্ত বলতে রাজি হল। হাসপাতালের স্টাফরাও বারবার ঘোষণা করছিল, আবহাওয়ার কথা ভেবে নেহাত নিকট আত্মীয় ছাড়া বাকিরা যেন পার্কিং লট থেকে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যায়। তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। দীপেনের খুব ইচ্ছে করছিল একবার সুতপাকে দেখে আসে। কিন্তু তখনও আলট্রা সাউন্ড চলছে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

একটু পরেই সুতপার ডাক্তার গ্রিন এলেন। বৃদ্ধ মানুষ, বরফের ঝড় মাথায় করেই প্রায় পৌঁছলেন। বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে অবিশ্রাম বরফ পড়ে যাচ্ছে। বড় বড় গাছের সাদা কংকাল যেন হাওয়ায় নেচে বেড়াচ্ছে।

দীপেন ডাঃ গ্রিনের সঙ্গে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ভেতরে গেল। সুতপা নিস্তেজ ভাবে শুয়ে আছে। ওকে দেখে ফিস ফিস করে বলল,—'খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও ব্যথা করে দিয়েছে। বাথরুমে গেলাম। ইউরিন বন্ধ হয়ে গেছে। বড্ড ব্যথা করছে গো।' দীপেনের এত মায়া হচ্ছিল। ওর কপালে হাত রেখে স্বস্তি দেবার মতো করে বলল—'এই তো ডাঃ গ্রিন এসে গেছেন। আর বেশি কষ্ট পাবে না।'

ডাঃ গ্রিন সব রিপোর্ট দেখলেন। সুতপার তলপেটে হাত দিতেই ও অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। গ্রিনের মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে আসছে। একটা সিরিঞ্জ নিয়ে এলেন। ডাঃ সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার কী মনে হচ্ছে সিভিয়র পেলভিক ইনফেকশন?'

ডাঃ গ্রিন মাথা নাড়লেন—'আমার তা মনে হয় না। একটা পরীক্ষা করছি। তারপর যেটা সন্দেহ করছি, সে সম্পর্কে শিওর হতে পারব।' সিরিঞ্জ নিয়ে সুতপার তলপেটের চাদর সরিয়ে দাঁড়ালেন।

একটু পরে সিরিঞ্জটা বের করে এনে তুলে ধরতেই দীপেন দেখল ভেতরে রক্ত ভর্তি হয়ে গেছে। গ্রিন বললেন—'এটাই সন্দেহ করছিলাম। লেফ্‌ট ফেলোপিয়ন টিউব রাপচারড হয়ে অ্যাবডমিন্যাল ক্যাভিটি রক্তে ভরে গেছে।'

ডাঃ সেনগুপ্ত দীপেনের দিকে তাকালেন—'কী হয়েছে বুঝেছো? এক্টপিক প্রেগন্যান্সি। ওর টিউব বার্স্ট করে গেছে অনেক আগেই।'

দীপেন বিভ্রান্তের মতো চেয়ে আছে। প্রেগন্যান্সি কই, সুতপা তো কিছু বুঝতে পারেনি! সুতপাও এই মুহূর্তে ব্যথার ঘোর ভেঙে জেগে উঠল—'টিউব্যাল প্রেগন্যান্সি? কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝিনি। প্রেগন্যান্সির কোনও সিমটমই হয়নি আমার।'

ডাঃ গ্রিন সুতপার হাত ধরে বললেন—'এটা তো নর্মাল প্রেগন্যান্সি নয়। এটা ফেলোপিয়ন টিউবের ভেতরে থেকে গেছে। ইউটেরাসে পৌঁছতে পারেনি। সেই জন্যেই তোমার টিউবে এত যন্ত্রণা হচ্ছিল। তুমি আগে আমার কাছে আসোনি কেন বলো তো?'

সুতপার গলা কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে—'আমি ভাবতেই পারিনি। ভুল করে কত কোলাইটিসের ওষুধ খেলাম। ডাঃ গ্রিন, আমার আবার তো একটা কনসেপশন নষ্ট হয়ে গেল।' সুতপার শরীরে এত যন্ত্রণা। তবু সহ্য করছিল কতক্ষণ। কিন্তু আর যেন সে ব্যথার কোনও অনুভব নেই। এ মুহূর্তে ওর কান্না উঠে আসছে অন্য এক গভীর অভাববোধ থেকে। শুধু দীপেন জানে তার উৎস। ডাঃ গ্রিনও জানেন। তবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'তোমার জীবন পড়ে আছে। ধৈর্য্য ধরো। কেঁদো না।'

দুই ডাক্তার সার্জারি আলোচনা করছেন। দীপেন শুনল একটু পরেই সুতপার পেটে অপারেশন হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঁদিকের ফেলোপিয়ন টিউব বাদ দিতে হবে। ইন্টারন্যাল ব্লিডিং-এ রুগি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হলে আর বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সুতপার শরীরে রক্ত এত কম যে রক্ত না দেওয়া পর্যন্ত অপারেশনও করা সম্ভব নয়। সব ব্যবস্থা করে সার্জারি শুরু হতে রাত তিনটে বাজবে।

সুতপার ইনট্রাভেনাস চলছে। রক্ত দেওয়াও শুরু হল। তারই মাঝে কথাবার্তা বলছে। অনবরত একই কথা—'লেফট টিউবটা কি কিছুতেই রাখা যাবে না? এখনও আমার কোন

বাচ্চা হল না, তুমি এরই মধ্যে একটা টিউব বাদ দিয়ে দেবে?'

ডাঃ সেনগুপ্ত ডাঃ গ্রিনের মতোই বোঝাচ্ছেন ওকে—'তোমাকে বাঁচাতে গেলে টিউব বাদ দিতেই হবে। ফিটাস শুদ্ধ ঐ টিউবটা একেবারে রাপচার্ড হয়ে গেছে। এত ভাবছ কেন? ডানদিকের টিউব তো থাকবে। কত মেয়ের এক্টপিক সার্জারির পর আবার ছেলেমেয়ে হয়েছে। মা হতে হলে আগে তো তোমাকে বাঁচতে হবে সুতপা।'

সুতপা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ছে। দীপেন এ সময় সুতপার অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। মাথার ভেতর একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। শুধু নিজের অবহেলায় কত সময় নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটা প্রায় মৃত্যুর দরজায় পৌছে গিয়েছে। স্বামী হিসেবে ওর নিজের তো উচিত ছিল সময় থাকতে ওকে গাইনোকলজিস্ট দেখানো। আসলে মাস কয়েক আগে পুরো চেক্-আপ করিয়ে সুতপাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল যে। মা হবার জন্য ইদানীং সুতপা যত অস্থির হয়ে উঠেছিল, দীপেনের সেরকম প্রতিক্রিয়া হয়নি। বিয়ের পর ছ/সাত বছর কেটে গেছে বলেই হতাশ হবার কিছু নেই। আজ এই মানসিক চাপের মধ্যে থেকে দীপেন আবারও অনুভব করল, শুধু সুতপার জন্য ওর যা কিছু উদ্বেগ। তারই নাম মায়া অথবা ভালবাসা নিশ্চয়, যা দিয়ে ওরা পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে।

ফর্মগুলোতে সই করে দীপেন এক সময় অপারেশন থিয়েটারের সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা পোশাক পরিয়ে সুতপাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। সামান্য আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে। ওপরের ঘরে ওকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছিল। ওটি'র সামনে দীপেনকে স্ট্রেচারের পাশে দেখে ম্লান হেসে বলল—'খুব স্লো পড়ছে না? তুমি হাসপাতালের বাইরে যেও না কিন্তু?' দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দীপেন মনে মনে বলছিল—নিজের জন্যে বাঁচো তপু। আমার জন্য বেঁচে থাকো।

কখন ওয়েটিং রুমে ভোর হয়ে গেল। জানালার বাইরে নিথর পৃথিবী বরফের আচ্ছাদনে ঘুমিয়ে আছে। যতদূর দেখা যায়, যেন ছোট ছোট বরফের টিলা। কোথাও কোনও রঙ নেই। পাখির ডাক শোনা যায় না। অস্পষ্ট ভোরের কুয়াশা জড়ানো এক অলৌকিক সকালে যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠল দীপেন। যন্ত্রণায় মাথা ভার হয়ে আছে। চোখে সামান্য জ্বালা। ঠিক ঘুম নয়, আবছা তন্দ্রার মতো নেমে এসেছিল কখন। মাঝে একবার উঠে গিয়ে জেনে এসেছিল অপারেশন হয়ে গেছে। সুতপা তখন অজ্ঞান অবস্থায় রিকভারি রুমে। ডাঃ সেনগুপ্ত বোধহয় বাড়ি ফিরে গেছেন। ইন্দ্রই ওঁর গাড়িটা চালাবে বলেছিল। ওয়েটিং রুমে নার্স এসে ডেকে নিয়ে গেল দীপেনকে। জ্ঞান ফেরার পর সুতপাকে নিজের বেডে নিয়ে যাচ্ছে। ওর কোনও সাড়া নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে যন্ত্রণায় কেঁপে উঠছে সারা শরীর। কখনও গোঙানীর মতো শোনা যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে দীপেন ওর বিছানার পাশে বসে থাকল কতক্ষণ। সুতপা একবার তাকিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করল। জল চাইছে মনে হল। নার্স ওর শুকনো ঠোঁটে বরফ বুলিয়ে দিল। দীপেনকে একটা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে। বাড়ি গিয়ে সুতপার ড্রেসিং গাউন, চটি, চিরুনি, টুথব্রাশ আরও কী কী জিনিস আনতে হবে। এমার্জেন্সি রুগি কাল অন্নপ্রাশন ফেরত বেনারসি পরে চলে এসেছিল। সে সব ব্যাগে ভরে নার্স দিয়ে গেল দীপেনকে।

ফেরার পথে করিডোরে দেখা হল ডাঃ গ্রিনের সঙ্গে। ওর দু'হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ভরসা দিলেন—'আর কোনও ভয় নেই। তবে সাময়িক একটু ডিপ্রেশন হতে পারে। চেষ্টা কোরো ওর মনটা ভাল রাখতে।'

হঠাৎ দীপেন প্রশ্ন করল—'তুমি কি টিউব রিমুভ করার সময় ফিটাস্ দেখেছিলে?'

—'অফ কোর্স দেখেছিলাম। প্রায় তিনমাসের প্রেগন্যান্সি ছিল। তিনমাস ধরে ফিটাস্ টিউবের মধ্যে গ্রো করেছিল। তারপর সবটাই রাপচার করে গেল···'

তিনমাস? দীপেনের মনে হল এ তবে নিরবয়ব কোনও সত্তা নয়। এদেশের অ্যান্টি অ্যাবরশন দলের মিছিলে গর্ভস্থ ভ্রূণের যে ছবি দেখায়, তিনমাস অবস্থায় তাকেও তো মানুষের মতো বলে চেনা যায়। এ তবে কেমন ছিল? হয়তো অস্বাভাবিক অবস্থায় কত যন্ত্রণা পেয়েছে। মানুষের জন্মরহস্য যে এত জটিল তার জানা ছিল না। যে সম্ভাবনা মায়ের গর্ভের আশ্রয় জানল না, পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকাল না, অনাগত সেই শিশুর জন্যে দীপেনের হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ শুরু হল।

—'ডাঃ গ্রিন সে ছেলে ছিল, না মেয়ে?'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন—'যে জন্মায়নি তার জন্যে দুঃখ কোরো না। হোপ ফর দ্য বেস্ট।'

হাসপাতালের পার্কিং লটে বরফে ঢাকা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীপেন। সামনের বড় গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। কানে বাজছে ডাঃ গ্রিনের শেষ কথা—'যে আসেনি, তার জন্যে আক্ষেপ কোরো না।'

গির্জার মাথায় কোন্ দেবশিশু উড়ে যায়। দীপেন ভাবে ঐ শিশু আমাকেই মুক্তি দিয়ে গেছে। আমি কখনও শ্মশানে যাইনি। ফিউন্যারাল হোমে গেলে বিষাদের গাঢ় ছায়া আমাকে ঘিরে ধরে। দ্বিতীয়বার যেতে ইচ্ছে হয় না। সুতপা বলেছিল—'শোক কি তুমি কখনও এড়াতে পারো? প্রিয়জনকে অন্তত একবার নিয়ে যেতে হবে না সেখানে?' অথচ সুতপা জানে না, জীবনের প্রথম শোকের বিষণ্ন সকালে দেহহীন আমারই আত্মজ আমাকে কঠিন শেষকৃত্যের দায় থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

শাড়ি-ই পরি

কঙ্কাবতী দত্ত

রুম্পা ভুল খবরটা না দিলে আজকের ঝামেলায় পড়তে হত না সোহিনীর। এই নিয়ে সপ্তম কি অষ্টমবার ঘড়ির দিকে তাকাল। সাপের মত এঁকেবেঁকে একটা বিশাল মিছিল এগিয়ে আসছে কলেজ স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের ক্রসিং দিয়ে। ট্রাম, বাস, মিনিবাস ট্রাফিক জ্যামে থেমে আছে। তবুও কী দারুণ ভিড় সেগুলোয়। পা রাখার জায়গা নেই। সোহিনী আঁচল দিয়ে একবার মুখ মুছল। ফর্সা মুখখানা ঘেমে উঠেছে। তার গায়ে একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ি, ব্লাউজটিও শাড়ির সঙ্গে বেমানান ও একটু মলিন। এই সাধারণ সাজের মধ্যে দিয়েও চেহারার ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ে যায়। তার মত চেহারার মেয়েদের এভাবে সচরাচর বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েরা একটু আগলেই রাখে এদের। সোহিনীদের ক্লাসে অনেক মেয়েই ছিল, যাদের বাড়ির লোক এমনই আতুপুতু করে তাদের বড় করে তুলেছে, কলকাতার রাস্তাও তারা ভাল চেনে না। সোহিনী কিন্তু বেশ ক'বছর ধরে ভিড় বাসে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করে, পাশ করার পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দেওয়া, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড করা, সবই করেছে একা, কারও সাহায্য ছাড়া। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোনোর পর ডব্লিউ বি সি এস ইত্যাদি কয়েকটি সরকারি পরীক্ষা দিয়েছে। কলেজের পাট চুকে যাওয়ায় এমনিতে এপাড়ায় আসার খুব একটা দরকার পড়ে না। তবু অতি চেনা, প্রিয় এই বইপাড়ার প্রতি কোথায় যেন টান রয়ে গেছে। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেছে। কোন সদ্য তরুণীর স্পর্শকাতর মনের ক্ষত থেকে চুঁইয়ে পড়া ব্যথার মত লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। প্রেসিডেন্সি কলেজের চওড়া কার্নিস থেকে অসংখ্য পায়রা ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। সোহিনী একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করবে কিনা ভাবছে, এই সময় দেখে দেবজিৎ সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জুতো পালিশ করাচ্ছে। একটি পা যদিও পালিশওয়ালার করতলে, চোখ দুটো সোহিনীর মতই ভ্রাম্যমাণ। দৃষ্টি দিয়ে কাউকে খুঁজছে বলে মনে হয়। ডান হাতের কব্জি উল্টে ঘড়িও দেখল। বাঁ হাতের আঙুল থেকে ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছে চাবির রিং, যা স্পষ্টতই গাড়ির চাবি বলে চেনা যায়। তারা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ত, দেবজিৎই ছিল তাদের একমাত্র সহপাঠী যে মারুতি চালিয়ে ক্লাস করতে আসত। অনেকে এ নিয়ে আওয়াজ টাওয়াজ দিলেও আসলে অধিকাংশের মধ্যেই এক ধরনের চমক কাজ করত এ ব্যাপারে। বিশেষত ক্যাম্পাসের এবং পাড়ার মেয়েদের ক্ষেত্রে। আর এর সুযোগ সে নিত না, তা নয়। একটি নয় একাধিক মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। কেউ পেন-ফ্রেন্ড, কারও সঙ্গে এস এফ আইয়ের মিছিলে যেত, কারও উৎসাহে কলেজ ম্যাগাজিনে লিখত, বা চাঁদা তুলত স্টুডেন্টস হেল্থ হোমের জন্য। রুম্পা যে দেবজিতের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তা খোলাখুলিই বলত সে। শুধু সোহিনীর সঙ্গেই দেবজিতের কোনদিন ঠিক জমেনি, মুখ চেনা হলেও পরিচয়ই তৈরি হয়নি তেমনভাবে। অথচ সোহিনীর সে প্রতিবেশী। সোহিনীদের পাড়ার পাশে যে জংলা জমিটা এখন নতুন নতুন আধুনিক ডিজাইনের বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশ ভরে যাচ্ছে, সম্প্রতি দেবজিতের বাবা তারই একটি প্রাসাদোপম বাসভবন কিনেছেন। কিছুদিন আগেও এই সব

অঞ্চলের এত কদর ছিল না উচ্চমধ্যবিত্তদের কাছে। সোহিনীর স্মৃতিতে ভাসে বালিকা বয়েসে দেখা কাশবন, বুনো ফুল আর বিষফলের ঝাড়, দিঘির মত মস্ত পুকুর বর্ষায় টৈটম্বুর। নকশাল আমলে এই সব জংলা ফাঁকা জমিতে কত খুন হয়েছে বলে শুনেছে। কিছু জমি দখলও হয়ে গিয়েছিল। সেই দিঘি বুজিয়ে সি এম ডি এ বিশাল হাউজিং স্কীম করেছে। আজ এরই পাশে দেবজিৎদের বাগানে ঘেরা বিলাসবহুল বাড়ি, নব্য বড়লোকের গাড়ি ও গ্যারেজের সারি। যাওয়া আসার পথে চোখাচোখি হলেও নিজেদের কাছেই অস্পষ্ট কোনও কারণে দুই প্রতিবেশী পরস্পরকে ঠিক চিনতে চায় না। শুধু সেই যে সন্ধ্যায় মমতা ব্যানার্জী হরতাল ঘোষণা করেছে বলে শোনা গেল, সেদিনও যানবাহনের ভীষণ খারাপ অবস্থা, একটা বাসের পেছনে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সোহিনীর বাঁ পা-টা মচকে গেল। পুঁটিরামের সামনে দেবজিতের গাড়িটা দেখতে পেয়ে হাত তুলে থামিয়েছিল সোহিনী। বলেছিল, 'তুমি তো আমাদের ওদিকেই থাকো, আমায় একটু নামিয়ে দেবে, পাড়ায়?'

দেবজিৎ তার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল পাশে বসে থাকা সুসজ্জিত রমণীর দিকে।

সোহিনী পায়ের যন্ত্রণায় সামান্য মুখ বিকৃতি করল। 'আমি কিছু পাচ্ছি না। কাল আমার ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষা। পায়ে ব্যথা। ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। আমাদের ওদিকেই যাচ্ছ তো?'

দেবজিৎ আবার তার পাশের সুন্দরী সঙ্গিনীটির দিকে একবার চোখ ফেরাল। বলল, 'নাহ্, ওদিকে তো যাচ্ছি না' তার অভিব্যক্তিতে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার কোন ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন মনে না করে দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল গাড়িতে স্পীড তুলে। বাস স্ট্যান্ড আর ওই জুতো পালিশওয়ালার বিন্দুর খুব সামান্যই দূরত্ব, একেবারে চোখে চোখ পড়ে গেল। সোহিনী খুব ধীরে চোখ সরিয়ে নিল। ছেলেবেলা থেকেই সে একটু গুটোনো। তার একটা ত্রুটি হলো, অর্ধপরিচিত বা যৎসামান্য পরিচিত লোককে দেখে অনেক সময় এমনকি চিনতেও দ্বিধা করে। এর খানিকটা যদিও লাজুক স্বভাবের জন্য, কিছুটা অন্যমনস্কতাবশতও বটে।

তবে বাধবাধ ভাবটা নিয়ে রুম্পা, সুলগ্না, জয়তীরা হাসত তো তাকে নিয়ে। 'তুই কী রে একটা ফালতু এক্সট্রা ক্লাস কাটতে এত হেজিটেট করিস। স্যার কাশলেও কি তুই টুকে রাখবি নাকি।' বলতে বলতে সকলের মিলিত কণ্ঠের সমস্বর হাসির শব্দে বাকি কথা ডুবে যেত। ওদিক থেকে মঞ্জিমা হয়ত বাকিদের উস্কে দেবার জন্য বলে উঠল : 'অফ পিরিয়ডে সিনেমা যাবার নামে কী ন্যাকামি, প্যানপ্যানানি। ভীরু হরিণী একেবারে।'

রুম্পা বলত : 'তোকে দেখে মনে হয় সেই কোন যুগে পড়ে আছিস'।

সুলগ্না ঠোঁট উল্টে মন্তব্য করত : 'এই জন্যই তো মেয়েদের এই অবস্থা। তোর মত মেয়েদের জন্য।'

জয়তী টেবিলের ওপর চড়ে বসে পা দোলাত : 'আমাদের দেখ তো। আমরা কত ডেয়ার ডেভিল। কোনও ছেলেও আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পারবে না।'

'কী আশ্চর্য, পাঞ্জা লড়ার দরকারটা কী' মৃদুভাবে বলত সোহিনী।

'দরকার থাকবে না কেন। এই যে পুরুষরা মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে এটা কি মেনে নিতে হবে নাকি? ধর আমার বিয়ে হলে আমার বর যদি আমাকে ডমিনেট করে?'

'ডমিনেট বলতে?'

'ডমিনেট বলতে, ওই বর বাবাজির তরফ থেকে নানান রকম অত্যাচার' রসিকতার

ভঙ্গিতে কথাটা বলতে বলতে জয়তী কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত দিয়ে একটা ভঙ্গিমা করল।

'আমি হয়ত অসহায়ভাবে একা রয়েছি, আমায় ঠিকমত দেখছে না, টাকা পয়সা দিচ্ছে না, মন দিচ্ছে না।'

সোহিনী চোখ দিয়ে একটু হাসল। 'তুই নিজেই তা-হলে জোগাড় করে নিবি, নিজের টাকাপয়সা।'

জয়তী মজা করে চোখ গোল গোল করল। 'আমি নিজেই নিজের টাকাপয়সা জোগাড় করে নেব? বাহ্ তা হলে বিয়ে করব কোন দুঃখে?'

সোহিনী ঠোঁট সরিয়ে হাসল। 'তুই চাকরি করায় বিশ্বাস করিস না বুঝি?'

'না তা ঠিক নয়। ইচ্ছে হলে করব। হয়ত কোনও স্কুলে-টুলে পড়ালাম। কলেজে কাজ পেলে তো কথাই নেই। কিন্তু বাধ্যবাধকতা কিছু থাকবে না।'

'বাধ্যবাধকতা থাকবে না?'

রুম্পা পেছন থেকে এসে জয়তীর কাঁধে হাত রাখল। 'আমার বাবা কী বলে জানিস? একেই দেশে চাকরি কম। তার ওপর মেয়েরাও চাকরি করতে শুরু করলে তো পুরুষদের সুযোগ আরও কমে যাবে।'

'আচ্ছা?' প্রশ্নের ছলে শব্দটা উচ্চারণ করে সোহিনী হাসল। 'তুইও অমনি সুবিধে মত কথাটার সঙ্গে একমত হয়ে পড়লি? জীবনে বোধহয় এই একটিবারই হলি, বাবার সঙ্গে একমত?'

'একমত না হওয়ার কী আছে?'

সোহিনী কৌতুকের ভঙ্গিতে ভুরু দুটো একটু বাঁকাল। 'আমি শুনেছিলাম তুই নাকি বাড়িতে ভীষণ আবদার করিস, সীন করিস। তোর মুড মেজাজকে মা বাপি নাকি রীতিমত ভয় পান?'

'কে বলল তোকে?'

'কেন? মাসিমা।' বলতে বলতে সোহিনী জানালার বাইরে তাকাল। 'আমি অনেক সময় কী ভাবি জানিস? সমাজ আসলে পুরুষের প্রতিই বেশি কঠিন। মেয়েরা কাঁদলে মানুষ সিম্প্যাথেটিক হয়, সমবেদনা জাগে, পুরুষের চোখের জল লজ্জার বলে মনে করা হয়। পুরুষেরও তো অপমান আছে, জীবনে পরাজয় আছে, যন্ত্রণা বা নৈরাশ্যের মুহূর্ত আছে, কিন্তু নিজের সমস্যা নিয়ে বিলাপ করাটা পুরুষোচিত মনে করে না সমাজ। নিজের কষ্টের কথা যেন তার বলা বারণ।' সোহিনীর এই মন্তব্যে জয়তী তার টিফিন বাক্সটা খুলে একটা সন্দেশ ভেঙে মুখে দিল। 'হু। তুই বেশি বুঝিস মনে হচ্ছে। কষ্ট আছে তোর কপালে।'

'হয়ত' বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সোহিনী। ক্যাম্পাস চত্বরের সবুজ ঘাসের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। একটা অন্যমনস্ক, বিধুর ভাব ভেসে উঠল তার দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'দ্যাখ, আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ। কলোনিতে থাকি। এখন অবশ্য আমাদের এলাকাটা বেশ সচ্ছল অঞ্চল হয়ে উঠেছে। জমির দাম খুব বাড়ছে। জমিটা আমার দাদুর দখলে ছিল, পরে পাকা বাড়িটা ভাল করে তুলেছেন আমার বাবা। বাবা খালি হাতে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। কাকাদের পিসীদের মানুষ করেছেন। পিসীদের বিয়ে দিয়েছেন। আমি একটা জিনিস ছেলেবেলা থেকে লক্ষ্য করতাম, বাড়ির সকলে বাবার কাছে প্রত্যাশাই করে, কিন্তু বাবার সমস্যার কথা শুনতে কেউ উৎসাহী নয়। এমনকি মা-ও ঠিক বুঝত না এইসব সমস্যা। হয়ত কখনও এমন হয়েছে, দারুণ অভাবের তাড়নায় বাবা ধার করতে বাধ্য

হয়েছেন সংসারেরই জন্য। কিন্তু যখন সেই পাওনাদার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, বাড়ির লোক চোখ চাওয়াচাওয়ি করেছে, ফিসফিস করে নিন্দাচ্ছলে আলোচনা করেছে নিজেদের মধ্যে, কেউই এটা ভাবছে না যে তাদেরই জন্য বাবা এই ঋণের বোঝা নিয়েছেন। সবই হয়েছে। পিসীরা বিয়ের সময় নিজেদের গয়নাও বেচেছে। বাবার যে টেনশন, স্নায়ুর ওপর চাপ তা কেউ কখনও লক্ষ্যও করেনি, তার কারণ সম্পর্কে প্রশ্নও করেনি।' বলতে বলতে সোহিনী থেমে গেল। একটা হইহই কোলাহল কানে এল তার। সেই সঙ্গে পায়ের শব্দ মিশ্রিত হাসির আওয়াজ। কী ব্যাপার দেখতে সে ঘাড় ঘোরাল। সুলগ্নার হাতে একটা চিঠি ধরা ছিল, সেটা শোনা যাচ্ছে পেছনে থেকে এসে হট করে ছিনিয়ে নিয়েছে রুম্পা। চিঠিটা নাকি প্রেমপত্র ছিল, সুলগ্না খিলখিল করে হাসছে আর বেঞ্চির চারিদিকে ছুটে রুম্পাকে খেলাচ্ছলে তাড়া করছে ফেরত পাবার আশায়।

সোহিনী দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কেউ তার কথাগুলো শুনছিল না এতক্ষণ। উৎসাহও নেই শোনার। কিন্তু তার জন্য তার মুখশ্রীতে নৈরাশ্যের কোন ছায়া পড়ল না। সে নিজেই নিজের বন্ধু, নিজের মধ্যে মশগুল হয়ে থাকতে পারে। প্রায়ই এমন হয়, হয়ত এত মগ্ন হয়ে কিছু ভাবছে, দেখেও দেখছে না। অনেকেই এটাকে রূপের অহংকার বলে ভুল করে। অনেক লোক আছে, যাদের লোক গম্ভীর বা অহংকারী মনে করে, আসলে তারা লাজুক। নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য ওই রাশভারিতার মুখোশ অবলম্বন করে। দেবজিৎকে দেখে ফেলার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ওকে চিনেও চেনেনি। কেন চেনেনি, সেটা তার নিজের কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। লজ্জা বা অপমানজনক কোন স্মৃতির কারণে নয়, সে জানে দেবজিৎদের আর্থিক অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভাল। হীনমন্যতা ঠিক নয়, উচ্চবিত্ত ইংরিজিয়ানায় দীক্ষিত এই শ্রেণীর সঙ্গে সে ঠিক সহজ বোধ করে না। এদের জগৎ আলাদা। সেই ঝলমলে পৃথিবী থেকে একটু দূরে থাকাই ভাল। সদ্য কেনা বইগুলো বুকের কাছে আঁকড়ে সোহিনী হাঁটতে শুরু করল। কেন যে রুম্পা বলল, ফ্রীডম্যানের বইটা কলেজ স্ট্রিট ছাড়া কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দোকানে গিয়ে জানল রুম্পার কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। যে-কোন দোকানেই পেত। এমনকি গড়িয়াহাটের দিকেও। সোহিনীরা ঢাকুরিয়ায় থাকে, সেখান থেকে এই এত দূর আসার কোনও মানেই হয় না ক্লাস না থাকলে।

ট্র্যাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহন খুব ধীরে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু ভীষণ ভিড়। ঠিক অফিস ছুটির সময় তো। একটু এগিয়ে সোহিনী একবার দাঁড়িয়ে পড়ে একটু যেন অসহায় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে থাকল। পুরো পথ তো আর হেঁটে যাওয়া যাবে না। আবার বাসেও ওঠা যাচ্ছে না। এর চেয়ে কিছুক্ষণ কফি হাউসে বসে একটু দম নিয়ে নিলে কেমন হ'ত? জলতেষ্টা পেয়েছে। অনেকটা সময় ধরেই এই তৃষ্ণা সে উপেক্ষা করার চেষ্টা করছিল, আর সহ্য করা যাচ্ছে না জলতেষ্টা, ঘাম আর গরম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এই বেদনা সোহিনীর সারা শরীরে যেন তিলকের মত লেগে আছে। ব্লাউজের সেলাইয়ে, শাড়ির কুঁচিতে, আঁচলের ভাঁজে। কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সোহিনী আঁচল দিয়ে চিবুক মুছল। একা সে সাধারণত আসে না এখানে। সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে অন্যদিন। কোন না কোন বান্ধবী। সুতরাং ঢোকার মুখে দরজা থেকে যখন রুম্পাকে একটা টেবিলে পেয়ে গেল, স্বস্তির নিঃশ্বাসই পড়ল। অন্য টেবিলগুলোর পাশ কাটিয়ে সে রুম্পার দিকে এগিয়ে এল। যদিও তারা ফার্স্ট ইয়ার থেকে একসঙ্গে পড়ছে, বন্ধুত্বের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের পিঠ চাপড়ানোর ভাবও রুম্পার মধ্যে কাজ করে তার প্রতি। রুম্পার বাবা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির

এক্সিকিউটিভ। কলকাতার সব কটা বড় বড় ক্লাবের মেম্বার। সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এ আড়াই হাজার স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাটে তারা থাকে। রুম্পার সাজপোশাক, চেহারা, ইংরিজি বলার কায়দাই আলাদা। তবু চেহারার নিখুঁত পরিচর্যা সত্ত্বেও তাকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না। কাজল, আইলাইনার, মাস্কারা পরা চোখ দুটো আকৃতিতে খানিকটা ছোট। নাকটা যেন একটু বেশি চোখা। গায়ের রং ফর্সা হওয়া সত্ত্বেও মুখে ব্রণর দাগ থাকায় ত্বক তত মসৃণ নয় রূপের মাপকাঠি যা দাবি করে। রান্নায় নুন বেশি বা কম পড়লে যেমন স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, মুখশ্রীর খুঁটিনাটিতে সামঞ্জস্যের অভাবেও সৌন্দর্য পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয় না। সোহিনীর বাহুল্যহীন স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কারণেই কিনা বোঝা মুশকিল, তার প্রতি এক ধরনের চাপা ঈর্ষার ভাব রুম্পার মধ্যে কাজ করে। আবার দিন কয়েক তাকে না-দেখেও থাকতে পারে না। সিনেমার টিকিট কাটলে যেমন সোহিনীর জন্যও তার একটা কাটা চাই, তেমনি কলেজের নোট টুকিয়ে নেবার জন্যও তাকেই দরকার হ'ত। অন্য কেউ এত হাসিমুখে পাতার পর পাতা নোট তৈরি করে দিত না, তাদের ফেলে আসা ছাত্র জীবনে।

'সবুজ ওড়নাটা এই সালোয়ার কামিজটার সঙ্গে মানায়নি, না রে?' তাকে দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করল রুম্পা।

সোহিনী একটা চেয়ার টেনে বসল। 'আমি বোধহয় এর উত্তর দেওয়ার সঠিক লোক নই।'

'কেন?' রুম্পার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্তকাল লাগল সোহিনীর, যেহেতু সে ব্যাপৃত ছিল এক নিঃশ্বাসে, এক গেলাশ জল নিঃশেষিত করতে। গেলাশটা ঠক করে টেবিলের ওপর রাখল। 'আমি তো শাড়িই পরি।'

'শাড়ি পরিস তো কী হয়েছে? মুখেও কি কুলুপ এঁটেছিস নাকি?'

'নারে, যারা সালোয়ার কামিজ কেনে বা পরে তারাই ভাল বলতে পারবে। যেমন ধর মঞ্জিমা, ও তো মেয়েদের পত্রিকায় মডেলিং করেছে।'

'মডেলিং করেছে তাতে কী হয়েছে।' বলে রুম্পা চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে হাসল। 'আমি দেখাচ্ছি মজা তোকে। একদিন আমার একটা জীনসের প্যান্ট আর একটা টী-শার্ট পরিয়ে তোকে ট্রিংকাতে নাচাব। সঙ্গে ম্যাচিং গোলাপী জুতো।'

'ভাগ্'।

রুম্পা বলল, 'ভাগ বলছিস কেন? আজকাল মেয়েরা স্মোক করছে, ড্রিংক করছে, গাড়ি চালিয়ে কত জায়গায় যাচ্ছে। এটা হচ্ছে নারী স্বাধীনতার যুগ। তুই যদি যুগের সঙ্গে তাল রাখতে না পারিস, তোকেই ঠক্‌তে হবে।'

'হয়ত' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটা দিয়ে সোহিনী চোখ দিয়ে বেয়ারাকে খুঁজতে লাগল। গোটা বারো টাকা রয়েছে তার কাছে। দু কাপ কফি তো হবেই, হয়ত এক প্লেট স্যান্ডুইচও তার মধ্যে হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, রুম্পার ব্যাগে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি। সে হাতখরচই পায় কত টাকা। আর সোহিনীর ঝুলিতে তেমন কিছু থাকে না বলেই তার আত্মসম্মানের পক্ষে জরুরি হয়ে ওঠে অন্যের টাকায় না খেয়ে নিজেই বিলটা দেওয়া। হাতের ইশারায় বেয়ারাকে ডাকল। ট্রে হাতে বেয়ারা ছোটাছুটি করছে। একটা টেবিলও খালি নেই। সমবেত কণ্ঠস্বরের গুঞ্জনে আবহাওয়া ভারি হয়ে আছে।

কফি আসায় রুম্পা দেড় চামচ চিনি নিয়ে চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে লাগল। 'তোকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে রে সোহিনী।'

'কোথায়?'

রুম্পা গলা নামিয়ে বলল, 'দ্যাখ, তোকে আমি যত বিশ্বাস করি, সকলকে তো তা করি না।'

'কেন, কী হয়েছে?'

হাতের আংটি ঘোরাতে ঘোরাতে রুম্পা তার চোখে চোখ রাখল। 'আমি আজ দেবজিৎদের সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি। কোথায় বল তো? ডায়মন্ডহারবার।'

'ডায়মন্ডহারবার? সে তো অনেক দূর। আজ রাতে ফিরতে পারবি?'

'না পারলেও আমার কিছু করার নেই রে।'

'কেন?'

একটু চুপ করে থেকে রুম্পা বলল, 'দেবজিৎ যখন নিজে আমায় বলে, চলো গুড ফ্রাইডের ছুটিতে বাইরে কোথাও একটু ঘুরে আসি, কিম্বা এই রবিবার বন্ধুরা মিলে ডায়মন্ডহারবার যাচ্ছি। তোমার মত গানের গলা কারও নেই আমাদের মধ্যে। তুমি যাবে? তখন আমি কীরকম যেন হয়ে যাই। রওনা হবার আগেই আমার শরীর মন ওদের সঙ্গে চলতে থাকে কলকাতার বাইরে। বাড়িতে হয়ত মিথ্যে কথা বলি, বান্ধবীদের সঙ্গে সুলগ্নাদের মামাবাড়ি যাচ্ছি বা এক্সকারশনে যাচ্ছি প্রোফেসররাও সঙ্গে যাবেন।'

'ও' বলে সোহিনী ঘাবড়ে যাওয়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। দেবজিতের মত ছেলেরা কী করে তাদের প্রমোদ বা বিনোদনের জন্য এত সহজে ব্যবহার করতে পারে রুম্পার মত সপ্রতিভ মেয়েদের? কিছু কিছু শর্ত, প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই এই মিলনে জড়িয়ে থাকে। একটা প্রবন্ধে পড়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি একবার একটা গবেষণা হয়েছিল নারী ও পুরুষের মিলনের ইতিহাস নিয়ে। তাতে দেখা গেছে, ষাটের শেষে ও সত্তর দশক জুড়ে মুক্তপ্রেমের হাওয়া বয়েছিল । স্নেহ, শ্রদ্ধা, অধিকারবোধ ছাড়াই যৌনমিলন কেন সম্ভব হবে না, বাধাটা কেন, সমস্ত সংস্কারকে অযৌক্তিক বলে নস্যাৎ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সত্তরের অনেক বুদ্ধিজীবী। অথচ আজ এই একই ব্যক্তিরা বলছেন সত্তরের দশকের সেই অধিকারবোধহীন মুক্ত যৌনতার চেষ্টা সফল হয়নি, পরীক্ষা হিসেবে। 'আমার কিন্তু ওই দেবজিৎ ছেলেটিকে উদ্ধত মনে হয়। জীবনের কোনও মুহূর্তেই বিনীত হতে শেখেনি। নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে। তুই বুঝিস না, মেয়েদের প্রতি ওর কী তাচ্ছিল্য?' বলে সোহিনী রুম্পার দিকে তাকাল।

'ওসব ছাড় তুই যাবি তো আমাদের সঙ্গে?' সোহিনী কফির পেয়ালা হাতে অবাক হয়ে তাকাল। 'আমি? আমি কী করে যাব? আমার বাড়ির লোক রাজি হবে না।'

রুম্পা বিদ্রূপের হাসি হাসল। 'তুই খুব ভয় পাস বুঝি, বাড়ির লোককে?'

'তা একটু আধটু তো পাই-ই। পাব না কেন?'

রুম্পা কফিতে চুমুক দিল। 'তুই দেখছি ভীষণ ভীতু। ভীতুর ডিম। গতানুগতিক। এতটুকু সাহস নেই। এইজন্য মেয়েরা পিছিয়ে আছে কিন্তু। তুই যদি বলতিস তোর যেতে ইচ্ছে করছে না, তাই যাবি না আমি মেনে নিতাম। বাড়ির লোক রাজি হবে না, এটা কোনও যুক্তি না। অন্তত হওয়া উচিত না।'

'নয় বুঝি?' বলে সোহিনী রসিকতার ভঙ্গিতে হাসে।

রুম্পা যেন দ্বিগুণ খেপে গেল। বলল, 'উফ্! কী করলে বলত মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হবে!'

'পরিবর্তন মানে? কীরকম পরিবর্তন?' সোহিনীর এই প্রশ্নের উত্তরে রুম্পা বলল, 'পরিবর্তন মানে মেয়েদের তো কোনও মতামত বা গুরুত্বই নেই তেমন।'

সোহিনী সেই একই রকম মজা করার ভঙ্গিতে বলল, 'ও তুই জানতে চাইছিস কি করলে গুরুত্ব তৈরি হবে' বলে হেসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে যাবে, এমন সময় দেবজিৎকে দেখতে পেল কফি হাউসের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতে। একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে। গল্পে মশগুল বলে মনে হচ্ছে। দেবজিৎ হাত ঘুরিয়ে কী বোঝাচ্ছে মেয়েটিকে। কাউকে খুঁজছে বা কারও সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছে বলে মনে হচ্ছে না ওদের দেখে। যেহেতু রুম্পা দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল, দৃশ্যটা তার ঠিক চোখে পড়েনি। সোহিনী মুহূর্তে ঠিক করল রুম্পাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে কফি হাউস থেকে বের করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তার পক্ষে। বন্ধুর কাজ। পরে ধীরেসুস্থে বলা যাবে দেবজিতের কফি হাউসের আগমনের কথা। তবু মনটা হঠাৎ কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল তার। আসন্ন সন্ধ্যার আকাশের মত নীলচে বেগুনি বিষাদ বুকের ভেতরটা ওলট পালট করতে লাগল। ওদের দুজনের ওপর সে তার দৃষ্টি বোলাল। ওপর প্রান্তে একটা টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। সে ছাড়াও দেবজিতের আরও অনেক বন্ধু ও বান্ধবী আছে, রুম্পা নিশ্চয় তা জানে। আধুনিক, শহুরে জীবনে এমনটা ঘটেই তো থাকে। তবু অন্য কোনও বন্ধু কি বান্ধবীর প্রাধান্য দেখলে অধিকার বোধে একটুও লাগে না তা কি হতে পারে?

ওদের বসার মন্থর ভঙ্গির দিকে সোহিনী আড়চোখে তাকাল। 'তুই যাস না, রুম্পা...'

'কোথায়?'

'ডায়মন্ডহারবার'

রুম্পা বলল, 'না রে আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।' একটু চুপ করে থেকে যোগ করল, 'তোকে বলতে আমার কোন বাধা নেই। সেই যে ফাইনাল ইয়ারে একবার এক্সকারশন হয়েছিল মনে আছে? আমি, দেবজিৎ, সুলগ্নারা সব পি ডি এস-এর সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমি আর দেবজিৎ ওখান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে পাটনার একটা হোটেলে একটা দিন সারাদিন কাটিয়েছি। তারপরেও বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে আমি বাইরে গেছি। দোলের সময় একবার বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম।'

সোহিনী অর্থপূর্ণভাবে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। 'তুই মানে তোরা কি একই ঘরে ছিলি নাকি?'

রুম্পা মুখের ভাবে লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি ফুটিয়ে হাসল। 'তুই একটা কী রে! দুজনে গেছি আলাদা থাকব নাকি?'

'ও'-বলে সোহিনী যোগ করল 'উঠবি নাকি? আমায় কিন্তু এবার যেতে হবে।'

'এখনই উঠবি? আচ্ছা চল' বলে রুম্পা তার পাশাপাশি হেঁটে কফি হাউস থেকে বেরল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সোহিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কত বাস যাচ্ছে, মিনিবাস, ঝকঝকে মারুতি। বিশ শতকের শেষে কোথায় কতদূর পৌঁছে দিল প্রযুক্তি। জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির ফলে, সন্তানসম্ভবা হবার ভয়ে মেয়েদের গুটিয়ে থাকতে হয় না। তবু কোনওভাবে পুরুষের সমকক্ষ হয়নি তারা। পুরুষের তুলনায় তাদের এই কমতি হওয়াটার নিষ্পত্তি হয়নি, কমতি হওয়ার প্রকৃতি বদলেছে মাত্র। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে শারীরিক মিলন আগের চেয়ে অনেক সহজ। কিন্তু অন্য একটি অসুবিধে

থেকেই যায়, যা শারীরিক বিপদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কয়েকবার শারীরিকভাবে একটি মেয়েকে পাবার পর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পুরুষটির তার প্রতি ঔৎসুক্য আগের তুলনায় খানিকটা কমে গেছে। বিপরীতে সেই পুরুষটির ওপর নির্ভরতা খানিকটা বেড়ে গেছে মেয়েটির তরফ থেকে। দাবি বেড়েছে। যতক্ষণ নারী সুদূর রহস্যময়, অজানা থাকে, ততক্ষণ ক্ষমতা তার হাতে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ভাল দিকের পাশাপাশি এর একটা ছোট্ট ত্রুটি হল পুরুষের মধ্যে নারী আগে যে মোহ জাগাতে পারত, সেই ক্ষমতা সে হারাতে বসেছে। এখন সবই যেন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে, বোঝাপড়ার ব্যাপার। কল্পলোকে আমরা নিঃস্ব। নিজের নানান এলোমেলো ভাবনায় মশগুল ছিল সোহিনী, বাড়ি ফেরার অনেকটা সময় পরেও তার পড়ার টেবিলের ওপর সরকারি সীলমোহরের ছাপ মারা লম্বাটে খামটা চোখে পড়েনি। আসলে ফেরামাত্র সে বাথরুমে ঢুকেছিল স্নান সারতে। বাড়িতে একটা বাথরুম অথচ লোক সংখ্যা সব মিলিয়ে এগারো। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে কাকারা স্নানে ঢোকেন, খুড়তুতো ভাইবোনদের জামাকাপড় ছাড়ার দরকার হয়, কাকিমা-রা গা ধোন। বাড়িটা যদিও সোহিনীর বাবার তৈরি, হার্ট অ্যাটাকে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর সংসারের সব ব্যাপারে কাকা এবং তাঁদের স্ত্রীদের অগ্রাধিকার তৈরি হয়েছে।

এর একটা কারণ হল, সোহিনীর বাবার মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর ব্যবসা ভাল চললেও, নগদ টাকা খুব বেশি রেখে যাননি। যা কিছু উপার্জন করেছিলেন, ব্যবসাতেই ঢালছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার লোহা, ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টস, ব্যবসার কাঁচামালের আকারে রেখে গেছেন। ব্যাংকে টাকা জমাতে পারেননি। ফলে বাড়িটা সোহিনীদের হলেও সংসার কাকাদের উপার্জনেই চলছে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও তুচ্ছ ঘটনায় মাকে কাকিমাদের কাছে অপদস্থ অপমানিত দেখতে দেখতে সোহিনীর প্রায় যেন অভ্যেস হয়ে গেছে। বাথরুম খালি পেয়ে সোহিনী অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। বড় বড় দুটো ড্রামে জল ধরা থাকে। সব সময় জল থাকে না কলে। সব জল শেষ করে ফেললে মেজকাকিই তা নিয়ে রীতিমত সীন করবেন। স্নান সেরে চুল বাঁধার সময় পড়ার টেবিলে একটা রাবার ব্যান্ডের খোঁজ করতে গিয়ে চিঠিটা দেখতে পেল। 'এটা কখন এল, মা?' বলে খামটা খুলল। যদিও পাবলিক সারভিস কমিশনের পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে তার নাম আছে, চাকরির ইন্টারভিউও দিয়ে চলেছে, এ ব্যাপারে নিরাশ হতে-হতে সোহিনী মন থেকে চাকরির আশা সরিয়েই রেখেছিল। ছোড়দা মজা করে বলত, 'তুই দেখি আক্ষরিক অর্থে 'ভগবদ্গীতা'র পথ অনুসরণ করছিস। ফলের আশা না করেই ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছিস। ও ভাবে কি চাকরি হয়? চেনা জানা চাই। ক্যান্ডিডেট আগে থেকে ঠিক করা থাকে।' সোহিনী তিন চার বার চিঠিটায় চোখ বোলাল। শেষ পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে তার হাতে। সে সরকারি চাকরি পেয়েছে। এতগুলো সরকারি পরীক্ষা দেওয়া সার্থক হল তাহলে। যে নিয়োগটি সে পেয়েছে তা হ'ল ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের চাকরি, যাকে বলে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে। চিঠিটা কয়েকবার পড়া হলে সোহিনী সেটা গোপন প্রেমপত্রের মতো ব্লাউজে গুঁজে রাখল। যে প্রেমপত্রটি একটি মেয়ের জীবনে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত, তাই যেন তার হাতে এসেছে। তার ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি ফুটে উঠল। মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের অন্য কোনও মেয়ের কাছে চাকরি পাওয়ার খবরটা এতটা উত্তেজক হয়ত হ'ত না। কিন্তু সোহিনীর পরিস্থিতিতে এটা শুধু মূল্যবানই নয়, আত্মসম্মান বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে অপরিহার্য। তার ছাত্রজীবনে যেমন পড়াশুনার ব্যাপারে সে মনোযোগী ছিল, তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব বুঝে

নেওয়ার চেষ্টা করল প্রথম দিন থেকেই।

চাকরিতে কয়েক মাস যেতে না যেতেই সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে বুঝে ফেলল অনেকদিনের পড়ে থাকা ফাইল গুছিয়ে দেওয়ার পক্ষে সোহিনী হল আদর্শ ব্যক্তি। সে কাজ খুব ভালবাসে। কাজের মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায়। জীবনের বিকল্প হিসেবে কাজটাকে সে দেখে না, কাজ হল তার জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার একটা উপায়।

সেদিন তার 'বস' দাসসাহেব কয়েকটা জরুরি ফাইল দিয়েছেন : 'আপনি প্লীজ একটু চেষ্টা করবেন তো মিস্ মিত্র, ফার্স্ট আওয়ারেই এ ক'টা দেখে রাখতে। ফর দিয়ে সই করে দিতে পারেন। রিএমবার্সমেন্টের একটা জরুরি ডকুমেন্ট পাচ্ছি না। এর মধ্যে কোথায় ঢুকে গেছে, একটু খুঁজে রাখবেন তো। ওটা না পেলে বলতে গেলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।'

'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব' বলে সোহিনী কাজে হাত দিলো। ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে সই করছিল, এইসময় চোখ তুলে একটি পরিচিত যুবককে তার টেবিলের সামনে চুপ করে ত্রস্ত বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যেমন ভঙ্গিতে অধিকাংশ মানুষই এসে থাকে, যাদের আয়কর সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আছে।

যুবকটি চুলের মধ্যে হাত চালাল। 'আপনাকে যখন চিনি, একটু বিরক্ত করার স্পর্ধা করছি।'

'বসুন।'

'বসব?' বলার মুহূর্তে এক ধরনের কৃতার্থ দৃষ্টি যুবকটির চোখে ফুটে উঠল।

'কী ব্যাপার চটপট বলুন' এটা বলার সময় সোহিনীর দুই চোখে মুহূর্তের জন্যও পূর্ব পরিচিতির কোনও ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। সে যে কোনও কালে এই ছেলেটিকে চিনত তা দুর্বোধ্য ও লুক্কায়িতই রইল মুখের আড়ষ্ট রেখাতে।

যুবকটির মুখের প্রতিটি ভাঁজে সোহিনীকে খুশি করার প্রচেষ্টা। হেঁ-হেঁ করার ভঙ্গিতে হাসল। 'আমি দেবজিৎ। দেবজিৎ বর্মন। আমায় চিনতে পারছেন না? আপনার প্রতিবেশী আপনার পাড়াতেই থাকি।'

সোহিনী বলল, 'ও হ্যাঁ, আপনার ফাইলটা ক্লিয়ারেন্সের জন্য আমার কাছে এসেছে, তাই না? এখনও দেখার দেরি আছে।'

দেবজিৎ প্রায় হাত কচলানোর ভঙ্গিতে বলল, 'ম্যাডাম, আপনার অমূল্য সময়ের দুটো মিনিট নেব।'

সোহিনী ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে অধৈর্যভাবে বলল, 'এখন তো সম্ভব না। হাতে অনেক কাজ জমে গেছে। আপনি পরে আসবেন।'

দেবজিৎ ব্রীফকেসটা হাতে নিল। 'আমার মা সন্তোষী মায়ের পুজো করেন, ঠাকুরের সিন্দুক থেকে এটা একধরনের আশীর্বাদ হিসেবে পাঠিয়েছেন।' বলে সে কী একটা বের করতে যাচ্ছিল, সোহিনী হাত তুলে তাকে থামাল। 'আপনি কক্ষনো এসব আনবেন না। এখন যান। আমি ব্যস্ত আছি।'

'পরে আসব তাহলে?' বলে উঠে দাঁড়াল দেবজিৎ।

এমনিতে দেবজিতের বাবা-ই এই দপ্তরে আসেন। এই প্রথম পুত্রকে দেখা গেল। তাদের আরেক প্রতিবেশী দুলালবাবুর কাছে দিন কয়েক আগে একদিন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সোহিনী অবশ্য শুনছিল, এখন দেবজিৎও নাকি অফিসে বসছে। ব্যবসা দেখতে শুরু করেছে। এর

মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স রির্টান নিয়ে এদের ঝামেলা চলছে। যে কোনও দিন রেইড হতে পারে। ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্টের তরফ থেকে রেইড হয়ে গেছে, অফিস এবং বাড়ি দুজায়গাতেই। এনফোর্সমেন্ট রেইড করার পর নাকি দেবজিতের বাবা অফিসে আসছেন না হাই ব্লাড প্রেশারের কারণে। দেবজিতের অপ্রস্তুত প্রস্থানের দিকে সোহিনী কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। সেই যে রুম্পা বলেছিল, কী করলে বল তো সমাজে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হবে? এর উত্তর যেন ক্রমশ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আসলে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে মেয়েরা থাকলেই তাদের অবস্থানে এক ধরনের বদল আপনা থেকেই ঘটে যায়। পুলিশ কমিশনার বা আয়কর প্রধান বা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান না হোক, প্রশাসনের নানা স্তরে ছোটখাটো দায়িত্বে থাকলেও সংসারে তাদের অন্যরকম পরিচিতি, সমাজে আলাদা গুরুত্ব তৈরি হবে যা পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিগারেট খাওয়া বা ডায়মন্ডহারবার ভ্রমণের চেয়ে মূল্যবান ।

চোখ সরিয়ে ফাইলের স্তূপ নিজের দিকে টেনে নিল সোহিনী। বুকের কাছে গুঁজে রাখা বাবার প্রিয় পেলিকান কলমের ক্যাপ খুলল। প্রতিদিন ভিড়ের বাসে উঠে অফিস যাওয়া, 'বস' এর মন যোগানো, কাজের নানা টেনশন! উপায়হীন না হলে সরকারি অফিসযাত্রীর এই একঘেয়ে কর্মজীবন নেবেই বা কেন একটি মেয়ে? তার তো বিকল্প ব্যবস্থা আছেই, যাকে বিবাহ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই তথাকথিত উপায়হীনতাই একজন মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, গুরুত্ব প্রতিপত্তির উৎস। সে উপায়হীন বলে এক হিসেবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হ'ল তার।